বাংলা বানান সংস্কার : সমস্যা ও সম্ভাবনা

পবিত্র সরকার

বাংলা বানান সংস্কার : সমস্যা ও সম্ভাবনা

পবিত্র সরকার

চিরায়ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড
১২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট • কলকাতা ৭০০০৭৩

BANGLA BANAN SANSKAR : SAMASYA O SAMBHABANA

A monograph on Bengali spelling reform

by

Pabitra Sarkar

প্রথম প্রকাশ
জুলাই, ১৯৮৭ ॥ শ্রাবণ, ১৩৯৪

প্রকাশক
শিবব্রত গঙ্গোপাধ্যায়
চিরায়ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড
১২ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭৩

মুদ্রাকর
ছবিরানী হাজরা
দিবাকর মুদ্রণ
৫৮ কৈলাস বোস স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০৬

প্রচ্ছদ : জয়ন্ত ঘোষ

দাম : ২২.০০ টাকা
(Rs. 22.00)

শ্রীমণীন্দ্রকুমার ঘোষ

পরম ভক্তিভাজনেষু

সূচিপত্র

একটি বইয়ের কথা মাথায় রেখে ১৯৮২ থেকে আমি বাংলা বানানের নানা প্রসঙ্গ নিয়ে কিছু লেখা লিখতে আরম্ভ করি। সেগুলি 'অনুক্ত', 'প্রমা', 'যুব-মানস', 'শারদীয়া বসুমতী', 'শারদীয় আজকাল', 'অপরাজিত', 'কৌশিকী' (রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়), 'পশ্চিমবঙ্গ', 'পটভূমি', 'সেতুবন্ধন' ইত্যাদি বড় ও ছোট পত্রিকায় ছাপা হয়। সংশ্লিষ্ট সম্পাদকদের ধন্যবাদ জানাই। আরেকটি প্রবন্ধ লেখা হয় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ডাকা ১৯৮৫-র বাংলা ভাষা বিষয়ক সেমিনারের জন্য।

এখন সেই পরিকল্পিত বইটি তৈরি হল। সতর্কতা সত্ত্বেও এতে কিছু ছাপার ভুল থেকে গেল। যেমন ৫৬ পৃষ্টায় নবম লাইনে ষোড়শ হয়েছে 'শোড়ষ'। কিন্তু বেশির ভাগ ভুলই পাঠক নিজে সংশোধন করে নিতে পারবেন বলে আর আলাদা শুদ্ধিপত্র দেওয়া হল না। আর একটি ভুল ৩০ পৃষ্ঠায় দ্বিতীয় প্যারাগ্রাফে 'হাওয়া-র 'হওয়া' রূপে মুদ্রণ।

বানান বিষয়ে সমানুভব ও সহযোগী চিন্তার দ্বারা যাঁরা আমাকে উদ্‌বুদ্ধ করেছেন তাঁদের মধ্যে আছেন শঙখ ঘোষ, শিশিরকুমার দাশ, সুবীর রায়চৌধুরী, শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়, অশোক মুখোপাধ্যায় অমিতাভ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি। এক সময় এ বিষয়ে ভাবনার জন্য নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ও নিখিল সরকারের কাছ থেকে বিশেষ উৎসাহ পেয়েছিলাম। এঁদের সকলকে আমার গভীর কৃতজ্ঞতা জানাই। আমার ছাত্র শ্রীমান শ্যামাপ্রসাদ ভট্টাচার্য এ বইয়ের জন্য প্রচুর শ্রমস্বীকার করেছেন। তাঁর শুভ কামনা করি। বন্ধুবর শিবব্রত গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রবুদ্ধ উপদেশ, কঠোর মনোযোগ ও দৌড়োদৌড়ির ফলে এ বইয়ের প্রকাশ ত্বরান্বিত হয়েছে। তাঁকে গভীর প্রীতি জ্ঞাপন করি।

পরিশিষ্টের দ্বিতীয় প্রবন্ধের প্রতি পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। অনুকূল বা প্রতিকূল বা মিশ্র সমালোচনা লেখককে জানালে লেখক উপকৃত হবে।

৩০ জুলাই, ১৯৮৭

পবিত্র সরকার
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

১. বানানভুল : তার উৎস ও বৈচিত্র্য

১. প্রাক্-কথন

এ অধ্যায়ে বানানভুলের, বিশেষত বাংলা লেখায় বানানভুলের, লিপি-সংগঠনগত উৎস ও সম্ভাবনা আমরা নির্দেশ করবার চেষ্টা করেছি। কোনো লিপিপদ্ধতিতে বানানভুলের কারণ সম্বন্ধে দুদিক থেকে আলোচনা করা যায়। প্রথমত, এটা দেখানো চলে যে, উচ্চারণ অনুযায়ী লিখতে গিয়ে বানান তার আদর্শ বা norm থেকে সরে যায়। উচ্চারণ ও বানানের মধ্যে ব্যবধান তৈরি হওয়ার ইতিহাস এই সূত্রে আলোচনা করা চলে, তা আমরা পরে করেওছি কিছুটা। দ্বিতীয়, বাংলা লেখার ক্ষেত্রে এটাও দেখানো সম্ভব যে, উচ্চারণ অনুযায়ী বানান লিখতে গিয়ে গৃহীত বানান থেকে সরে যাওয়ার একটিমাত্র রাস্তা নেই। আছে একাধিক রাস্তা, একাধিক সম্ভাবনা। মাংসের দোকানের সাইনবোর্ডে যখন মিট 'ষপ্' কথাটি দেখি তখন বুঝি যে, উচ্চারণ মেনে বানান লিখতে গিয়ে সাইনবোর্ড-লেখক 'সপ্' 'শপ্' এবং 'ষপ্'—এই তিনটি সম্ভাবনার মধ্যে কোনো এক অজ্ঞাত কারণে তৃতীয়টিকেই বেছে নিয়েছেন। এতে উচ্চারণ বজায় আছে, কিন্তু অধিকতর স্বীকৃত 'শপ্' না লেখার জন্য তাঁর বানান-বিচ্যুতি ঘটেছে। এই বিচ্যুতির কারণ লেখকের অক্ষরজ্ঞান বা উচ্চারণজ্ঞানের অভাব নয়। বানানের সুনির্দিষ্ট গৃহীত রূপটি সম্বন্ধে তাঁর অজ্ঞতা। তাঁর বর্ণমালা ও লিপির বিশেষ চরিত্রই তাঁর এই অজ্ঞতার কারণ। এই বিষয়টি দেখাতে হলে ইতিহাসের শরণ নেবার দরকার নেই, বাংলা বর্ণপদ্ধতি ও লিপি-প্রকরণের সংগঠনের ভিত্তিতে আলোচনা করলেই চলে[১]। এ অধ্যায়ে সেই চেষ্টাই করা হয়েছে। বাংলায় এ ধরনের আলোচনা এর আগে আমাদের চোখে পড়েনি।

২. স্খলন ও ভ্রান্তি

ছেলেমেয়ের স্কুলের বা কলেজের খাতায় বা পরীক্ষাপত্রে কিংবা বড় মানুষের নানা ধরনের লেখায় যে বানানভুল দেখা যায় তার সবগুলি এক ধরনের নয়। খাতায় সব বানানভূলই ভুল, কিন্তু একটু লক্ষ করলে দেখা যাবে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে বানান জানি, কিন্তু তবু ভুল করছি আমরা; কোনো ক্ষেত্রে আবার বানানটা জানি না বলে ভুল করছি। অনেক ক্ষেত্রে আবার সংশয় আছে এই বানানটা ঠিক এই হবে কি না —সেটাও আমরা বানান জানি না-র মধ্যেই ফেলছি। স্পষ্ট জানার অভাব থেকেই সংশয় বা অনিশ্চয়।

বানান জানি, সুনিশ্চিতরূপে জানি, অথচ লেখায় ভুল ঘটে গেল, এ রকম উদাহরণ অনেক আছে। 'অসুস্থতা' লিখতে লিখি 'অসুস্থা', 'কাঁদা' লিখতে লিখি 'কাদা', 'সত্যদা' লিখতে লিখি 'সত্যতা'। এগুলি ভুল নয়, কারণ কাঁদা —কাদা পূর্ববঙ্গের মানুষের পক্ষে ভুল হলেও যে-কারো পক্ষেই 'অসুস্থতা' লিখতে 'অসুস্থা' কিংবা 'সত্যদা' লিখতে 'সত্যতা' লিখে ফেলা সম্ভব। কাজেই এটা ঠিক বানানভুল নয়। এর নাম দেওয়া যাক স্খলন, ইংরেজিতে slip।

স্খলন ঘটে কেন? স্খলন ঘটে লেখার দ্রুততা, লেখার সময়ে মানসিক উত্তেজনা, চিত্তবিক্ষেপ বা কোনো ধরনের অন্যমনস্কতার ফলে। তাড়াহুড়ো করে লেখাতে স্খলন থাকবেই —পরীক্ষার খাতায়, বিশেষ করে শেষ ঘণ্টার কাছাকাছি সময়ে লেখা উত্তরগুলিতে স্খলনের দৃষ্টান্ত খুব বেশি।

'স্খলন' বিষয়টা জানা-বানানের বিভ্রান্তি বলে যথার্থ বানানভুলের তুলনায় এর একটা সুবিধা আছে। সময় ও সুযোগ থাকলে লেখাটির উপর আর একবার সাবধানী চোখ বুলিয়ে স্খলনগুলিকে শুধরে নেওয়া যায়; বানানভুলের ক্ষেত্রে তা সম্ভব নয়। কোথায় 'রেফ' বসানো হয়নি, র-এর বিন্দু পড়েনি, ব্যঞ্জনের নিচে হসন্ত বসেনি, আ-কার ই-কার পড়েনি, 'প্রায়' লিখতে 'প্রাই' হয়ে গেছে, বা পুরো একটা অক্ষর বাদ পড়ে গেছে —সবই সংশোধন করা চলে। বানান ভুলের সংশোধন এভাবে সেই মুহূর্তে করা সম্ভব নয়, বানানটা শিখে নিয়েই তা করতে হবে।

স্খলনের দুটো বড় শ্রেণী —'ছাড় (omission) আর 'বদল' (substitution)। ছাড় ঘটছে তখনই যখন কোনো বর্ণ লিখতে গিয়ে সেটি বা তার অংশ লেখা হচ্ছে না, বাদ পড়ে যাচ্ছে। বিশেষ করে একটা বর্ণের বা বর্ণ-ইউনিটের মধ্যে যদি একাধিক অংশ থাকে, যা লিখতে গেলে

কাগজে আলাদা-আলাদাভাবে একাধিকবার কলম ছোঁওয়াতে হবে, তাহলে শেষের অংশটা বাদ পড়ে যাওয়া খুবই সম্ভব। এরই ফলে র-এর ফুটকি, রেফ চিহ্ন, ও-কারের অন্তর্গত আ-কার ইত্যাদি ছাড় হয়ে যেতে পারে। ইংরেজি 'আই' (i) আর 'টি' (t) অক্ষর সম্বন্ধে তো প্রবাদের নির্দেশই আছে 'Cut your t's and dot yours i's !' টানা বা cursive লেখায় যে অংশটা আগে লেখা হয়ে যায়, পরে ফিরে এসে যদি তার কোনো বাকি অংশ লিখতে হয়, তাহলে এই ছাড় হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়।

আর 'বদল' ঘটছে তখন, যখন একটা অক্ষর লিখতে আরেকটা অক্ষর চলে আসছে। 'প্রায়' লিখতে 'প্রাই', 'সত্যদা লিখতে 'সত্যতা' যেমন। এ রকম অসংখ্য উদাহরণ পাঠকদের নিজেদেরই মনে পড়বে।

যে-কোনো স্খলনের উৎস হল মন। ছাড়-এর একটি কারণ আমরা বলেছি, সাধারণভাবে দুটি অংশের একটিকে আগে লিখে বাকিটি লেখার আগে যদি কোনো ব্যাঘাত ঘটে, মাঝখানে অন্য কিছু লেখা হয়ে যায়, সেখানে বাকি অংশটি লেখার কথা মনে নাও থাকতে পারে। এখানে স্মৃতির বাধাই বড়ো। ফলে 'মূত্তি' 'পাচ'-এর মতো বানান আমাদের খুবই চোখে পড়ে। মাঝে এই ব্যাঘাত বা interruption না থাকলে ছাড় পড়ার সম্ভাবনা কম, যেমন অনুস্বারের (ং) ক্ষেত্রে। সেখানে শূন্য আর তার নিচের হসন্ত লেখার মধ্যে ঐ ব্যাঘাত বা বিরাম নেই, ফলে স্মৃতি এখানে কোনো বিশ্বাস-ঘাতকতা করে না।

বদল বা substitution-এরও একাধিক কারণ আছে। একটা কারণ হল, বদলি চিহ্নদুটোর ধ্বনিগত বা অন্য কোনোরকমের সাদৃশ্য বা নৈকট্য সম্বন্ধে লেখকের সংস্কার। 'য়' আর 'ই' উচ্চারণের দিক থেকে কাছাকাছি, 'ঋ' (রি) আর 'র' যেমন। ফলে ছেলেমেয়েদের পরীক্ষার খাতায় 'প্রায়'/'প্রাই' ; 'যায়'/'যাই', 'উপায়'/'উপাই' এই জাতীয় বদল খুব বেশি দেখা যায়। এই একই কারণে 'প্রচন্ড' 'পৃচণ্ড' হতে পারে, আবার 'পৃথিবী হয় 'প্রিথিবী'। এই লেখক নিজে 'এটাও' লিখতে মাঝে মাঝে 'এটাই' লিখে ফেলে। তার কারণ আর কিছুই না, তার ভাবনার মধ্যে নিশ্চয়ার্থক 'ই' আর সংযোগাত্মক 'ও' খুব কাছাকাছি সাজানো রয়েছে, যদিও অর্থের দিক থেকে প্রথমটা অবিকল্পবোধক (exclusive), আর দ্বিতীয়টি সংযোগাত্মক (inclusive)। তাই তার মন অন্যমনস্ক প্রেস-কম্পোজিটারের মতো একটা খোপের টাইপ তুলতে গিয়ে তার পাশের খোপের টাইপ তুলে বসায়— 'সেও' লিখতে লেখায় 'সেই'।

বদলের আর একটা বড়ো কারণ প্রাক্‌প্রত্যাশা বা anticipation। লেখার সময় আমরা পরের একটা-দুটো শব্দ আগে থেকে ভাবতে শুরু করি।

একটু পরে সচকিত হয়ে আবিষ্কার করি যে, ঐ পরের শব্দটির প্রথম অক্ষর টপকে এসে বেজায়গায় বসে গিয়েছে, আগের শব্দটির কোনো একটা অক্ষরকে সরিয়ে দিয়েছে। এই লেখাতেই একটু আগে আমি 'অক্ষর' লিখতে 'এক্ষর' লিখে ফেলেছিলাম। তার কারণ, তখনই আমি ছাড়-এর উদাহরণ হিসাবে 'একটা→এটা' ব্যবহার করব ভেবেছিলাম, ফলে এদের 'এ' বর্ণটি আগে টপকে এসে অক্ষর-এর 'অ'-কে ছিটকে দিয়েছিল। আরো উদাহরণ : 'তুলনামূলক', 'শ্বাশ্বত' ইত্যাদি। অবশ্য এ যদি বানানভুল না ধরে বদল বলেই ধরি। তাহলে 'তু' হচ্ছে 'মূ' এর প্রাক্‌প্রত্যাশা-জনিত সাদৃশ্যে, 'শ্বাশ্বত'-র প্রথম 'শ্ব'-ও আসছে ওই একই কারণে।

ছাড় আর বদল একসঙ্গে দুটোই ঘটার ফলে এক ধরনের মিশ্র স্খলন তৈরি হচ্ছে, তারও দৃষ্টান্ত আছে। যেমন 'বাংলী' কথাটা —পরীক্ষার খাতায় যার প্রচুর সাক্ষাৎ ঘটে। 'বাংলী' হল 'বাঙালী'-র একটা রূপ। এতে 'বাঙালী' (বা 'বাঙ্গালী') থেকে ছাড়ও ঘটছে, বদলও ঘটছে। আ-কার বাদ পড়ছে একটা, আর ঙ বা ঙ্গ-এর, জায়গায় এসে বসছে অনুস্বার। উচ্চারণ-সাদৃশ্য হল বদলের কারণ। আবার 'আন্নদ' ('আনন্দ')-তে যে-ধরনের স্খলন ঘটছে তার নাম দিতে পারি 'বিচ্যুতি' বা displacement। ঐ প্রাক্‌প্রত্যাশার কারণে ন্দ-এর ন, আগেই এসে ন-এর সঙ্গে জুড়ে গেছে। এ এক ধরনের বিপর্যাসমূলক (metathetical) স্খলন, যেখানে যে-অক্ষরের থাকার কথা তাদের স্থান-পরিবর্তন ঘটছে—

আ+ন+ন্+দ →আ+ন্+ন+দ
$1+2+3+4 \rightarrow 1+3+2+4$

এই বিপর্যাসমূলক বিচ্যুতিকে আমরা বলব পরাগত (regressive), কারণ এখানে পরের চিহ্ন আগে এসে আগের বর্ণ-ইউনিটের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে। এ রকম আরো দৃষ্টান্ত : অত্যন্ত —অন্তত্য।

আবার প্রগত বা progressive ধরনের বিপর্যাস-বিচ্যুতিও প্রচুর ঘটে। সেখানে আগের (অর্থাৎ লেখায় বাঁদিকের) একটি বর্ণ পরে চলে যায়। পরে গিয়ে যুক্তব্যঞ্জন তৈরি না করে অনেক সময় বদল ঘটায়, যেমন 'তথাকথিক', 'রুচিবিকার' স্থলে 'রুচিবিচার', 'নামক' লিখতে 'নাকম'। যুক্তব্যঞ্জনকে প্রভাবিত করার দৃষ্টান্ত হল 'ছন্দোবন্ধ'-এর জায়গায় 'ছন্ধোবন্ধ' (ছন্দোবন্ধ অর্থে)। এখানে বদলও ঘটছে।

লেখার স্খলন আকস্মিকতা-নির্ভর বলেই তা অনুমানযোগ্য বা predictable নয়। কিন্তু যদি কোনো ব্যক্তির না-জানা বানান সম্বন্ধে একটা হিসাব থাকে তাহলে অনুমান করা সম্ভব সে কোন্ বানান ভুল করবে। এও স্খলনের সঙ্গে বানানভুলের একটা তফাত।

লেখার এই স্খলনকে মুখের স্খলন অর্থাৎ 'স্লিপ অব দ টাং'-এর সঙ্গে সহজেই তুলনা করা সম্ভব। মুখের কথায় ছাড় হয় সাধারণভাবে দম ফুরিয়ে গেলে। কিন্তু সেটা তত গুরুত্বপূর্ণ নয়, কারণ দম না ফুরোলে ঐ ছাড় ঘটবার কথা নয়। কিন্তু যদি একই ধরনের ধ্বনি বা ধ্বনিদল কোনো কোনো শব্দে পুনরাবৃত্ত হয়, তখন তার একটি উচ্চারণে খসে যাবার ভয় থাকে। যেমন বাঙালিদের অনেকের মুখে ইংরেজি 'ডেটোরিয়োরেশান' 'ডেটোরিয়েশান' হয়ে যায়। এই ঘটনাটা নিয়মিত ঘটতে থাকলেই শব্দের চেহারাটা পাকাপাকিভাবে বদলে যায়। ভাষাবিজ্ঞানে তার নাম Haplology —বাংলায় সমাক্ষরলোপ ; একই রকম অক্ষর বা সিলেব্‌লের পুনরাবর্তন থাকলে তার একটির লোপ। এইভাবেই 'বড়দিদি' থেকে 'বড়দি' 'ছোটকাকা' থেকে 'ছোট্‌কা' হয়েছে। মুখের কথায় ধ্বনির এই ছাড়ই 'রকম'-কে করে দেয় 'রম্‌', 'ডালহৌসি'-কে 'ডাউসি', 'ইনকিলাব'-কে 'ইংক্লাব'। অনভ্যস্ত বা দুরুচ্চার্য ধ্বনি বা ধ্বনিগুচ্ছ থাকলেও ছাড় মন্দ হয় না। গল্পই তো আছে যে, কালিদাস 'উষ্ট্র' কথাটা উচ্চারণ করতে পারতেন না, হয় বলতেন 'উষ্ট', না হয় 'উট্র'। আমাদের নিজেদেরও অনেকের বেলায় 'কৃচ্ছ্র' কখনো 'কিচ্ছ্র', কিংবা 'কৃচ্ছ' হয়ে বেরোয়। বৃত্র হয় 'বৃত্ত' বা 'বিত্র'।

মুখের কথায় বদল ঘটে দ্রুত উচ্চারণে, আশেপাশের ধ্বনির প্রভাবে। 'র' 'ড়' গুলিয়ে যায়, 'জ' হয় 'জ.' (z)। দাঁত-ভাঙা tongue-twister থাকলে ছাড় ও বদল দুইই ঘটবার সম্ভাবনা থাকে। একটু তাড়াতাড়ি ইংরেজি Peter Piper picked up pickled pepper কিংবা She sells seashells on the seashore বলার চেষ্টা করলে তা ঘটবে, যেমন ঘটবে, বাংলা 'দুড়দাড় ঘরদোর, ধড়াধড় মারধোর, ছারখ্যার হাড়গোড়' বলার চেষ্টা করলে।

৩. বানানভুল, তার প্রকরণ

স্খলন ছেড়ে খাঁটি বানানভুলের প্রসঙ্গে আসি। বানানভুলের প্রাথমিক উৎস ভাষার লিপিপদ্ধতি ও বর্ণমালা। ভাষার উচ্চারণের সঙ্গে তার বর্ণসম্ভার ও লিখনপদ্ধতির যদি অসংগতি থাকে তাহলে বানানভুল হতে বাধ্য। অর্থাৎ একটি শব্দ যা উচ্চারণ করি তার বানান যদি ঠিক সেইভাবে লেখা না যায়, তাহলে বানানভুল হবেই। এক্ষেত্রে আদর্শ নীতিটি ছিল, one sound, one symbol। যে-ধ্বনিটিকে উচ্চারণ করছি তাকে সর্বত্র একই চিহ্ন দিয়ে বোঝাতে হবে। ধ্বনি ও বর্ণের one-one correspon-

dence থাকতে হবে। পৃথিবীতে কয়েকটি ভাষা আছে, যেমন ইতালীয়, স্প্যানিশ, চেক —যেখানে শব্দের বানানে উচ্চারণ আর তার ধ্বনিরূপ বেশ কাছাকাছি। কিন্তু ফরাসি ও ইংরেজি ভাষার বানানরীতি রীতিমতো কুখ্যাত। এসব ভাষায় প্রচুর শব্দের বানান তার উচ্চারণকে প্রতিফলিত করে না। কিন্তু ইংরেজি বা ফরাসি বানানের তুলনায় বাংলা বানানের অসংগতির ক্ষেত্রটি একটু আলাদা। ইংরেজি ও ফরাসি শব্দে এক বর্ণের একাধিক উচ্চারণ বা একাধিক বর্ণের এক উচ্চারণ যেমন দুটি সমস্যা, তেমনি সমস্যা একাধিক silent বা অনুচ্চারিত বর্ণের। ইংরেজি a বর্ণটির অন্তত পাঁচ রকম উচ্চারণ আছে —cat, father, about, gate, law —এই শব্দগুলির a বর্ণটির উচ্চারণ লক্ষ করলেই তা বোঝা যাবে। ফরাসিতে e বর্ণটির অন্তত তিন রকমের উচ্চারণ আছে, যদিও সেগুলি প্রকৃতিতে খুব একটা ভিন্ন নয়। বাংলা উচ্চারণে প্রথম দুটি সমস্যা আছে বটে, কিন্তু তৃতীয় সমস্যা অর্থাৎ silent ধ্বনির সমস্যা প্রায় নেই বললেই চলে। কেউ কেউ দাবি করতে পারেন যে যুক্তব্যঞ্জনের উচ্চারণে এই সমস্যা আছে। কিন্তু এ বিষয়ে আমরা পরে আলোচনা করে দেখাব যে, যুক্তব্যঞ্জনের উচ্চারণে ঐ সমস্যা silent ধ্বনির সমস্যার সঙ্গে হুবহু এক নয়।

বাংলা লেখাতে শব্দের বানানে একক বর্ণের উচ্চারণের ক্ষেত্রে যে-অসংগতিগুলি আছে তাকে পাঁচটি পর্যায়ে ভাগ করা চলে। প্রথম অসংগতি—বাংলায় এমন ধ্বনি আছে যা আমরা মুখে হরহামেশা উচ্চারণ করছি কিন্তু যার নিজস্ব কোনো বর্ণগত রূপ বা লিপিচিহ্ন নেই লেখার জন্য, যেমন [æ] স্বরধ্বনিটি, যেটিকে সাধারণভাবে আজকাল শব্দের গোড়ায় 'অ্যা' এবং ব্যঞ্জনের পরে 'া' চিহ্ন দিয়ে বোঝানো হয়[২]। বাংলায় এ পর্যন্ত এই স্বরধ্বনিটি বোঝাতে যে-সব বর্ণ বা বর্ণগুচ্ছ ব্যবহৃত হয়েছে সেগুলি সবই অন্য ধ্বনির চিহ্ন থেকে ধার-করা। আমরা যতটুকু দেখেছি তাতে মোট নয় রকমের চিহ্ন ওই একটি মাত্র স্বরধ্বনি লেখার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে লক্ষ করা গেছে —এ, ে, অ্যা, ্যা, ্য, এ্যা, এ্য, য়্যা, া ('জ্ঞান'-এ যেমন)[৩]। এখনো পুরনো শব্দের বানানে এ এবং এ-কার, তৎসম কিছু শব্দে য-ফলা, য-ফলা আকার এবং নতুন (বিদেশী ঋণ) শব্দের বানানে 'অ্যা' ও 'ÿা' গ্রাহ্য। বিশ্বভারতীর বইয়ে পাইকা অক্ষরে মাত্রাওয়ালা এ-কার দিয়ে 'অ্যা' বোঝানো হয় বটে, কিন্তু শব্দের মাঝখানে ঐ পার্থক্য রাখা যায় না, লাইনো বা মনোটাইপেও সে পার্থক্য তৈরি করা যায় না। আর সে-রীতি বাংলা মুদ্রণে তেমন গৃহীতও হয়নি।

দ্বিতীয় অসংগতি হল, বাংলা বর্ণমালায় অনেক বর্ণের উচ্চারণ তার মূল আদল থেকে সরে এসেছে। সংস্কৃত বর্ণমালায় ঈ, ঊ-র দীর্ঘ উচ্চারণ

ছিল, কিন্তু বাংলায় এ দুটির উচ্চারণ হ্রস্ব ই, উ থেকে অভিন্ন। 'ঋ' আগে ছিল হসন্ত এবং আক্ষরিক (syllabic) 'র্' ধ্বনি মাত্র, বাংলায় হয়েছে স্বরান্ত 'রি'। 'ঞ', 'ণ', 'ষ'-র স্ব-তন্ত্র উচ্চারণ নেই। স্বরধ্বনি বানানে দীর্ঘ হলেও হ্রস্ব উচ্চারণ হয়, আবার হ্রস্ব স্বরধ্বনির চিহ্নও উচ্চারণে দীর্ঘ হতে পারে। সাধারণভাবে 'যদি' কথাটির 'দি' আর 'নদী'-র 'দী'-তে উচ্চারণের দিক থেকে কোনো তফাতই নেই; আবার 'দুধ' কথাটিকে আলাদা এককভাবে উচ্চারণ করলে দীর্ঘ ঊ-র উচ্চারণ শুনতে পাই—দু—ধ, কিন্তু যদি 'দুধভাত খেয়েছে?' জিজ্ঞেস করি তখন 'উ'-র উচ্চারণ হ্রস্বই হয়।

এই অসংগতির ফলেই যে-একটি উপসর্গের সৃষ্টি হয়েছে তা এই; একই ধ্বনির দুটি বা কখনো তিনটি চিহ্ন দাঁড়িয়ে গেছে বাংলা ভাষায়। এখানে আমরা লক্ষ করি one-to-many correspondence, এক-বহু প্রতিসম্পর্ক: ধ্বনি একটা, কিন্তু চিহ্ন একাধিক। যেমন 'ই' (ই, ঈ), 'উ' (উ, ঊ), 'জ্' (জ, য), 'ঙ' (ঙ, ং), 'ত' (ত, ৎ), 'শ্' (শ, ষ, স), 'ন্' (ণ, ন) ইত্যাদি।

তৃতীয়ত, এছাড়া আছে বহু-এক প্রতিসম্পর্ক—many-to-one correspondence। অর্থাৎ ধ্বনি একাধিক, কিন্তু চিহ্ন একটি, যেমন ঐ বা ঔ। ইংরেজির মতন ঠিক নয়। সে-ভাষায় এক বর্ণের দুটি পৃথক উচ্চারণ, c বা g-এর যেমন। বাংলা ঐ ঔ-এ পাশাপাশি দুটি ধ্বনির দ্বিস্বরিত উচ্চারণ—ও-ই্, ও-উ্[৪]।

আবার ধ্বনির চিহ্নগুলি সব জায়গায় একরকমও থাকে না, প্রতিবেশ অনুসারে বদলায়। এই প্রতিবেশ দুরকম—সাধারণ ও সুনির্দিষ্ট। সাধারণত আমরা লক্ষ করি যে, শব্দের গোড়ায় বা স্বরধ্বনির পর স্বরধ্বনি থাকলে তার গোটা রূপ, অর্থাৎ primary symbol বা বর্ণমালাভুক্ত রূপই লিখি আমরা। কিন্তু সে-স্বর যদি উচ্চারণে ব্যঞ্জনোত্তর হয়, তাহলে আস্ত বর্ণ না লিখে আমরা লিখি স্বরচিহ্ন বা কার, অর্থাৎ secondary symbol—আ-কার (া), ই-কার (ি), ঈ-কার (ী) ইত্যাদি। এই হল সাধারণ প্রতিবেশ। কিন্তু সুনির্দিষ্ট বা বিশেষ প্রতিবেশে এই কার চিহ্নও অনেক সময় বিশিষ্ট রূপ ধারণ করে। যেমন হ্রস্ব-উ কারের সাধারণ রূপ (ু)। কিন্তু 'রু', 'শু', 'গু', 'হু' ইত্যাদিতে তার যে-সব সুনির্দিষ্ট ও স্বতন্ত্র রূপ ফুটে ওঠে তার সঙ্গে গোটা বর্ণের রূপ, এমন কী সাধারণ কার-চিহ্নেরও রূপগত তফাত দাঁড়িয়ে যায়। বাংলায় এই বিশেষ প্রাতিবেশিক বর্ণরূপভেদ বা অ্যালোগ্রাফ (allograph)-গুলির জন্য মুদ্রণের বিশেষ অসুবিধা বেড়েছে, শিখতেও হয় বহু চিহ্ন। তবে সাধারণ হোক আর

সুনির্দিষ্ট হোক প্রাতিবেশিক চিহ্নের সুবিধা এই হল যে, চিহ্নটি ঐ প্রতিবেশের সঙ্গে অনিবার্যভাবে যুক্ত, তাকে অন্যত্র পাওয়া যাবে না। হ্রস্ব-উ কারের একটি রূপকে কেবল 'র' বা র-ফলার সঙ্গে যুক্তভাবেই পাওয়া যাবে। 'রু', 'দ্রু'-তে যেমন। অন্যত্র তার ব্যবহার হবে না, কেউ 'বু' বোঝাতে 'বু' লিখবে না। কাজেই এগুলি প্রতিবেশবদ্ধ বলে এগুলির মধ্যে অকারণ স্থানবিনিময়ের ভয় তেমন নেই। যদি কেউ 'বু'-এর জায়গায় 'বু' লেখে, সে বানান জানে না এমন কথা বলা ঠিক হবে না; বলা বরং উচিত হবে যে, সে লিখতে জানে না —বাংলা লেখার সবগুলি নিয়ম তার আয়ত্ত হয়নি।

পঞ্চমত, বাংলা ভাষায় কিছু কিছু স্বরধ্বনি অবস্থানবিশেষে উচ্চারণে অন্য স্বরধ্বনির চেহারা নেয় —উচ্চারণে বেশ বদলে যায়। পরে ই বা উ থাকলে অনেক জায়গায় অ হয় ও, অ্যা হয় এ। বানানে অনেক সময় এই পরিবর্তন দেখানো হয় না। যেমন 'অত' [অত], আর অতি [ওতি]— দুটোতেই 'অ' আছে —কিন্তু দুটো অ-এর দুরকম উচ্চারণ[৫]। তেমনই এ বা একার (ে) দিয়ে 'এ' 'অ্যা' দুরকম ধ্বনিই বোঝানো হয়। যেমন 'দেবতা' ও 'দেখা'তে প্রথমটিতে এ, দ্বিতীয়টিতে অ্যা ধ্বনি। কিন্তু কেউ যদি 'অতি' লিখতে 'ওতি' লেখে তাহলে এখনকার নিয়ম অনুযায়ী বানান ভুল হবে। এ হল উচ্চারণের চাপে বানান ভুল। এর কথায় পরে আসছি।

যেখানে এক চিহ্নের একাধিক উচ্চারণ আছে, তার চেয়ে যেখানে একাধিক চিহ্নের এক উচ্চারণ দাঁড়িয়েছে—সেখানেই বানানভুলের সম্ভাবনা বেশি। একক ব্যঞ্জনে এ সমস্যা বেশি নয়। সেখানে ক, খ, গ, ঘ, চ, ছ, জ, ঝ ইত্যাদির একটি করেই চিহ্ন। ভাষাতত্ত্বে যাকে বলে bi-uniqueness condition —তাই এখানে বজায় আছে। অর্থাৎ একটি ধ্বনি, তার একটি মাত্রই চিহ্ন। কাজেই ক লিখতে গিয়ে খ লেখার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে —যদি না ইংরেজিভাষী বিদেশীর অসম্পূর্ণ জ্ঞানের ফলে সেই ভুল ঘটে। কিন্তু যে-চিহ্নগুলির উচ্চারণ এক হওয়ার ফলে খানিকটা পরস্পরবিনিময়-সম্ভব —অর্থাৎ একটার বদলে আরেকটা লিখে ফেললে উচ্চারণ কমবেশি একই থাকে—সেই চিহ্নগুলিই বানানভুলে বড় ভূমিকা নেয়।

'বাঁদর' এই শব্দটিতে 'দ'-এ অলিখিত যে-চিহ্নটি আছে বলে আমরা ধরে নিচ্ছি, তার নাম নিহিত (inherent) অ। তার কোনো প্রকাশ্য রূপ নেই। এখন এই জায়গায় অ-এর উচ্চারণ 'ও' এবং তার চিহ্ন হল শূন্য বা ϕ। অর্থাৎ ঐ ও-এর (মূলত অ-এর) কোনো চিহ্ন নেই। উচ্চারণের সমতার জন্য এখানে ঐ ϕ-এর বদলে ও-কার যদি কেউ দিয়ে ফেলেন তা অযৌক্তিক হবে না; কিন্তু বানানরীতি তো উচ্চারণের যুক্তি মেনে চলে না, তাই 'বাঁদোর' লিখলে বানানভুল হবে। এখানে, এই বিশেষ ক্ষেত্রে দেখতে

পাচ্ছি বানানে ϕ চিহ্ন এবং ও-কারের মধ্যে পরস্পর বিনিময়-সম্বন্ধ আছে, একটি আরেকটিকে স্থানচ্যুত করতে পারে। অনেক জায়গায় ও-কারকেও ϕ চিহ্ন (অর্থাৎ চিহ্নের অনুপস্থিতি) স্থানচ্যুত করছে —ও-কার যেখানে লেখার কথা সেখানে লেখা হচ্ছে না—এমন দেখতে পাই। আমরা কিছু উদাহরণ দিয়ে ϕ আর ও-কারের এই বিকল্পন (substitution)-এর ঘটনা দেখাতে পারি —ϕ-এর জায়গায় ও-কার: বাঁদোর, মাদোল, কাপোড়, বোতোল পাগোল, স্বপোন আসোল ইত্যাদি। কখনো কখনো বানানে এটা স্বীকৃতিও লাভ করে, যেমন মতো, ওব্যেস, কালো, দরোজা, ভালো ইত্যাদি। ও-কারের জায়গায় ϕ-এর বিকল্পন ঘটছে বুড় (বুড়ো —দ্র 'বুড়' সালিকের ঘাড়ে রোঁ) হুড়হুড়ি. মুচ্ছ', প্রয়জন, আরহণ, পুরান (পুরানো) তিলত্তমা, ভৌগলিক, পৌরহিত্য ইত্যাদি শব্দে। এর কতকগুলি এক সময় প্রচলিত ছিল, এখন নেই। বাকিগুলি অগৃহীত।

এই ধ্বনি এক, অথচ চিহ্ন একাধিক —এবং সে চিহ্নগুলি একে অন্যের সঙ্গে বদলে যেতে পারে —এখানেই বাংলা বা অন্যান্য ভাষায় বানানভুলের আসল উৎস। 'ই' ধ্বনিটির জন্য দুটি চিহ্ন পাই ই, ঈ; এমন কী জায়গা বিশেষে য়ি, য়ী। ব্যঞ্জনের পর একই ধ্বনি ি বা ী-কার দিয়ে লেখা হয়। অবশ্য মনে রাখতে হবে যে সব ধ্বনির সব কটি বিকল্পের মধ্যে বিনিময়-সম্পর্ক (substitution relation) একরকম নয়। ি-ী চিহ্ন দুটির যত সহজে পরস্পরের মধ্যে বিনিময় ঘটতে পারে, ই, ঈ-র বিনিময় তত ঘন ঘন হতে পারে না। তার একটাই কারণ: ঈ-র ব্যবহার-স্বল্পতা— বাংলাভাষায় ঈ-দিয়ে লেখা শব্দের সংখ্যা হাতে গুনে বলা যায়। কিন্তু ধরুন যুক্তব্যঞ্জনচিহ্ন 'ত্ত'। একে অর্থাৎ এর ধ্বনিকে পাঁচ ভাবে বাংলায় লেখা সম্ভব …ত্ত, ত্ব, ত্ত্ব, ত্য এবং ত্ম। 'ৎত' হিসাবেও লেখা চলে, কিন্তু বাংলায় এ প্রয়োগ নেই বলে তার সঙ্গে ত্ত-এর বদল বা বিনিময়-সম্পর্ক স্থাপন করা সম্ভব নয়। এমন কী 'ত্ম'-এর সঙ্গেও ত্ত-এর বিনিময়-সম্পর্ক আছে কি না তা সংশয়স্থল, এবং থাকলেও তা উভয়মুখী নয়, মূলত একমুখী; অর্থাৎ 'ত্ম'-এর বদলে 'ত্ত' লেখা যত সম্ভব, ত্ত-এর বদলে 'ত্ম' লেখা তত সম্ভব নয়। ই-ঈ-র বিনিময় সম্পর্কেও আছে একমুখিতা, উভয়মুখিতা কম।

চিহ্ন —অর্থাৎ আস্ত বর্ণ ও তার রূপভেদ (কার, ফলা ইত্যাদি) জুড়ে জুড়ে শব্দের বানান লিখি আমরা। যে চিহ্ন বা চিহ্ন-সমবায়ের মধ্যে ('ই' চিহ্ন, কিন্তু 'য়ি' চিহ্নসমবায়) বিনিময়-সম্পর্ক আছে সেগুলিকে বানানের একক বা ইউনিট ভেবে নিতে পারি আমরা। বানানের শুদ্ধতা মানে— একাধিক বিনিময়যোগ্য বানান-ইউনিটের মধ্যে একটি মান্য ইউনিট লেখায় সাফল্য। যারা বানানভুল করে, তারা ঠিক ইউনিটটিকে বসিয়ে দিতে পারে না।

ধরা যাক 'ঊর্ধ্ব' কথাটি। বানানের দিক থেকে বিশ্লেষণ করলে এর দুটি একক। 'ঊ' আর 'র্ধ্ব'। এই দুটি চিহ্নেরই একাধিক বিকল্প আছে বাংলা লিপিতে —এই বিকল্পগুলির মধ্যে বিনিময়-সম্পর্ক আছে। বাংলায় নতুন পুরনো বানান এক সঙ্গে ধরে নিয়ে বিনিময়-সম্পর্কযুক্ত একক-গুলিকে এভাবে সাজাই :

ঊ : উ, ঊ

র্ধ্ব : র্ধ, র্ধ্ব, দ্ধ, দ্ধ্ব (সেই সঙ্গে ভুল অক্ষরে দ্ব)

সামান্য গণিত ব্যবহার করে ঘাড়ে সংখ্যা বসিয়েও এই বিকল্পের সংখ্যা বোঝাতে পারি —ঊ ^{2} র্ধ্ব ^{4}। 'দ্ব'-কে আপাতত হিসাবের বাইরে রাখছি, কারণ 'দ্ব' যে 'ঊর্ধ্ব'-তে লিখবে সে পুরোপুরি লেখার নিয়মই শেখেনি। তার বানানে শব্দটির উচ্চারণও প্রতিফলিত হচ্ছে না।

বিকল্পের সম্ভাব্য সংখ্যা থেকে আমরা শুদ্ধ ও ভুল বানানের মোট সম্ভাব্য সংখ্যাও নির্ধারণ করতে পারি। 'ঊ'-এর দুটি বিকল্প আর 'র্ধ্ব'-এর চারটি বিকল্প, সুতরাং সব মিলিয়ে 'ঊর্ধ্ব' কথাটির মোট বানান হতে পারে ৪×২=৮টি। সেগুলি হল, উর্ধ, ঊর্ধ, উর্ধ্ব, ঊর্ধ্ব, উদ্ধ, ঊদ্ধ, উদ্ধ্ব, ঊদ্ধ্ব। কিন্তু নতুন এবং পুরোনো নিয়মে এর মধ্যে মাত্র দুটি 'শুদ্ধ' বানান। কাজেই ৮টি বানান-সম্ভাবনার মধ্যে ছ-টিই অশুদ্ধ থেকে যাচ্ছে।

ধরা যাক X হল বানানভুলের সম্ভাবনা এবং Y হল বানানের মোট বিকল্পের সম্ভাবনা। সেক্ষেত্রে ঊর্ধ্ব-এর ক্ষেত্রে বানানভুলের সম্ভাব্য সংখ্যাকে একটা ফর্মুলার আকার দেওয়া যেতে পারে, $X = Y - 2$। এর শুদ্ধ বানান এবং ভুল বানানের অনুপাত হল ২:৬। আমরা অবশ্য বাংলায় সাধারণভাবে শুদ্ধ যে দুটি রূপ, পুরোনো নিয়মে 'ঊর্দ্ধ্ব' ও নতুন নিয়মে 'ঊর্ধ্ব'—এই দুটিকেই আমরা হিসাবের মধ্যে ধরছি। মনিয়ের উইলিয়ামসের সংস্কৃত অভিধানে 'ঊর্দ্ধ' আছে ; তবে সেটিকেও বানানভুলের দৃষ্টান্ত হিসেবেই গ্রহণ করেছেন তিনি।

নতুন-পুরনো নিয়মের দুটি শুদ্ধ রূপের সমস্যা যেখানে নেই, যেখানে একটিই শুদ্ধ রূপ, সেখানে ঐ ফর্মুলা হবে $X = Y - 1$। যেমন দায়িত্ব শব্দটির বানানে। এর একক হল পাঁচটি চিহ্ন —'দ', 'া', 'ি', 'য়' এবং 'ত্ব'। এই এককগুলির বিকল্পের হিসেব এইরকম :

দ→দ, দ্ব (শেষেরটি শব্দের গোড়ায়)

া→া

ি→ি, ী

য়→য়

ত্ব→ত্ব, ত্ত, ত্ত্ব ('ত্ম'-কে বিকল্প ধরছি না)

অর্থাৎ সংকেত অনুসারে —দ^2 + া^{1} + ি^{2} + য়^{1} + ত্ব^3। তার অর্থ হল এর বিকল্প বানান হতে পারে সব মিলিয়ে মোট ২×২×৩=১২টি —দায়িত্ব, দায়িত্ত; দায়িত্ত্ব; দায়ীত্ব; দায়ীত্ত; দায়ীত্ত্ব; দ্বায়িত্ব; দ্বায়িত্ত; দ্বায়িত্ত্ব; দ্বায়ীত্ব; দ্বায়ীত্ত; দ্বায়ীত্ত্ব। কেউ কেউ উল্লেখ করতে পারেন যে দ্ব-এর উচ্চারণ যেমন শব্দের গোড়ায় দ তেমনি দ্য-এরও তো শব্দের গোড়ায় ওই একই উচ্চারণ; তবে কেন দ-এর সঙ্গে 'দ্য'-এর এক্ষেত্রে বিনিময়-সম্পর্ক তৈরি হবে না? এর উত্তর হল, 'দ্ব' এখানে নিছক বিনিময়-সম্পর্কের জন্য আসে না, আসে এমন একটা বিশ্বাস থেকে যে ব-ফলা এ বানানে কোথাও একটা আছে। বলা বাহুল্য 'ত্ব'-এর সংস্কারই এর মূলে। ত্ব-এর ব ফলাই স্থানান্তরিত হয়ে দ-এর নিচে চলে যায়। সেদিক থেকে 'দ্য' আসার কোনো সম্ভাবনা নেই। নেই আরো এক কারণে যে, বাংলা শব্দের আদিতে 'দ্য' খুব বেশি শব্দে নেই। এই frequency-র বিরলতা বানানে দ্য-এর সংখ্যাবৃদ্ধির সহায়ক নয়।

কিন্তু উপরের ঐ বারোটি বানানের মধ্যেই শুধু 'দায়িত্ব'-এর বানান সম্ভাবনা সীমাবদ্ধ নয়। আমরা ওখানে এ বানানের পাঁচটি ইউনিট ধরেছি —দ, া, ি, য়, ত্ব। লক্ষ করা যাবে যে, দুটি ইউনিটের সঙ্গে একটি ইউনিটের বদলে ঘটতে পারে, যদি উচ্চারণের সমর্থন থাকে। যেমন 'য়ি'—এই দুটি ইউনিটের বদল কেউ 'ই' বসিয়ে 'দাইত্ব' লিখতে পারেন, কিংবা 'ঈ' বসিয়ে 'দাঈত্ব'। শেষেরটা, বলা বাহুল্য, সম্ভাবনার হিসেবে খুব প্রবল নয়, কারণ প্রচলিত বাংলা শব্দের মাঝখানে 'ঈ'-এর ব্যবহার নেই। 'দাইত্ব' তো অনেক দেখা যায়। ১৯৭৮ নাগাদ ৪৫ নম্বর রুটের WBS 2855 বাসে আমি 'দাইত্ব' বানান দেখেছিলাম। 'দায়ীত্ত্ব' দেখেছিলাম ঐ রুটেরই WBS 3580 নম্বর বাসে। 'দ্বায়ীত্ব'-ও লক্ষ করেছিলাম এই রুটেরই আরেকটি বাসে। এত সব মিলিয়ে এ বানানে ভুলের সম্ভাবনা ২৩ আর শুদ্ধ বানান মাত্র ১ দাঁড়ায়! এই অবস্থায় ভুল না করে নিস্তার আছে!

বাস্তবে যে এত রকমের ভুল দেখা যায় না তার কারণ সমস্ত বিকল্পগুলি সমান সম্ভব নয়, বারংবারতা বা frequency অনুযায়ী কোনোটি বেশি সম্ভব, কোনোটি কম; কোনোটি হয়তো আদৌ দেখা যায় না। 'ঊর্ধ্ব' বানানের 'ঊ'-টি বাংলা লেখায় যত চোখে পড়ে, 'র্ধ্ব' তার চেয়ে চোখে পড়ে অনেক কম। 'র্ধ্ব' বা 'র্দ্ধ্ব' আর কোনো বাংলা শব্দে নেই। কাজেই এই বানানে দ্বিতীয় ইউনিটটিতেই ভুলের সম্ভাবনা বেশি। দ্বিতীয়ত, উচ্চারণের একটা সংস্কার লেখকের মনের মধ্যে থাকে; সেই উচ্চারণের দিক থেকে 'র্ধ্ব'-এর ব-ফলার কোনো ভূমিকা নেই —তা অতিরিক্ত চিহ্ন। সেজন্য ব-ফলাহীন 'ঊর্ধ' বানানের এত প্রাচুর্য। এই বারংবারতা, এবং

মনস্তাত্ত্বিক চাপ ও সংশয়ের ফলে একই বানান হয়তো একাধিকভাবে লেখা হয়ে যায় —এক পৃষ্ঠায় যে 'তেজস্বিতা' লিখল পরের পৃষ্ঠায় সে অনায়াসেই 'তেজস্বীতা' লিখে উঠতে পারে। আবার কেউ কেউ ঐকান্তিক হয়ে পড়ে, সবটাতেই দীর্ঘ ঈকার বা দীর্ঘ-ঊকার দিয়ে যায়, যেমন 'ভূজ', 'রঘূপতি', 'অদ্ভূত', 'স্নায়ূ' ইত্যাদি।

বারংবারতার সঙ্গে জড়িয়ে আছে অনুষঙ্গের প্রশ্নটি। এর আগে আমরা দেখেছি যে 'দায়িত্ব' বানানে ত্ব-এর অনুষঙ্গে ন্ব এসে যায়। আর বারংবারতারও কোনো সহজ হিসাব নেই। পুজোর সময় দীর্ঘ-ঊকার-ওয়ালা ভুল 'দূর্গা' বানানের ব্যানারে কলকাতা ছেয়ে যায়। অথচ 'দু'-এর বারংবারতাই তো বেশি অনুপাতে; 'দূ' তো দূর্বা ছাড়া আর কোথাও দেখি না। তবে কি 'দূর'-এর সাদৃশ্যে আসে 'দূর্গা'? না কি পূজা-র অনুষঙ্গে দীর্ঘ ঊ-কার চলে আসে? না কি রেফওয়ালা ব্যঞ্জনবর্ণ পরে থাকলে তার আগে সাধারণভাবে দীর্ঘ-ঊকারযুক্ত ব্যঞ্জনের সংখ্যাধিক্যই এর কারণ —কূর্ম, চূর্ণ, তূর্য, পূর্ণ, পূর্ব, মূর্ধা, সূর্য-তে যেমন। তেমনই 'ভুল' বানান কি 'ভূল' হয় কূল, মূল, শূল-এর অনুষঙ্গে? না কি 'ভূত' এর প্রভাবে? 'ভূত'-এর জন্য 'অদ্ভুত' 'অদ্ভূত' হয় তা সুনিশ্চিত, এমন কী 'ভুজ', 'ভূজ' হয়ে পড়ে তাও অনুমানযোগ্য। ভুবন ঠিক একই কারণে হয় 'ভূবন'। তবে 'ভূত'-এর পাশাপাশি 'ভূমি' বা 'ভূ' এর একটা টানও আছে বই-কি।

অন্য বানান ও লিপি-অভ্যাসের বিশেষত্বের ফলেই সাধারণত উপরের ভুলগুলি ঘটে। একদিকে একাধিক সম্ভাবনার মধ্য থেকে যথার্থ চিহ্নটিকে তুলে আনতে না-পারা, এবং সেই সংশয়ের মধ্যে অন্য বানানের সাদৃশ্যের চাপ —দুয়ে মিলে বানানভুলের সম্ভাবনা প্রবলতর করে তোলে।

উচ্চারণের প্রত্যক্ষ প্রভাবে যে বানানভুল ঘটে তার উদাহরণ ঐ বাঁদোর। এর প্রভাবেই স্বীকৃত বানান-রীতিও আস্তে আস্তে বদলায়। 'কোরে' (='করিয়া'), 'হোলো', 'দেখবো', 'দ্যাখে', 'ওলোট-পালোট', 'পোশাক' ইত্যাদি বানান এখন আর ভ্রূকুঞ্চন জাগায় না —যদিও এর ফলে একই শব্দের বহু বিকল্প বানান তৈরি হয়েছে৫। তা নিয়ে সমস্যা আছে।

উচ্চারণ-সাদৃশ্য থেকে বানান-সাদৃশ্য এবং তার ফলে বানান-পরিবর্তনের দৃষ্টান্ত হল 'কাঁচ'। 'কাচ'ই স্বীকৃত বানান —কিন্তু 'কাঁচা', 'কাঁচি' ইত্যাদির উচ্চারণের সাদৃশ্যে তার উচ্চারণ 'কাঁচ' হয়ে দাঁড়ায় —বানানও ক্রমশ সেখানে পৌঁছায়। 'হাঁস' বা 'হাঁসফাঁস'-এর প্রভাবে হয় 'হাঁসি' বা 'হাঁসপাতাল'। যারা স্ট্যাণ্ডার্ড বা মান্যভাষা ততটা জানে না, তাদের লেখায় স্থানীয় উচ্চারণ-প্রবর্তিত বানানভুলও লক্ষ করি। 'খুজরো', 'টুগরো'

'চাঁওচ' (=চামচ) দেখেছি, দু-এক জায়গায় 'আমনারা' (আপনারা)-ও চোখে পড়েছে। 'বাস্‌কো' বা 'বাস্ক' তো খুবই দেখা যায়।

ঠিক চিহ্নটি ঠিক জায়গায় বসানো —এই হল শুদ্ধ বানান লেখার রহস্য। উচ্চারণের নিয়ম থেকে লেখার নিয়ম আলাদা, সে-নিয়ম আলাদা করে শিখতে হয়। কখনো একটি নিয়ম শুধু একটি শব্দের জন্য —যেমন 'উধ্ব'র বেলায়; কখনো কয়েকটি শব্দের জন্য। কথার নিয়মের সঙ্গে সেগুলির সাক্ষাৎ যোগ নেই। কথার বা উচ্চারণের নিয়ম আমরা মানি অভ্যাসে; অবশ্য যাঁরা মান্যভাষা বলেন তাঁদের ক্ষেত্রেই একথা সত্য। অন্যদের উচ্চারণও শিখতে হয়, যেমন শিখতে হয় বানান। স্বভাব থেকে সংস্কৃতিতে পৌঁছানোর নামই শিক্ষা —শুদ্ধ উচ্চারণ ও শুদ্ধ বানান সেই শিক্ষা ও সচেতনতার পরিচয় বহন করে[৬]।

২. বাংলা বানান সংস্কার : সম্ভাবনা, সীমাবদ্ধতা

১. বানান-উচ্চারণে অসংগতির ঐতিহাসিক উৎস

মূলত ব্রাহ্মী লিপি ও বর্ণমালা থেকে খ্রীষ্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দী বা তারও একটু আগে ভারতীয় বর্ণমালার মূল ছাঁচটি গড়ে ওঠে। সংস্কৃতভাষা লেখায় বর্ণমালার যে-ছাঁচটি প্রথম তৈরি হয়, তা-ই কালক্রমে প্রায় সমস্ত ভারতীয় বর্ণমালার আদর্শ হয়ে ওঠে। বলা বাহুল্য, সিন্ধি, উর্দু, কাশ্মীরি ইত্যাদি কয়েকটি ভাষায় কেবল আরবি-ফারসি বর্ণমালা যৎকিঞ্চিৎ রূপান্তরে গৃহীত হয়েছে। কিন্তু সংস্কৃত বর্ণমালার ওই ব্রাহ্মীভিত্তিক ছাঁচটির উপর নির্ভর করে যত পরবর্তী ভারতীয় বর্ণমালা গড়ে উঠেছে তার আদল পরবর্তী ভাষাগুলির ধ্বনিচরিত্রের যথাযোগ্য প্রতিফলন আদৌ হয়ে উঠতে পারেনি। দক্ষিণ ভারতীয় বর্ণমালাগুলি এ বিষয়ে খানিকটা স্বাধীনতা দেখিয়েছে, কিন্তু উত্তর ভারতীয় বর্ণমালায় এই অসংগতি আরো প্রকট। গুরমুখি, গুজরাটি, দেবনাগরী, বাংলা, ওড়িয়া ইত্যাদি লিপি কম-বেশি কাছাকাছি সময়ে বিবর্তনের ফলে সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু বাংলা বা অসমীয়া বর্ণমালার সঙ্গে এই দুটি ভাষার ধ্বনি-উপাদানের যে দূরত্ব তা অন্য ভাষা ও লিপির চেয়ে অনেক বেশি। যেমন বাংলায় আমরা বলি বিশ্‌শঁয়্, কিন্তু লিখি বিস্ময়, যার মূল উচ্চারণ ছিল খানিকটা 'wismaya'-র মতো। অসমীয়াতে 'অসম সাহিত্য সভা' উচ্চারিত হয় 'অহম হাহিত্ত হভা'।

এর কারণ কি শুধু ভাষার ধ্বনি-উপাদানের পরিবর্তন? সংস্কৃত ভাষায় যে-ধ্বনিগুলি ছিল সেগুলি সে-ভাষার বর্ণমালা দিয়ে হয়তো মোটা-মুটি যথাযথভাবেই লেখা হত। মোটামুটি বলছি এই কারণে যে, সংস্কৃতেও উপভাষাভেদ ছিল এবং কোনো-কোনো ধ্বনির উচ্চারণ উপভাষাভেদে ভিন্ন হত। কিন্তু বাংলাভাষা যখন সংস্কৃত বর্ণমালাকে তার মূল বিন্যাস অবিঘ্নিত রেখে তার নিজস্ব চেহারায় অনুবাদ করে নেয়, তখনই বাংলার ধ্বনিগুলি সংস্কৃতের ধ্বনি থেকে নানা জায়গায় আলাদা হয়ে গেছে।

কিন্তু এই আলাদা ধ্বনি-চরিত্রের যে-বাংলাভাষা, তা যদি পালি বা প্রাকৃতের মতো নিজের ভাষার সমস্ত শব্দ নিজের উচ্চারণ মেনেই বানান লিখত

তাহলে বর্ণমালা তার খুব বড় বাধা হয়ে উঠত না। তাকে কিছু বর্ণ ও চিহ্ন হয়তো বর্জন করতে হত, কিংবা হয়তো একটিদুটি নতুন চিহ্ন উদ্‌ভাবন করতে হত (বা হত না), কিংবা আরো দু-এক জায়গায় একটু সংশোধন-সম্মার্জন করতে হত। এই সাহসটুকু দেখালে তাতেই বাংলার নিজস্ব বানান-রীতি গড়ে উঠত, তার ভাষা যেমন আলাদা, তার বানানও তেমনই আলাদা হয়ে যেত।

যে-কারণেই হোক, আমাদের আদি লিপিকররা সেই সাহস দেখাতে পারেননি। এখানে মনে রাখতে হবে যে, অধিকাংশ লিপিকর সমস্ত শব্দের নির্ভুল বানান জানতেন কি না তাতেও সন্দেহ আছে, ফলে ছাপাখানা আসার আগে বানানের কোনো সুনির্দিষ্ট, স্ট্যাণ্ডার্ডই তৈরি হয়নি। ইউরোপের বিভিন্ন ভাষার বানানের ক্ষেত্রেও এমনই ঘটেছে। তবু বাঙালি লিপিকরদের লেখায় অন্তত সংস্কৃত ভাষা থেকে নিয়ে-আসা শব্দগুলির বানানের একটা স্ট্যাণ্ডার্ড বা আদর্শ তৈরি হয়েছিল। সেটি খুব সহজ নীতি —সংস্কৃত শব্দ লিখতে গিয়ে তাঁরা সেগুলিকে বাংলা লিপিতে লিপ্যন্তর করতেন মাত্র, সেগুলির উচ্চারণ বাংলায় কী দাঁড়াচ্ছে সেদিকে দৃক্‌পাত করতেন না। ফলে তৈরি হতে লাগল বাংলায় 'তৎসম' শব্দের সম্ভার —যেগুলির বানান সংস্কৃতের মতো, কিন্তু উচ্চারণ বাংলার নিজস্ব।

এবার এই বিষয়টিকেই একটু ব্যাপক জায়গা থেকে দেখা যাক। প্রত্যেক ভাষার ভাণ্ডারেই সে-ভাষার শব্দের একাধিক উৎস থাকে। কিছু শব্দ বহু-দিন থেকে তার ভাণ্ডারে আছে, উচ্চারণে ও বানানে সেগুলিকে সে নিজস্ব করে নিয়েছে, সেগুলি সে-ভাষার নিজস্ব ব্যাকরণ থেকেই গড়ে উঠেছে। কিন্তু যে-ভাষা ক্রমশ বেড়ে ওঠে, তার কেবল ওই নিজস্ব শব্দে প্রয়োজন মেটে না, তার শব্দের চাহিদা বাড়তেই থাকে, এবং তখন সে অন্য ভাষা থেকে শব্দ ধার নিতে থাকে। এই শব্দঋণ (loanwords) যদি এমন ভাষা থেকে আসে যার লিপি গ্রাহক ভাষাটি থেকে আলাদা তাহলে গ্রাহক ভাষার ক্ষেত্রে বানানের যে-সমস্যা দেখা দেয় সেটির সমাধান অপেক্ষাকৃত সরল ; ভাষায় যে-উচ্চারণে শব্দটি গৃহীত হয়েছে তার যোগ্য প্রতিফলন ঘটে এমন একটি বানান গড়ে তোলা।

যদি এমন হয় যে, শব্দটির উচ্চারণ হচ্ছে মূল ভাষার মতো করে, এবং সে উচ্চারণ যথাযথভাবে প্রতিফলিত করার উপায় গ্রাহক ভাষায় নেই, তাহলে ভাষার চালু লিপিতে কি নতুন বর্ণ বা চিহ্ন উদ্‌ভাবন / সম্প্রয়োগ করতে হবে ? অনেক ক্ষেত্রে তা করতেও হয়। যেমন বাংলায় ইংরেজির [z]-এর মতো ধ্বনি বোঝানোর জন্য উপভাষার সংলাপ লিখতে পরশুরাম "zানতি পার না" লিখেছিলেন, বুদ্ধদেব বসু জার্মান [w] ধ্বনির জন্য ব্যবহার করেছিলেন 'হ্ব'। অনেক ক্ষেত্রে সহায়ক চিহ্ন বা ডায়াক্রিটিক্‌স ব্যবহার করা

হয়। যেমন ওই [z] ধ্বনির জন্যই হিন্দি-দেবনাগরীতে, এবং কেউ কেউ বাংলায় বগী'য় জ-এর নিচে একটি ফুটকি বসিয়ে করে দেবেন জ.।

কিন্তু যদি এমন হয় যে, শব্দটি যে-ভাষার, সে ভাষার লিপিচরিত্র (লিপির চেহারা নয়) গ্রাহক ভাষার সঙ্গে মোটামুটি এক, যেমন বাংলা ও সংস্কৃতের; ইংরেজি-ফরাসি-স্প্যানিশ এবং লাতিন ও গ্রীকের; উর্দু ও আরবি-ফারসির। সে ক্ষেত্রে বেশির ভাগ শব্দ, বিশেষত সাহিত্য-শিল্পকলা-বিজ্ঞান ইত্যাদি সম্পর্কিত উন্নত সাংস্কৃতিক শব্দ —মূলত লেখা থেকে লেখায় ধার করা হয় বলে অনেক সময় কেবল লিপ্যনুবাদ ঘটে, যেমন ঘটেছে সংস্কৃত শব্দ বাংলায় ধার করার ক্ষেত্রে, এক লিপির হুবহু বর্ণরূপান্তর করে বাংলা লিপিতে তাকে সাজানো হচ্ছে,—কিংবা গ্রীক থেকে ইউরোপীয় ভাষাগুলিতে শব্দ লেখার ক্ষেত্রে। আবার লাতিন থেকে ইউরোপের রোমক-লিপি ব্যবহারকারী ভাষাগুলির ক্ষেত্রে লিপ্যনুবাদও করতে হচ্ছে না, লাতিন বানানটিকেই রেখে দেওয়া হচ্ছে।

লিপ্যনুবাদের কিছু উদাহরণ লক্ষ করি। ইংরেজিতে গ্রীক ভাষার বেশ কিছু শব্দ ধার করে ব্যবহার করা হয় যেগুলির আরম্ভে আছে pn-(যেমন pneumonia, pneumatic), ps-(psychology), pt-(pterodactyl) ইত্যাদি। শব্দারম্ভের ওই দুটি ব্যঞ্জনের মধ্যে [p]-টির উচ্চারণ ইংরেজিতে নেই। তবু ইংরেজি ওটাকে রক্ষা করছে কেন? করছে লিপিকরদের রক্ষণশীলতা এবং গ্রীকের প্রতি ভাষা-ভক্তির কারণেও —তাঁরা সে মহৎ 'ক্লাসিক্যাল' ভাষার বানানের অঙ্গহানি করতে রাজি হননি। সংস্কৃত থেকে নেওয়া বাংলা শব্দের ক্ষেত্রেও এই একই ঘটনা ঘটছে। এই 'তৎসম' শব্দগুলিকে সাধারণত সাক্ষর লোকেরা সংস্কৃত লেখা থেকে বাংলা লেখায় সরাসরি নিয়েছেন, ফলে বানানটি অক্ষত রেখেছেন। উচ্চারণ করার সময় অবশ্য তাঁরা বাঙালি ধরনের উচ্চারণই করেছেন, কিন্তু উচ্চারণ ও বানানের বিষমতা সম্বন্ধে তাঁদের মনে কোনো অসন্তোষ তৈরি হয়নি। এই সঙ্গে ছিল সংস্কৃত অর্থাৎ 'দেবভাষা'র প্রতি ভক্তি, ফলে উচ্চারণ যা-ই করি না কেন, বানান তাঁরা বদলাতে ভরসা পাননি। উর্দু বানানেও ঠিক একই ব্যাপার লক্ষ করি। আরবি-ফারসি বর্ণমালায় স-শ ধ্বনির প্রতীক মাত্র দুটি নেই, আছে চারটি—সে, সিন্, শিন্ ও সোয়াদ্। অথচ উর্দু ভাষার উচ্চারণে স-শ-এর পার্থক্য ছাড়া আর কোনো পার্থক্য নেই। ফলে সে, সিন্ ও সোয়াদ্ এই তিনটি প্রতীক 'স' বা ইংরেজি [s]-এর ধ্বনি বোঝাতে ব্যবহার করা হয়, শিন্ ব্যবহার করা হয় শ বোঝাতে। মূলের বানান বিষয়ে রক্ষণশীলতাই এর কারণ।

ঋণগ্রহণ, বিশেষত এক বা একধরনের লিপি-আশ্রিত ভাষা থেকে ঋণগ্রহণ যে গৃহীত শব্দের বানান ও উচ্চারণের বৈষম্যের কারণ তা আমরা

লক্ষ করলাম। এ বৈষম্যের আরো একটি কারণ আছে। তা ভাষার অন্তর্গত কারণ, অন্য ভাষার সঙ্গে তার সম্পর্ক নেই। এমন প্রায়ই দেখা যায় যে কোনো ভাষায় শব্দের উচ্চারণ বদলেছে, কিন্তু তার বানান বদলায়নি। যেমন ইংরেজি night, bright ইত্যাদি। এ শব্দগুলির মাঝখানে যে gh আছে তা প্রাচীন ইংরেজিতে বা জার্মানে উচ্চারিত হত, daughter-এর gh যেমন হত। কালক্রমে ওই gh উচ্চারণ লুপ্ত হয়েছে, তার পূর্ববর্তী স্বরধ্বনিটিও ই থেকে আই হয়ে গেছে। কিন্তু শব্দগুলির বানান উচ্চারণ পরিবর্তনের সঙ্গে তাল রেখে বদলানো সম্ভব হয়নি। ফরাসিতেও বহু শব্দে প্রাচীন বানান উচ্চারণের পরবর্তী পরিবর্তন সত্ত্বেও অক্ষুন্ন আছে। সুতরাং ভাষার নিজস্ব বিবর্তনও বানান এবং উচ্চারণে অসংগতি তৈরি হওয়ার অন্য এক কারণ। বাংলা ভাষায় দীর্ঘ স্বরের উচ্চারণ নেই, কিন্তু 'বাড়ী', 'গাড়ী', ইত্যাদি বানান আমরা এখনও প্রচুর দেখতে পাই।

২. বর্ণমালা ও লিপি-পদ্ধতি এবং বানান

সংস্কৃত বর্ণমালার ছাঁচকে প্রায় অব্যাহতভাবে বাংলা লেখার জন্য গ্রহণ করার ফলে বাংলা বর্ণমালা ও লিপি-পদ্ধতি অর্থাৎ তার বানান-পদ্ধতির সঙ্গে বাংলা শব্দের উচ্চারণের যেসব অসংগতি তৈরি হয় তা আমরা আগের অধ্যায়ে আলোচনা করেছি। সেই পাঁচটি অসংগতি, অর্থাৎ এক, ধ্বনি আছে কিন্তু তা লেখার নিজস্ব ও পৃথক কোনো বর্ণ নেই, যেমন [æ] ধ্বনির ক্ষেত্রে ; দুই, বর্ণ আছে কিন্তু তার উচ্চারণ লুপ্ত, ফলে এক ধ্বনির একাধিক প্রতীক ; তিন, এক বর্ণের যৌগিক বা একাধিক ধ্বনির সম্মিলিত উচ্চারণ, যেমন ঐ, ঔ ; চার , ধ্বনি-চিহ্নের পরিবেশগত বিকার বা অ্যালোগ্রাফের আধিক্য ; এবং পাঁচ, বর্ণগুলির উচ্চারণভেদ, যেমন অ কখনো অ, কখনো ও —বাংলা বানানে পাঁচরকম সমস্যার সৃষ্টি করে। এই সমস্যাগুলির চারটিকে বর্ণমালার উপাদান বা কনটেন্টের সমস্যা বলতে পারি। বাংলা বর্ণমালার সংগঠনগত রূপ বা ফর্মের সমস্যাও আছে। সেটিকে পাশ্চাত্ত্যের রোমক বর্ণমালার সঙ্গে তুলনা করে এইভাবে বোঝানো হয়ে থাকে যে, বাংলা বর্ণমালার লিপিপদ্ধতি সেরকম একরৈখিক বা "লিনিয়ার" নয় ; কথায় আমরা ধ্বনিগুলিকে পরপর যেভাবে উচ্চারণ করে যাই লেখায় তাদের বর্ণপ্রতীকগুলিকে ঠিক হুবহু সেই ক্রমে সাজাই না। বিশেষ করে গৌণ চিহ্ন (secondary symbols) হ্রস্ব-ই কার হ্রস্ব-উ কার ইত্যাদির বেলায় দেখি, হ্রস্ব-ই কার (ি), এ-কার (ে), ঐ-কার (ৈ) ব্যঞ্জনের পরে উচ্চারিত ই, এ, ঐ-এর সূচক হলেও তা ওইসব ব্যঞ্জনচিহ্নের আগে

বসছে। যেমন 'তিনি' কথাটিকে উচ্চারণ করছি ত্+ই+ন্+ই কিন্তু লিখছি ি+ত+ি+ন। আবার হ্রস্ব-উ কার দীর্ঘ-উ কারের ক্ষেত্রে দেখি তা ব্যঞ্জনের তলায় গিয়ে বসছে, সেখানে বর্ণবিন্যাস অনুভূমিক (horizontal) নয়, উল্লম্ব (vertical); ব্যঞ্জন উপরে, স্বরচিহ্ন তলায়। যুক্তব্যঞ্জন-চিহ্নেও অনেকটা এই ঘটনাই ঘটছে। ও-কার ঔ-কারে আবার দেখি দুটি চিহ্ন দুদিক থেকে এসে আগে পিছনে বর্ণটিকে ঘিরে রাখছে। 'লিনিয়ারিটি' এইভাবে নানা দিক থেকে ব্যাহত হচ্ছে। হাতের লেখায় ও হাত-কম্পোজের সাধারণ টাইপে (বর্তমানে কিছু ফটো-টাইপে) ব্যবহৃত বর্ণমালার ফর্মের আরো নানা জটিলতা আছে, একই বর্ণচিহ্নের রূপগত বিভিন্নতা বা allo-graph-এর প্রাচুর্য যেমন। এক উ ধ্বনিটির উ, ু এই দুটি চেনা লেখ্য রূপের পাশেও 'রু' 'হু' 'শু' ইত্যাদি বর্ণগুলি লক্ষ করলে উকারের আরো তিনটি চেহারা পাই। কিন্তু বানান-সমস্যার সঙ্গে allograph-এর সংখ্যাধিক্যের সম্পর্ক প্রত্যক্ষ নয়, যদিও এ ঘটনাটি শিশুর বর্ণপরিচয় প্রক্রিয়াকে কঠিন করে তোলে।

বানান সংস্কার করতে গিয়ে যদি লিপি-পদ্ধতি সংস্কারের প্রশ্ন ওঠে তাহলে প্রথমে করতে হবে বর্ণমালা সংস্কার, অর্থাৎ বর্ণমালার সেই উপাদান বা কনটেন্টের সংস্কার। বাংলা উচ্চারিত ধ্বনি বা ফোনিম ও তার বর্ণচিহ্নের মধ্যে যে পাঁচ ধরনের বি-সংগতি আছে সেগুলিকে বিলুপ্ত করে বা কমিয়ে এনে শিষ্ট চলিত বাংলার উচ্চারিত ধ্বনিবর্গ এবং বর্ণমালার চিহ্নগুলির মধ্যে একটি সরাসরি সহজ সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে। এ বিষয়ে পাশ্চাত্ত্যের ভাষাবিজ্ঞানীদের দেওয়া নীতি হল 'এক ধ্বনি, একটি প্রতীক'—one sound, one symbol। অর্থাৎ ধ্বনি ও বর্ণচিহ্নের সম্পর্কটি হল অন্যোন্য—one-one correspondence।

কিন্তু পাশ্চাত্ত্যের ধ্বনিবিজ্ঞানী, বিশেষত বর্ণনাপন্থীদের (ডেস্‌ক্রিপ্‌টি-ভিস্টদের) এই নীতি পাশ্চাত্ত্যের বাইরেকার লিপিগুলির মূল চরিত্র সম্বন্ধে বিশেষ বিবেচনার পরিচয় বহন করে না। তাঁদের অনুকরণ করে যাঁরা 'বিশ্বাস'-কে 'বইশ° শআশ°' বা 'বিশ° শাশ°' লেখার সুপারিশ করেন তাঁরাও বাংলা বর্ণমালার বিশেষ চরিত্র বিষয়ে একটু উদাসীন থাকেন বলে মনে হয়। বাংলা বর্ণগুলির চেহারা যেমন আছে তেমনি রেখে আমাদের লিপি-পদ্ধতিকে লিনিয়ার করলে লেখার সময় ও শ্রম দুইই অনেক বেড়ে যাবে। 'রবীন্দ্রনাথ' কথাটিকে 'রবীন°দ°রনাথ' বা 'স্ত্রী'-কে 'স°ত°রী' লেখার চেষ্টায় এই বিষয়টি ধরা পড়বে। রোমক বর্ণগুলি লিখতে সরল বা বক্রপথে রেখা যতখানি টানতে হয়, প্রায় প্রতিটি বাংলা বর্ণ লিখতে তার চেয়ে অনেক বেশি রেখা টানতে হয়। ফলে ইংরেজি-রোমক বর্ণের

লিখন-পদ্ধতির আদলে বাংলা লিপি-পদ্ধতিকে লিনিয়ার করার অসুবিধা আছে। অর্থাৎ তাতে সময় অনেক বেশি লাগে।

সময়ের এই হিসাবটা তুচ্ছ করবার মতো নয়। আমি নিচে রবীন্দ্রনাথের 'বীথিকা'র "বিদ্রোহী" কবিতাটির কয়েকটি পঙ্‌ক্তির জগন্নাথ চক্রবর্তী প্রস্তাবিত নতুন বানানে[২] পরিবেষিত রূপ দিচ্ছি—

পর্‌বতের অন্‌ন প্‌রান্‌তে ঝর্‌ঝরিয়া ঝরে
রাত্‌রিদিন
নির্‌ঝরিনি ;
এ মরুপ্‌রান্‌তের ত্‌রিশ্‌না হল শান্‌তিহিন
পলাতকা মাধুর্‌জের কলশ্‌শরে।
শুধু ওই ধনি
ত্‌রিশিত চিত্‌তের যেন বিদ্‌দুতে খচিত
বজ্‌রমণি
বেদনায় দোলে বক্‌খে।
কৌতুক্‌ছুরিত হাশ্‌শ তার
মর্‌মের শিরায় মোর তীব্‌রবেগে করিছে বিস্‌তার্‌
জালাময় ন্‌রিত্‌তস্‌রোত।

প্রথমত, এ বানান উচ্চারণকে হুবহু প্রতিফলিত করছে না, কারণ জগন্নাথবাবুর বানান-প্রণালীতে অন্য-অন্ন দুইই 'অন্‌ন' হিসাবে লেখা হবে, প্রথমটির উচ্চারণ যে 'ওন্নো' এবং দ্বিতীয়টির 'অন্নো' তা ধরা পড়বে না। দ্বিতীয়ত, যে-কোনো ধৈর্যশীল পাঠক মূল অংশটি একবার ঘড়ি ধরে লিখে, তারপর ঘড়ি ধরে এই অংশটি লিখে দেখুন, দেখবেন কত সময় বেশি লাগে। ১৯৮৫-র ওই সেমিনারে জগন্নাথবাবু সময়, দেখার সৌন্দর্য ইত্যাদির যুক্তিকে "অসার যুক্তি" বলেছেন। কেন "অসার"—বিশেষত লেখা অধিকাংশত লিখবে যখন মানুষ, যন্ত্রেরা লিখবে না, এবং মানুষের কাছে সময় ও সৌন্দর্যবোধ দুটোই জরুরি বলে আমাদের ধারণা —সেটি জগন্নাথবাবুর কথা থেকে আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়নি[৩]। আমরা এর সারত্ব অসারত্বের বিষয়টি পাঠকের বিচারের উপর ছেড়ে দিচ্ছি।

সময়ের এ অসুবিধা অবশ্যই হাতের লেখার দিক থেকে। কিন্তু ভারতবর্ষের মতো দরিদ্র ও বিশাল দেশে টাইপরাইটার বা অন্যান্য যন্ত্র ব্যবহারকারীর চেয়ে হাতের লেখা লেখবার মানুষ সব সময় প্রচুর বেশি থাকবে, তাদের কাজকে অযথা ভারাক্রান্ত করা উচিত কি না সেটা ভেবে দেখতেই হবে।

টাইপরাইটারেও এই নতুন লিখন-পদ্ধতি লেখার গতি ও দ্রুতি বৃদ্ধির

সহায়ক হবে না। আর যন্ত্রের কথাই যদি ধরি, তবে বাংলা মুদ্রণের সর্বাধুনিক ও ক্রমশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠা পি.টি.এস. বা ফটো-টাইপসেটিং যন্ত্রে বর্ণমালার তথাকথিত জটিলতা যে কোনো সমস্যাই নয়—তা মুহূর্তের মধ্যে যে-কোনো জটিল যুক্তব্যঞ্জনকে যে লিখে ফেলতে পারছে তা তো আমরা রোজই লক্ষ করছি। রোমক লিপি পুরোপুরি গ্রহণ করলেও যে সমস্যা হবে তা আমরা অন্যত্র আলোচনা করেছি[৪]।

এই মুহূর্তে মনে করি, বাংলা বর্ণমালায় হ্রস্ব-ইকার, এ-কার ইত্যাদি চিহ্ন ব্যঞ্জনের পরে লেখার ব্যবস্থা করলে (যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি থেকে অনেকেই এ প্রস্তাব দিয়েছেন), বর্ণের রূপভেদ বা অ্যালোগ্রাফের সংখ্যা কমালে (এখনই 'ত্রুটি', 'ক্রম', 'ভ্রম' ইত্যাদি বানানে এই ব্যাপারটি খানিকটা এগিয়েছে), এবং "অস্বচ্ছ" যুক্তব্যঞ্জনকে "স্বচ্ছ"[৫] করে আনলে, অর্থাৎ যেমন 'ঙ্গ' না লিখে 'ঙগ' লিখলে—বাংলা বর্ণমালা ও লিখন পদ্ধতির সংস্কারে কয়েকটা বড়ো ধাপ অগ্রসর হওয়া যাবে। কিছু অবান্তর বর্ণ—ং, ৎ ইত্যাদি বর্জনও করা যায়, এবং সমবর্গীয় নাসিক্যধ্বনির সঙ্গে যুক্তব্যঞ্জনে ° চিহ্নটি দেবনাগরীর মতো ব্যবহার করা যায়—যাতে 'অন্ত' হবে অ°ত', 'শঙ্খ' হবে 'শ°খ', 'মঞ্চ' হবে 'ম°চ' 'দণ্ড' হবে 'দ°ড' এবং 'সম্মান' হবে 'স°মান'—এতে অনেক যুক্তব্যঞ্জন চিহ্নের আর প্রয়োজন হবে না। এতে মুদ্রণের সুবিধা হবে[৬]।

৩. বানান সংস্কারের মূল এলাকা

লিপি বা লিপি-পদ্ধতির সংস্কারের সঙ্গে বানান সংস্কারের সম্পর্ক খানিকটা পার্শ্বিক বা প্রান্তিক। বানান সংস্কার করতে হলে লিপি-সংস্কার অবশ্যই করতে হবে, অন্তত লিপির উপাদান বা কনটেন্ট অংশে, কিন্তু তা ছাড়াও বানান সংস্কারের আরো কিছু মূল বিবেচ্য আছে। বাংলা বানান সংস্কারের বিষয়ে যাঁরা ভেবেছেন তাঁদের যে এই মূল তিনটি বিকল্পের একটিকে গ্রহণ করার জন্য মত প্রকাশ করতে হয়েছে, তা আমরা অন্যত্র দেখিয়েছি[৭]। এই বিকল্পগুলি হল :

এক, বাংলা বানান সম্পূর্ণরূপে ধ্বনিসংবাদী হবে—অর্থাৎ আমরা মুখে যেভাবে উচ্চারণ করি বানানে তাই লিখব। এ জন্য যেটুকু বর্ণমালা ও লিখনপদ্ধতির সংস্কার করতে হয় তা করতে হবে।

দুই, যেহেতু বাংলা শব্দভাণ্ডারের একটি বিমিশ্র চরিত্র আছে, অর্থাৎ এতে তৎসম, অর্ধতৎসম, তদ্ভব, দেশী ও বিদেশী এইসব নানা ধরনের শব্দ আছে, সে ক্ষেত্রে সম্পূর্ণরূপে ধ্বনিসংবাদী বানান করা সব ক্ষেত্রে সম্ভব

হবে না। তৎসম শব্দের মূল বানান বজায় রেখে বাকিগুলিকে কমবেশি ধ্বনিসংবাদী করে তুললেই হবে।

তিন, যেমন চলছে তেমনই চলবে। তৃতীয় বিকল্পটির সমর্থক সবচেয়ে কম হওয়ার সম্ভাবনা বলে, সেটি সম্বন্ধে আলোচনার কোনো প্রয়োজন নেই। অবশ্য পণ্ডিতদের মধ্যে এর সমর্থক কম, কিন্তু বেশির ভাগ সাক্ষর মানুষ লিখতে গিয়ে এই বিকল্পটিকেই মেনে নেন। পণ্ডিতদের বানান সংস্কারের বিভিন্ন সুপারিশ ও হট্টগোল তাঁরা বিশেষ লক্ষ করেন না, নিজেদের অভ্যস্ত বানানই বছরের পর বছর ধরে লিখে যান। নইলে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানান-সংস্কারের অর্ধ শতাব্দী পরেও বর্ধমান স্টেশনের নাম রেল কোম্পানি বাংলায় 'বর্দ্ধমান' এবং ইংরেজিতে Barddhaman লিখবেন কেন? বানান সংস্কার ও সেই 'সংস্কৃত' বানানের প্রচলন যে এক বস্তু নয় তা আমরা একটু আগে এবং পরে একটি অধ্যায়ে[৮] আলোচনা করেছি।

দ্বিতীয় বিকল্পটির বিষয় আপাতত মুলতবি রেখে আমরা প্রথমটিতে চলে যাই। তার দাবি: বাংলা বানানকে সম্পূর্ণ ধ্বনিসংবাদী হতে হবে, অর্থাৎ আমরা যেভাবে উচ্চারণ করি ঠিক সেইভাবে বর্ণপ্রতিরূপ দিয়ে শব্দের বানান লিখতে হবে। এর অসুবিধা সম্বন্ধেও আমরা একটু আগে এবং অন্যত্র[৯] আলোচনা করেছি, কিন্তু এখানে প্রসঙ্গগুলি আরেকবার, অন্তত তত্ত্বের দিক থেকে, যাচাই করা যেতে পারে।

সেজন্য 'ধ্বনিসংবাদী' কথাটিকে একটু ব্যাখ্যা করে নেওয়া দরকার। যেভাবে ঠিক উচ্চারণ করি ভাষার কথা, হুবহু সেভাবে সে-কথার বানান লেখা সম্ভব নয়। মুখের কথায় বাক্যের শব্দগুলির মধ্যে বিরাম থাকে না বললেই চলে, লিখিত বাক্যে সেখানে শব্দগুলির পরস্পরের মধ্যে ফাঁকা জায়গা রাখতে হয়, উচ্চারণের অব্যাহত পরম্পরা ভেঙে। অর্থাৎ মুখের কথায় যা 'পশ্চিমবঙ্গসরকারবাংলাভাষাবিষয়েসেমিনারডেকেছেনযে' তা লেখাতে শব্দান্তের ফাঁক রেখে 'পশ্চিমবঙ্গ সরকার বাংলাভাষা বিষয়ে সেমিনার ডেকেছেন যে' লিখতেই হবে।

দ্বিতীয়ত, মুখে যেভাবে আমরা শব্দ বা ওঅর্ডগুলিকে উচ্চারণ করি, সেগুলির কোনো দুবারের উচ্চারণ এক রকম নয়। দু-বারের এই দুরকম, বা ছত্রিশবারের ছত্রিশ রকমের উচ্চারণ লেখায় আনা তো আদৌ সম্ভব নয়। প্রতিবাদে কেউ হয়তো বলবেন—এ অবান্তর কথা। উচ্চারণের ওই অতি সূক্ষ্ম সামান্য ভেদ আমরা খেয়ালই করি না, ফলে বানানে সে সব টেনে আনবার উপায় যেমন নেই, প্রয়োজনও তেমনি নেই। ঠিক কথা—কিন্তু এ থেকেই প্রমাণ হয় যে, যেমন উচ্চারণ ঠিক অনুরূপ বানানের নীতি থেকে আমাদের সরে আসতেই হবে।

মুখের কথার উচ্চারণে আরো কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। শব্দের ধ্বনিগুলি যখন পাশাপাশি থাকে, তখন এক ধ্বনির পাশে অন্য ধ্বনির উচ্চারণ তার স্বাভাবিক উচ্চারণ থেকে একটু সরে যায়। একে বর্ণনাপন্থী ভাষাবিজ্ঞানে বলে allophonic variation বা 'বিস্বন-ভেদ'। যেমন ধরুন, 'আলতা'-র 'ল্' আর 'উলটা'র 'ল্'[১০] —এ দুটি 'ল্' ঠিক এক রকম নয় উচ্চারণে। 'আলতা'র ল-টিকে বলতে পারি দন্ত্য-ল—তার উচ্চারণে জিভের ছড়ানো সম্মুখভাগ উপরের দাঁতের পাটির পিছনে ছুঁয়ে থাকছে। কিন্তু 'উলটা'-র 'মূর্ধন্য' ল-এর বেলায় জিভ খানিকটা ছুঁচোলো হয়ে উলটে যাচ্ছে 'ট' বলার প্রস্তুতি হিসাবে, এবং মূর্ধা বা টাকরায় লেগে থেকে পরপর ল্ আর ট্ উচ্চারণ করছে। 'আলতা' এবং 'উলটা' কথাদুটি পরপর উচ্চারণ করলেই আমরা এই দুই ল্-এর ধ্বননগত তফাত খেয়াল করতে পারব। কিন্তু কথা হল, এই দুই ল্-এর তফাত আমরা বানানে কেমন করে আনব ? উচ্চারণ অনুযায়ী বানান বিষয়ে অতিরিক্ত কড়াকড়ি করলে বানানে ওই দুই ল্-এর তফাত দেখাতে হবে।

শুধু তাই নয়, কথা বলতে গিয়ে দুটি শব্দের মধ্যে সন্ধি বা hiatus সঞ্চারের জন্য যে সব শ্রুতিধ্বনির উদ্ভব হয়, তাও বানানে আনতে হবে। আমরা লিখি 'উত্তরে হওয়া আর সূর্যের মধ্যে একদিন', কিন্তু উচ্চারণ করি 'হাওয়ায়ার'[১১]। কিংবা 'পুত্র' 'মিত্র' 'শুক্র' লিখি, কিন্তু উচ্চারণ করি 'পুৎত্রো' 'মিৎত্রো' 'শুক্‌ক্রো'। বানানে কি আমরা এইসব উচ্চারণ নির্দেশ করব ?

বলা বাহুল্য, উচ্চারণের এই সব সূক্ষ্ম তথ্য অর্থাৎ phonetic detail, বানানে প্রতিফলিত করা যেমন অসম্ভব তেমনই অবান্তর। কাজেই যাঁরা 'ফোনিটিক' কথাটির সম্যক অর্থ না জেনে 'ফোনিটিক বানান' দাবি করেন তাঁদের দাবির কোনো অর্থ হয় না। ফোনিটিক বানান লিখতে হলে শব্দের মধ্যে ফাঁক রাখা চলবে না। উচ্চারণ ও ধ্বনির অতি সূক্ষ্ম আপতিক (অর্থাৎ অকারণ) ও প্রাতিবেশিক (সকারণ) পরিবর্তনগুলি বানানে দেখাতে হবে। তার জন্য অগণিত বর্ণচিহ্ন ও মাত্রাচিহ্ন বা 'ডায়াক্রিটিকস' দরকার। উচ্চারণের ঝোঁক, স্বরমাত্রা, বাক্যের সুর—টোন্, পিচ্ ইত্যাদি —সবই বোঝাতে হবে তো বানানে। এ এক অবাস্তব প্রকল্প। ফোনিটিক বানান আকাশকুসুম মাত্র।

যাঁরা বিষয়টা জানেন এবং বোঝেন, তাঁরা অবশ্য সাধারণের এই ভুল শুধরে দিয়ে বলেন, 'না আমরা ফোনিটিক বানান চাই না, আমরা ফোনিমিক বানান চাই।' অর্থাৎ উচ্চারণে ধ্বনির যে-পরিবর্তনগুলি আমাদের বোধে বিশেষ প্রকট ও গ্রাহ্য—শুধু সেগুলিকে বানানে দেখালেই হবে। আর

সেই সঙ্গে সেই one sound, one symbol নীতি মানতে হবে, তাহলে উচ্চারণ ও বানানে প্রতিসমতা তৈরি হবে।

এ দাবি ফোনিটিক বানানের দাবির চেয়ে নিশ্চয়ই অনেক সংগত ও সুসাধ্য। কিন্তু বাংলা বানানের ক্ষেত্রে ফোনিমিক বানানের দাবি মানলে কী কী অসুবিধা ঘটবে তা আরেকবার বিচার করা যেতে পারে।

এতে তৎসম শব্দগুলির চেনা চেহারা ঘুচে গিয়ে খুবই অপরিচিত হয়ে যাবে, যেমন 'সৌম্য' হবে 'শোউম্মো', 'সৈন্য' হবে 'শোইন্নো'—এবং তার ফলে লেখার পরিশ্রম ও সময়ও বাড়বে—কিন্তু তা নিয়ে আমরা এই মুহূর্তে চিন্তিত নই। স্বরচিহ্ন যুক্তব্যঞ্জন ও যুগ্মব্যঞ্জন ভেঙে ওই 'লিনিয়ার' বা 'অ্যালফাবেটিক্যাল্' করা হলে কষ্ট আরো বাড়বে।

আমাদের মূল চিন্তা কিন্তু হরহামেশার চেনা শব্দগুলিকে নিয়ে। ধরা যাক, 'অত' আর 'অতি'। উচ্চারণে এই দুটি শব্দের প্রথমটি 'অ' আর দ্বিতীয়টি 'ও'। এই 'ও' সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে একটি আলাদা ফোনিম—কাজেই বানানে তাকে স্বীকৃতি দিতেই হবে। কাজেই 'অত' লিখব এখন যেমন আছে তেমনই করে, কিন্তু 'অতি' লিখব 'ওতি'।

'অত' আর 'অতি'র মধ্যে অর্থের বিশেষ যোগ নেই, ফলে এ না হয় মেনে নেওয়া গেল। কিন্তু এই একই লজিকে লিখতে হবে—'ঘট' কিন্তু 'ঘোটি' (ঘটি), 'মত' কিন্তু 'মোতি' (মতি), 'সৎ' কিন্তু 'সোতি' বা 'শোতি' (সতী); ব্যক্তিনামের ক্ষেত্রে পোশাকি নাম আর ডাকনামের দাঁড়াবে —'অপূর্ব' (বর্তমান বানানই রাখছি জটিলতা এড়াতে), কিন্তু 'ওপু', 'শঙ্কর' কিন্তু 'শোঙ্কু', 'রণজয়' কিন্তু 'রোনু'। ক্রিয়াপদের ক্ষেত্রে 'বলে', কিন্তু 'বোললো' 'বোলবো'—যা এখন অন্তত অংশত কেউ কেউ লিখে থাকেন।

ব্যঞ্জনধ্বনির ক্ষেত্রে তেমনই 'স্' ও 'তালব্য-শ'-র উচ্চারণ আলাদা করে বোঝাতে হবে—কারণ প্রচলিত মতে এ দুটি আলাদা। তাতে 'বিশ্বাস' হবে 'বিশ্শাশ্' 'বিষ্-শ্বাস'ও হবে 'বিশ্শাশ্'। কেবল 'আস্ত' 'ব্যস্ত' এই ধরনের কয়েকটি বানানে ত, থ, ন, র, ল, ইত্যাদির সঙ্গে যুক্তভাবে, কিংবা শব্দের গোড়ায় অধিকন্তু স্ক, স্খ, স্প, স্ফ-এর ক্ষেত্রে দন্ত্য-স লিখতেই হবে। আর সর্বত্রই শ্, এমন কী ষ্ট, ষ্ঠ-এর ক্ষেত্রেও তালব্য-শয় ট-ঠ লিখতে হবে, কারণ ওখানে উচ্চারণ মূর্ধন্য ষ হলেও তা প্রাতিবেশিক বা allophonic মাত্র, ফোনিমিক নয়। আর 'স্পর্ধা' লিখলেও লিখতে হবে 'আশ্পর্ধা', 'স্ফুট', লিখলেও লিখতে হবে প্রোশ্ফুটিতো। ওদিকে 'শ্রী' হবে 'স্রি', 'শ্রাদ্ধ' হবে 'স্রাদ্ধো'।

ক্রিয়াপদের ক্ষেত্রে হয়তো বলা যাবে যে, অ-ধ্বনিকে স্থল-বিশেষে 'ও' বা 'ও-কার' দিয়ে লিখতে হলে ক্ষতি কী, অনেক বাংলা ক্রিয়াপদেই তো ধাতুর

দুটি রূপ দাঁড়িয়ে যায়। যাকে বিদেশী বঙ্গভাষাতাত্ত্বিকরা নাম দিয়েছেন low stem আর high stem। যেমন 'ধোওয়া' ক্রিয়ারূপে ধো—(ধোয়, ধোবেন, ধোও) এবং ধু[১২] (ধুচ্ছে, ধুয়ে ইত্যাদি)। বরং সমস্ত জিনিশটাই হাই স্টেম লো স্টেম-এর একটা আনুপূর্বিক প্যাটার্নে এসে যাবে।

এই যুক্তি অগ্রাহ্য করার মতো নয়। কিন্তু তবু এই ক্রিয়াপদের ক্ষেত্রেই আরো কিছু সমস্যা থেকে যাবে। যেমন সাধারণ মধ্যম পুরুষের বর্তমান কালের রূপ এবং বর্তমান অনুজ্ঞার রূপ, দুটিই উচ্চারিত হয় 'বলো'— 'তুমি প্রায়ই একথা বল' এবং 'তুমি এখন স্পষ্ট করে বলো'—। এখনকার বানানে আমরা অনেকে অনুজ্ঞায় শেষ ব্যঞ্জনটিতে ওকার দিয়ে তফাত করার চেষ্টা করি—কর, করো ; শোন, শোনো ; ভালোবাস, ভালোবাসো। কিন্তু তখন আর তা করা যাবে না।

মূল সমস্যাটা রূপগতভাবে সদৃশ বা হোমোগ্রাফ (homograph) ধরনের শব্দের—অর্থের দিক যে-শব্দগুলি আলাদা তাদের—মধ্যে অর্থবিভ্রান্তি এড়ানো। অবশ্য আশেপাশের শব্দ বা কনটেক্সট অনুযায়ী দ্ব্যর্থকতার মোচন ঘটে, তারই ফলে 'আজ আমাদের ক্লাস হল না'-র 'হল' কথাটিকে আমরা কেউ ইংরেজি Hall কথাটির সঙ্গে গুলিয়ে ফেলি না। কিন্তু একটি ভাষায় সদৃশরূপী শব্দের সংখ্যা কত বেশি হতে পারে তারও একটা সীমা আছে। যাঁরা বানাননীতি নতুন করে নির্ধারণ করবেন তাঁদের এই দিকে বিশেষ করে দৃষ্টি দিতে হবে। 'ভাল' আর 'ভালো', কিংবা 'কাল' আর 'কালো'-র তফাত বানানে এই জন্যই করার প্রশ্ন ওঠে, উচ্চারণের বিভিন্নতা বানানে দেখিয়ে দেওয়ার জন্য—কিংবা 'কোন্'-'কোনো', 'কি'-'কী'-এর তফাত ; কিন্তু 'ছোট' 'বড়'-কে 'ছোটো' 'বড়ো' লেখার প্রয়োজন কতটা তাই বিবেচ্য।

পূর্ণাঙ্গ ধ্বনিসংগতির দিক থেকে লিপির চরিত্র বজায় রেখে একটি অমিশ্র বানাননীতি নির্ধারণ যেমন কঠিন, তেমনই দুষ্পরিণামী। তাতে কার কতটা লাভ হবে সে কথা ভাবার দরকার আছে। এতে শিশুর বানান শিক্ষা সহজ হবে? ব্যাকরণ শিক্ষা সহজ হবে? মনে রাখতে হবে, তখন 'অত্যাচার'-কে 'ওৎতাচার' 'অন্য'-কে 'ওন্নো' লিখতে হবে। এতে শব্দটির ব্যাকরণগত পরিচয় জানা যাবে? সব মানুষের সে সব জানার দরকার নেই তা জানি। কিন্তু বাঙালি শিশুকে কিছুটা ব্যাকরণ তো স্কুলে শিখতেই হবে। সে যদি 'অত্যাচার'কে 'ওৎতাচার' 'অধ্যাপক' কে 'ওদ্ধাপোক', 'সন্ন্যাসী' কে 'শোন্নাশি' লেখে তাহলে তার ব্যাকরণ বা শব্দ-ব্যুৎপত্তি শেখার সহায়তা হবে? লেখার শ্রম, সময় ও সক্রিয়তা কমবে? টাইপরাইটিং ও মুদ্রণে সহায়তা হবে? প্রচুর তথ্য সহযোগে এ

প্রশ্নগুলির উত্তর দেওয়া দরকার আছে। এ পর্যন্ত আমরা যতগুলি প্রস্তাব দেখেছি বানানকে সম্পূর্ণ ধ্বনিসংবাদী করার—তার একটিতেও এর প্রতিটি প্রশ্ন তুলে তার উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করা হয়নি। বরং বিভ্রান্তির সুযোগ বেড়েছে[১৩]।

মনে রাখতে হবে, ইতালীয়, চেক, কিয়ৎপরিমাণে স্প্যানিশ ও জর্মন ইত্যাদি ভাষায় উচ্চারণ-অনুগ বানানের যে ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে তাতে সজ্ঞান ও সচেতন পরিকল্পনার চেয়ে ঐতিহাসিক বিবর্তনের দান অনেক বেশি। এদের লিপি রোমক হওয়ায় তাতে আরো সুবিধা হয়েছে। লিপিকররা লেখায় উচ্চারণ অনুযায়ী বানান লিখেছেন, পরে মুদ্রাযন্ত্রের প্রচলনে সেই বানানই মান্য বা স্ট্যাণ্ডার্ডাইজ্ড রূপ পেয়েছে। এও মনে রাখতে হবে যে, মুদ্রাযন্ত্র না হলে বানান স্ট্যাণ্ডার্ডাইজড করা সহজ হত না। তা সত্ত্বেও ইংরেজি, ফরাসি ইত্যাদি অনেক ভাষারই বানান ও উচ্চারণে বহুবিধ অসংগতি থেকে গেছে। ওয়েবস্টার সাহেব 'মাথা'র ইংরেজি প্রতিশব্দ head-এর বানান hed ছাপিয়ে দিয়েও কীভাবে তাঁর অভিধানের পরের সংস্করণে মানুষের প্রতিবাদে আবার সেই প্রাচীন head-এ ফিরে গিয়েছিলেন, সে খবরও অনেকে রাখেন। ফলে বানান সংস্কারের, এবং বানানকে ধ্বনিসংগত করার পদ্ধতিগত ও সামাজিক দুরকম সমস্যাই বেশ আছে। বিমিশ্র শব্দভাণ্ডার যে-ভাষার লিখিত রূপে বেশি প্রকট, তার সমস্যাই বেশি। ইংরেজি ফরাসির বহু সংস্কার-প্রচেষ্টা এই জন্যই আজও পর্যন্ত নিষ্ফল হয়েছে। যাঁরা ভাবেন আমেরিকান ইংরেজিতে খুব একটা বানান সংস্কার হয়েছে তাঁরা যদি সঠিক পরিসংখ্যান নেন তাহলে দেখবেন—our দিয়ে শেষ হওয়া শব্দের u-টিকে বর্জন, অতীতের রূপে ব্যঞ্জন দ্বিত্বের লোপ, যেমন excelled→exceled ইত্যাদি দু-একটি ক্ষেত্রে ছাড়া আর প্রায় বিশেষ কিছুই পরিবর্তন হয়নি। ইংরেজির মোট চার সাড়ে চার লাখ শব্দের মধ্যে ঐ ধরনের শব্দ ক-টি? আর nite, thru ইত্যাদি বানান মূলত বিজ্ঞাপনে লেখা হয়, ফরম্যাল লেখায় সর্বমান্য রীতি হিসেবে এগুলি কেউ গ্রহণ করেনি।

৪. দ্বিতীয় বিকল্প বিষয়ে আলোচনা

তাহলে যে-ভাষায় শব্দভাণ্ডারের চরিত্র বিমিশ্র, সে ভাষায় বানান-পদ্ধতিও বিমিশ্র হবে—এই বিকল্পে এবার চলে আসতে হয়। অর্থাৎ কিছু শব্দের বানান এক নীতিতে হবে, কিছু শব্দের বানান হবে অন্য নীতিতে। লিখিত ভাষার ইতিহাস ভাষাব্যবহারকারীর বানান সংস্কারের যথেষ্ট স্বাধীনতার উপর এইভাবে কিছু নিয়ন্ত্রণ চাপিয়ে রাখে। এই নিয়ন্ত্রণের স্বীকৃতি আছে

১৯৩৬-এ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানান সংস্কারের সুপারিশে, এই নিয়ন্ত্রণের স্বীকৃতি আছে রবীন্দ্রনাথের বাংলা বানান সংক্রান্ত মতাবলিতে[১৪]। কী সেসব নিয়ন্ত্রণ ? না তৎসম শব্দের বানান মোটামুটিভাবে যথাবস্থ রেখে দেওয়া হবে[১৫], কিন্তু অন্যান্য অ-তৎসম শব্দের বানান যথাসম্ভব ধ্বনি-সংবাদী করে তোলা হবে। কিন্তু এই ব্যাপক নীতি সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন উঠে পড়ে। যেমন : এক, যে অ-তৎসম শব্দের বানানে সংস্কৃত অভিধানেও একাধিক বিকল্প আছে, তার কোন্‌টিকে বাংলায় মান্য হিসেবে গ্রহণ করব ? কুটির-কুটীর, গন্ডি-গন্ডী, গ্রন্থাবলি-গ্রন্থাবলী, কিশলয়-কিসলয়, ভঙ্গি-ভঙ্গী, সূচিপত্র-সূচীপত্র —এর কোন্‌টিকে একমাত্র হিসাবে মানব আমরা ?

দুই, মূল এবং সবচেয়ে বড় সমস্যা হল অর্ধতৎসম ও তদ্ভব শব্দের বানান নিয়ে। অর্ধতৎসম হল তৎসম শব্দের মৌখিক 'বিকৃতি' অর্থাৎ বাংলা ভাষার নিজস্ব ধ্বনিতত্ত্বের চাপে শব্দটির মৌলিক রূপের রূপান্তর সাধন। আর তদ্ভব হল সংস্কৃত শব্দগুলি প্রাকৃত পর্যায়ে একবার বদলে গিয়ে, বাংলায় আবার বদলে যে-রূপ নিয়েছে তাই। এদের বানান মূল সংস্কৃত বানানকে স্মরণ করবে কি করবে না, করলে কতটা এবং কোথায় করবে সে সম্বন্ধেও সিদ্ধান্ত নিতে হবে। পরের দুটি অধ্যায়ে আমরা সে সম্বন্ধে বিস্তৃততর আলোচনা করেছি।

তিন, দেশী ও বিদেশী শব্দের বেলায় উচ্চারণের ইশারা মেনে বানান রচনার রীতি খানিকটা মেনে নেওয়া হয়েছে। তবে এখানেও কিছু উদ্‌বৃত্ত সমস্যা আছে, বিশেষ করে বিদেশী শব্দের বানানে। এখানেও ব্যুৎপত্তি আর উচ্চারণের মধ্যে টেন্‌শন চলে। এ গ্রন্থের অন্যত্র তারও আলোচনা করা হয়েছে। যেমন 'হিশেব' হবে না 'হিসেব' হবে ? 'সাবান' না 'শাবান' ? 'শাদা' না 'সাদা' ? 'মুস্কিল' না 'মুশকিল' ? ফারসি 'সে-সিন-সোয়াদ'এর সঙ্গে বাংলা উচ্চারণ শ-এর এই দ্বন্দ্ব যেমন চলে তেমনই ইংরেজির [s]-এর বাংলা রূপ দন্ত্য-স ভেবে নিই বলে আমরা বাংলায় 'কেলাস' (class) 'গেলাস' (glass) 'নোটিস' পুলিস', ইত্যাদি লিখি। এগুলিতে উচ্চারণের শাসন মেনে শ লিখতে বাধা নেই। কিন্তু দেশী ও বিদেশী শব্দাবলি সাধারণভাবে স্বরের হ্রস্ব-দীর্ঘ এবং ব্যঞ্জনের ণত্ব-ষত্ব নিয়ে বেশি পীড়িত নয় বানানে, সেটুকু স্বস্তির কথা। তবু তার দন্ত্য-স তালব্য-শর ঝগড়া মেটাতে হবে।

৫. উপসংহার ও বক্তব্যের সারাংশ

বাংলা বানান কোনো একটি নীতির দ্বারা একমাত্রিকভাবে নিরূপিত হতে পারে না—নিশ্চয়ই সকলের কাছে বর্তমান লেখকের এই মতটি স্পষ্ট হয়ে

উঠেছে। প্রবন্ধের তৃতীয় অংশে বানান-নীতির তিনটি বিকল্প সম্ভাবনার মধ্যে দ্বিতীয়টিই যে অধিকতর বাস্তব ও ব্যাবহারিকতার দিক থেকে সংগত —তাও এই লেখকের সিদ্ধান্ত। সেখানে এই কাজটি আরো সুনির্ধারিত ও সুনির্দিষ্টরূপে করতে হলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির দিকে মনোযোগ দিতে হবে :

প্রথমত, তৎসম শব্দের একটি অব্যতিক্রমী বানান বাংলায় গ্রহণ করতে হবে ;

দ্বিতীয়ত, অর্ধতৎসম ও তদ্ভব শব্দে তৎসম বানানের অনুসৃতি কতটা থাকবে, অথবা তা কতটা ধ্বনিসংবাদী হবে—সেই টেনশনের একটা স্থায়ী মীমাংসা করা দরকার ;

তৃতীয়ত, দেশী-বিদেশী শব্দের বানান মূলত ধ্বনি-সংবাদী করতে হবে ; বিদেশী শব্দের ব্যুৎপত্তি-স্মারক বানানের প্রয়োজন নেই, বিশেষত যেখানে আমাদের উচ্চারণে মৌলিক উচ্চারণ থেকে আমরা সরে এসেছি ;

চতুর্থত, বানান-পদ্ধতির সরলীকরণের জন্য বর্ণমালার উপাদান ও লিপি-পদ্ধতির যেটুকু সংস্কার প্রয়োজন তাও করতে হবে।

৩. তৎসম শব্দের উচ্চারণ ও বানান

১

তৎসম শব্দ হল বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত সেইসব শব্দ যেগুলির লিখিত রূপ সংস্কৃত লিখিত রূপকে প্রায় সম্পূর্ণত অনুসরণ করে, কিন্তু উচ্চারিত রূপ তা থেকে বেশ পৃথক হয়ে আসে। ইংরেজিতে যাকে loanword বলে তৎসমগুলি আসলে তাই—শব্দঋণ। শব্দঋণ ভাষাতে সাধারণত দুটি রাস্তায় আসে। একটা জীবন্ত ভাষার সঙ্গে অন্য জীবন্ত ভাষার সাক্ষাৎকার ও সংযোগ ঘটলে দু ভাষার মধ্যেই শব্দ বা ভোকাবিউলরির মৌখিক আদান-প্রদান ঘটে। এইভাবে আমরা গত তিনশো-সাড়ে তিনশো বছরের ইতিহাসে ফারসি, ইংরেজি, পর্তুগিজ ইত্যাদি ভাষা থেকে প্রচুর শব্দ পেয়েছি। কিন্তু লক্ষ করতে হবে, বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এই শব্দগুলি মুখে মুখে এসেছে বলে তার অনেক কটাকে আমরা বাঙালির জিভের পক্ষে সহজ করে ভেঙে-চুরে নিয়েছি। ফলে ফারসি 'শরৎ' হয়েছে 'শর্ত' [শর্তো][1], ইংরেজি table [ঠেইবল্] হয়েছে 'টেবিল', পর্তুগীজ আলফিনেতে হয়েছে বাংলা 'আলপিন'।

সংস্কৃতের যে-সব শব্দঋণ আমরা মুখের ভাষাতে আগে গ্রহণ করেছি সেগুলিকেও বাংলা উচ্চারণের স্বভাব অনুযায়ী একটু অদল-বদল করে নিয়েছি। এই অদল-বদল বিষয়ে আমরা সচেতন ছিলাম, তাই বানানেও ওই পরিবর্তনকে আমরা চিহ্নিত করেছি। ফলে 'ধর্ম'-কে 'ধরম' 'প্রায়'-কে 'পেরায়' 'শূদ্র'-কে 'শুদ্দুর' যখন উচ্চারণ করেছি তার বানানও আমরা তৎসম আদল থেকে ভিন্ন করে দিয়েছি। শব্দশরীরের এই উচ্চারণগত ভাঙাভাঙি হয়েছে প্রধানত দুটি কারণে। প্রথমত কবিরা কবিতায় ছন্দ বা শ্রুতিসুভগতার খাতিরে যুক্তব্যঞ্জনকে ভেঙে দিয়েছেন, ফলে 'বরষন' 'তিরপিত' 'বিমরিষ' 'পুরব' 'সিনেহ' 'সিনান' ইত্যাদি করেছেন। দ্বিতীয়ত, সংস্কৃত শিক্ষাদীক্ষাহীন সাধারণ মানুষ তাদের জিভে কঠিন লাগে বলে যুক্তব্যঞ্জন ভেঙে বা সরল করে দিয়েছে, যেমন 'পেরায়', 'পেরান', 'পেত্তয়', 'মন্তর' ইত্যাদি। এই শব্দগুলি অর্ধতৎসম। অর্ধতৎসমকে কাব্যিক ও

লৌকিক—এই দু' ভাগ করা সম্ভব, কিন্তু দুয়ের মধ্যে যে কখনো-কখনো ঐক্য ঘটে না তা নয়। অনেক শব্দের লৌকিক ও কাব্যিক রূপ একই হতে পারে—যেমন পরান বরন। তবে পার্থক্যও অনেক ক্ষেত্রে সুনিশ্চিত, যেমন কাব্যিক 'ধরম' 'করম' 'জনম'-এর সঙ্গে লৌকিক 'ধম্মো' 'কম্মো' 'জম্মো'-র। শেষের গুলি কেবল লৌকিক অর্ধতৎসম ; প্রথমগুলি কাব্যিক ও লৌকিক—দুইই হতে পারে।

কিন্তু মুখের রাস্তা ছাড়া লেখার রাস্তায় যে শব্দগুলি আসে—সে-গুলির চরিত্র একটু অন্য ধরনের হয়। বিশেষত একই লিপি-পদ্ধতির শব্দ, যেমন সংস্কৃত শব্দ, বাংলায় গৃহীত হলে সাহিত্যের রীতি বা শৈলীগত প্রয়োজনে তার মূল বানান-রূপটি অবিকৃত থাকে। লেখায় শব্দগুলি নিয়ে আসেন শিক্ষিত বা শিক্ষিতমন্য লোকেরা, শব্দের মূল চেহারাটা জানেন, এটাই তাঁদের অহংকার। তাই বানানের রূপটা লিপ্যন্তরেও তাঁরা সযত্নে রক্ষা করেন। এইভাবেই তৎসম শব্দগুলির বানান বাংলাভাষার লেখাতে রক্ষিত হয়ে এসেছে। অল্পশিক্ষিত ও অসচেতন পুঁথিলেখকদের দিন যদি আজও থাকত তাহলে তৎসম শব্দের এই সংস্কৃতানুগ বানান বজায় রাখা সম্ভব হত কিনা সন্দেহ। ছাপাখানার প্রয়োজনে বানানে শৃঙ্খলা এনে স্ট্যান্ডাডাইজড বা মান্য বানানে নির্ধারণের চেষ্টা শুরু হল—ছাপাখানারই কল্যাণে পণ্ডিতের লেখা অভিধান প্রায় ঘরে ঘরে পেঁছে গেল, ফলে উচ্চারণ যাই করি না কেন, তৎসম শব্দের বানান বদলাবার আর উপায় রইল না। আর একটা কথা এই যে, সংস্কৃত ভাষা সেই ভাষার জীবন্ত বক্তাদের মুখ থেকে আমরা কখনো শুনিনি, সহস্র বৎসরের মৃত সেই ভাষার শব্দ আমাদের কবি-পণ্ডিতেরা লেখা থেকে লেখায় আমদানি করেছেন—ফলে সংস্কৃত বানান বদলাবার প্রয়োজন বোধ করেননি। কেবল বাংলা লিপিতে লিখেছেন মাত্র। আরও একটা কথা মনে রাখতে হবে যে, সংস্কৃত খুব বেশিদিন দেবনাগরী লিপিতে লেখা শুরু হয়নি। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রাদেশিক লিপিতেই সংস্কৃত পুথি লেখা হত। ফ্রিডরিশ ফন শ্লেগেল (১৭৭২-১৮২৯) কলকাতায় এসে যে সব সংস্কৃত পুথি জার্মানিতে নিয়ে যান তার অনেকগুলিই সম্ভবত বাংলা অক্ষরে লেখা ছিল[২]। উইলিয়াম জোন্সের সংগৃহীত পুথির মধ্যেও প্রচুর বঙ্গাক্ষরে লেখা সংস্কৃত পুথি পাওয়া গেছে। সেক্ষেত্রে সোজা বাংলায় লেখা রূপই বাংলা সাহিত্যে এসে স্বচ্ছন্দে প্রবেশ করেছে, তাকে লিপ্যনুবাদের গণ্ডি পেরোতে হয়নি।

বানান না হয় রক্ষিত হল এসব তৎসম শব্দের, কিন্তু এদের উচ্চারণটা কী দাঁড়াল? এক্ষেত্রে দুটি সম্ভাবনা ছিল। এক, বানান মেনে সংস্কৃত ধরনের উচ্চারণ করা, যাকে বলে **spelling pronunciation** বা বানান

নিয়ন্ত্রিত উচ্চারণ, তাই করা। যেমন আজকাল আমরা অনেকে 'প্রশ্ন' কথাটিকে এভাবে 'প্রোশ্‌নো' বলি, বাঙালির স্বাভাবিক 'প্রোস্নো' বলি না। সে-হিসাবে 'মাৎসর্য' কথাটিকে সংস্কৃত উচ্চারণের একটা ধারণা করে 'মাৎসরিয়' ধরনের কিছু বলতে পারতাম, দন্ত্যস-কে ইংরেজি 'এস'-এর মতো উচ্চারণ করেই। কিন্তু এর মধ্যে বাংলাভাষার ধ্বনিতত্ত্ব সংস্কৃত ভাষার ধ্বনিতত্ত্ব থেকে অনেকটাই আলাদা হয়ে গেছে ফলে তৎসম শব্দগুলির মৌলিক উচ্চারণ করতে গেলে পঠনক্ষম কিন্তু অসংস্কৃতজ্ঞ ও অপণ্ডিত বাঙালিকে যতটা তার উচ্চারণ-অভ্যাসের বাইরে যেতে হত ততটা যাওয়া তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। তার পক্ষে বাংলা অ ধ্বনিকে হিন্দি অ ধরনে উচ্চারণ করা সম্ভব নয়, ঋ, ঞ, ণ, য ইত্যাদির উচ্চারণও তার জিভে আসে না। বিশেষ-বিশেষ জায়গা ছাড়া স ষ-এর মূল উচ্চারণ তার সামর্থ্যের বাইরে থাকে ; বিসর্গের উচ্চারণও সে ভুলে গেছে। ফলে তৎসম শব্দের মৌলিক উচ্চারণ, অর্থাৎ একটু ব্যাপক অর্থে **spelling pronunciation** সাধারণ বাঙালির পক্ষে আর সম্ভব হল না।

তার বদলে সে প্রায় দুহাজার বছরের আগের ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটাল। তার প্রাকৃতভাষী পূর্বপুরুষেরা যেমন এক সময় সংস্কৃত কথাগুলিকে নিজেদের স্বভাব-মতো উচ্চারণ করতে শুরু করেছিল—তারা দুরুচ্চার্য সংস্কৃত ধ্বনি বদলে দিয়ে কখনো নতুন ধ্বনি বসিয়েছে, কখনো মূল যুক্তব্যঞ্জনকে সমীভূত করে যুগ্মব্যঞ্জনে পরিণত করেছে, কখনো তিনটি শ-কে একটি শ-এর রূপ দিয়েছে (মাগধীতে শ, অন্যত্র স), য-জ মিশিয়ে দিয়েছে —বাঙালিও প্রায় হুবহু তাই করতে আরম্ভ করল তৎসম শব্দের উচ্চারণে। কিন্তু প্রাকৃতভাষী পূর্বপুরুষদের সঙ্গে তার তফাত এই দাঁড়াল যে, তখন ছাপাখানার অভিধান ঘরে ঘরে অভিন্ন মান্য বানান পৌঁছে দেয়নি বলে পূর্বপুরুষেরা যা উচ্চারণ করেছেন বানানে সেটাই লিখতে লাগলেন, আর বাঙালিরা শব্দের বানান সংস্কৃতের মতো রাখতে বাধ্য হল অভিধান আর মুদ্রিত বইপত্রের স্ট্যাণ্ডার্ডাইজেশনের শাসনে, কিন্তু উচ্চারণ করতে লাগল তার প্রাকৃতভাষী পূর্বপুরুষের স্বাধীন অভ্যাসের মতোই। বাঙালির এই স্বাধীনতার ক্ষেত্রগুলিকে আমরা একটু নির্দিষ্ট করি :

১. সে সংস্কৃত হ্রস্ব কেন্দ্রীয় 'অ'-র বদলে স্পষ্ট বাংলা পশ্চাৎ ও বর্তুল স্বরধ্বনি 'অ' উচ্চারণ করছে।

২. সে স্বরধ্বনির দীর্ঘ উচ্চারণ বজায় রাখছে না।

৩. সে ঋ-এর মূল উচ্চারণ। [র়্—অর্ধব্যঞ্জন] করতে পারছে না।

৪. সে ঐ আর ঔ-এর মূল উচ্চারণও বর্জন করেছে।

৫. ঞ-এর পৃথক উচ্চারণ তার পক্ষে আর সম্ভব নয়।

৬. মূর্ধন্য ণ-র উচ্চারণ সে ভুলে গেছে।

৭. য (ইয়)-কে সে জ এবং অন্তঃস্থ ব (ওঅ)-কে সে ব উচ্চারণ করছে।

৮. স ষ-র বিচ্ছিন্ন উচ্চারণ সে বিস্মৃত হয়েছে ; সেগুলি এখন তার জিহ্বায় [শ]।

৯. বিসর্গ-এর মূল উচ্চারণ [হ্] তার কণ্ঠে সহজে আসে না।

১০. যুক্তব্যঞ্জনে য-ফলা, ব-ফলা, ম-ফলা থাকলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সে আগের ব্যঞ্জনটিকে দ্বিত্বযুক্ত করেছে, কিন্তু য, ব, বা ম-র[৩] উচ্চারণ রাখছে না[৪]।

১১. তৎসম শব্দেরই কোনো অনাদ্য ব্যঞ্জনে র-ফলা থাকলে সে ব্যঞ্জনটিতে দ্বিত্ব আনছে।

১২. ক্ষ জ্ঞ এই দুটি যুক্তব্যঞ্জনের মূল উচ্চারণও সে ভুলে গেছে, ইত্যাদি।

সচেতন বাঙালিরা কিছু যুক্তব্যঞ্জন—যেমন রেফ ও র-ফলা যুক্ত, ল-ফলা যুক্ত, স্ত, স্থ, ষ্ট, ষ্ঠ, ঙক, ঙখ, ঞ্চ, ঞ্জ, ন্ত, ন্থ, ন্দ, ন্ধ ইত্যাদির উচ্চারণে কোনো অসুবিধা বোধ করে না।

কিন্তু শ-এ র-ফলা থাকলে সেটিকে দন্ত্যস করে ফেলে। আর স্ক, স্খ, স্প, স্ফ-তে শব্দের গোড়ায় স-এর দন্ত্য উচ্চারণ করে কিন্তু শব্দের গোড়ায় না থাকলে তাতে [শ] উচ্চারণ দেয়।

এই সব নানা কারণে সংস্কৃত শব্দের মৌলিক উচ্চারণ বাঙালির দ্বারা সম্ভব হয় না—অথচ এ বিষয়ে শিক্ষিত বাঙালিও সাধারণভাবে অচেতন। কারণ তার ভাষার ধ্বনিতত্ত্ব এবং ঐতিহাসিক বিবর্তন তাকে অন্যরকম উচ্চারণে অভ্যস্ত করেছে। ফলে সে লেখে সংস্কৃত রূপে কিন্তু তৎসম শব্দগুলিকে তার প্রাকৃতভাষী পূর্বপুরুষদের মতোই উচ্চারণ করে প্রাকৃতের মতো। বিশেষত মূর্ধন্য ণ-র অভাব, য-কে জ বলা, প্রায় সর্বত্র শ-এর উচ্চারণ এবং যুক্ত ব্যঞ্জনের সমীভবন বাঙালির তৎসম শব্দের (কিংবা সংস্কৃত শব্দের) উচ্চারণকে ভারতীয় অন্যান্য ভাষাগোষ্ঠীর ওই সব শব্দের উচ্চারণ থেকে পৃথক করে দেয়, এ নিয়ে সে কৌতুকের লক্ষও হয়। 'কন্যা' যেখানে হবে 'কনিয়া' বা 'কন্য়া' সেখানে সে বলে 'কোন্না', 'লক্ষ্মী' যেখানে ছিল 'লক্ষ্মী' সে তার মুখে দাঁড়ায় বা 'লোক্খি' বা 'লোক্খি°'।

২

কিন্তু তৎসম শব্দগুলি ঋণ হিসাবে, এবং মূলত লেখ্য ভাষার ঋণ হিসাবে বাংলায় এসে পৌঁছালেও সেগুলি এখন বাংলা শব্দ। তৎসম নামটির মধ্যেই

খানিকটা সংস্কৃতের সঙ্গে এই শব্দগুলির কুটুম্বিতা ঘোষণার একটা কৃত্রিম চেষ্টা আছে। কিন্তু এই সমতা কেবল শব্দের লিখিত রূপের বা বানানের—তা আমরা দেখেছি। উচ্চারণের দিক থেকে সুনীতিকুমার এগুলিকে 'অর্ধ-তৎসম' বলেছেন, এবং তাঁর সে সিদ্ধান্ত খুবই যথার্থ[৫]।

কিন্তু উচ্চারণ যাই হোক, বানান সংস্কারের কথা যখনই উঠেছে, তখনই তৎসম শব্দের বানান সম্বন্ধে আমরা মোটামুটি রক্ষণশীল মনোভাব পোষণ করেছি। যেন এ শব্দের বানান আমাদের ইংরেজিতে যাকে 'sacred cow' বলে তাই, এর গায়ে হাত দেওয়া যাবে না। তবু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৩৫-এর বানান সংস্কার সমিতি রেফের নিচে ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব লোপের বিধান দিয়ে একটা ভালো কাজ করেছিলেন। অবশ্য খোদ সংস্কৃতেই তার একটা বিকল্প বিধান ছিল। সংস্কৃতের প্রচলিত অভিধানগুলিতে—যেমন মনিয়ের উইলিয়ামস বা আপ্তে-তে—রেফে ব্যঞ্জনদ্বিত্ব নেই। ভারতবর্ষের অন্যান্য ভাষায়—হিন্দি, গুজরাটি মারাঠিতে যেমন—সংস্কৃত বা তৎসম শব্দ লিখতেও এই সব জায়গায় ব্যঞ্জনকে ডবল করা হয় না। কাজেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধান, বিকল্প হলেও, বানানকে সরল করেছে সন্দেহ নেই। বেশির ভাগ বইপত্রে খবরের কাগজে পোস্টারে ব্যানারে দেয়াল-লেখায় এখন দ্বিত্বযুক্ত বানান কোথাও কোথাও টিকে আছে পুরনো অভ্যাস হিসাবে, তা প্রায়ই সংস্কার-সমিতির চেষ্টাকে পরিহাস করে[৬]। এ ছাড়া সন্ধিতে বানান-সংস্কার সমিতি ঙ স্থানে ং-এর অনুমোদন করেছিলেন, ফলে 'সঙ্গীত' 'সঙ্গ্রহ'-র বদলে 'সংগীত' 'সংগ্রহ' লেখার আর কোনো অ্যাকাডেমিক বাধা থাকেনি।

ওই বানানের নিয়ম-তালিকায় তৎসম শব্দ সম্বন্ধে এ দুটি নিয়মই আছে। এ নিয়ে, বিশেষত রেফের পর ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব তুলে দেওয়া নিয়ে কেউ কেউ আপত্তি করেছিলেন[৭] এমন কী সংস্কার সমিতির সদস্য সুনীতিকুমার নিজে পরবর্তীকালে 'র্য্য' লিখেছেন আর্য্য আচার্য্য[৮] ইত্যাদি বানানে। কিন্তু আমরা ধরে নিতে পারি যে, প্রথম ওই নিয়মটি মোটামুটি-ভাবে সচেতন বাঙালি লেখক-মুদ্রক-প্রকাশকদের দ্বারা গৃহীত হয়ে গেছে, এ থেকে আর পশ্চাদপসরণ ঘটবে না।

৩

কিন্তু তবু কিছু সমস্যা থেকে গেছে; এ সমস্যাগুলিকে আমরা চারটি শ্রেণীতে সাজাতে পারি :

১. বিকল্প স্বরচিহ্নের সমস্যা। মূল বানানে ি-ী, ু-ূ, ু-ূ—দুটিই অনুমোদিত। কোনটি আমরা গ্রহণ করব?

২. বিসর্গ-সন্ধিজাত ও-কারের সমস্যা। 'মনোযোগ' যদি লিখি, 'সদ্যোজাত' যেমন লিখি, ঠিক এইভাবে কি লিখব ছন্দোলিপি, ছন্দোবন্ধ, ইতোমধ্যে?

৩. বিকল্প ব্যঞ্জনের সমস্যা। 'কিশলয়' লিখব না 'কিসলয়'?

৪. তস্ ও শস্ প্রত্যয়জাত অন্ত্য বিসর্গের সমস্যা। 'ক্রমশঃ', 'অন্ততঃ', না 'ক্রমশ' 'অন্তত'?

এবার এই সমস্যাগুলিকে নিয়ে একে একে আলোচনা করা যাক।

৩.১ বিকল্প স্বরচিহ্নের সমস্যা

অভিধানে আমরা একাধিক তৎসম শব্দের বানানে হ্রস্ব-দীর্ঘ দু-রকম স্বর-চিহ্নের রূপই দেখতে পাই। বাংলায় যে দুটি রূপই সমান্তরালভাবে লেখা হয় তা নয়। কোনোটি বেশি প্রচলিত, কোনোটি কম পরিচিত বা প্রচলিত। আমরা নিচে বিকল্প বানান দুটি দেখিয়ে কোন্‌টি বেশি প্রচলিত তা নির্দেশ করবার চেষ্টা করছি। এই শেষের অংশে তর্ক উঠবে, কারণ প্রত্যেকের অভ্যাস ও অভিজ্ঞতা পৃথক। কাজেই আমি আমার জ্ঞানবুদ্ধি মতোই কোন্‌টি বেশি প্রচলিত তা ধারণা করছি। সেটি প্রথমে লিখছি, অপেক্ষাকৃত কম প্রচলিতটি তার পরে।

৩.১১ হ্রস্ব ই-কার/দীর্ঘ ঈ-কার বিকল্প

অঙ্গুরী অঙ্গুরি, অঙ্গুলি অঙ্গুলী, অন্তরীক্ষ অন্তরিক্ষ, অবনী অবনি, অবন্তী, অবন্তি, অলি অলী (ভ্রমর), আবলী আবলি, কালীয় কালিয়, কিঙ্কণী কিঙ্কণি, কিংবদন্তী কিংবদন্তি, কুটির কুটীর, কুহেলী, কুহেলি কুম্ভীলক কুম্ভিলক গণ্ডি গণ্ডী, গাণ্ডীব গাণ্ডিব, গ্রহণী গ্রহণি, চীৎকার চিৎকার, তরণী তরণি, তরী তরি, দেহলী দেহলি, বটি বটী, ধমনী ধমনি, পুত্তলী পুত্তলি, পেশি পেশী, প্রতিকার প্রতীকার, বলভি বলভী, বল্মীক বল্মিক, বালী বালি (কিষ্কিন্ধ্যার রাজা), বেণী বেণি, বেদী বেদি, ব্রততী ব্রততি, ভঙ্গি ভঙ্গী, ভেরী ভেরি, মল্লি মল্লী, মসি মসী, যতি যতী (তপস্বী), শ্রেণী শ্রেণি, সরণী সরণি, সারণী সারণি, সূচী সূচি, স্বাতী স্বাতি।

৩.১২ হ্রস্ব উকার দীর্ঘ উকার বিকল্প

এ ধরনের দৃষ্টান্ত তত বেশি নেই। কয়েকটি উল্লেখ করা হল:

ইন্দুর ইন্দূর, ঊর্ণনাভ উর্ণনাভ, ঊর্ণা উর্ণা, চঞ্চু চঞ্চূ, ভ্রূ ভ্রু।

উপরের দৃষ্টান্তগুলিতে যে-রূপটি অধিকতর পরিচিত বা প্রচলিত সেটির প্রচলনের পিছনে কোনো সুনির্দিষ্ট প্যাটার্ন নেই। কখনও হ্রস্ব স্বরচিহ্ন বেশি গৃহীত, কখনও দীর্ঘ স্বরচিহ্ন। হ্রস্ব ইকার দীর্ঘ ঈকারের ক্ষেত্রে দীর্ঘ ঈকারের দিকে ঝোঁক বেশি। কিন্তু হ্রস্ব উকার দীর্ঘ ঊকারের বিকল্পে হ্রস্ব উকারের দিকে। এক্ষেত্রে কোনো একটি চিহ্ন সুপারিশ করতে হলে উচ্চারণপন্থীরা হয়তো হ্রস্ব চিহ্নকে বেশি প্রশ্রয় দিতে চাইবেন। কিন্তু আমাদের মতে প্রচলনকে গ্রহণ করাই সংগত কাজ হবে। তৎসম শব্দের বানানে যখন হ্রস্ব দীর্ঘ দু'রকমের স্বরচিহ্নই রক্ষা করা হচ্ছে, তখন সরলতার যুক্তিতে প্রচলনকে অগ্রাহ্য বা উৎখাত করে একটিমাত্র স্বরচিহ্ন এই বানানগুলির উপর চাপিয়ে দেওয়ার কোনো অর্থ হয় না।

৩.২ বিসর্গসন্ধিজাত ওকার

সংস্কৃত থেকে আসা বেশ কিছু সমস্ত শব্দে অন্ত্যবিসর্গজাত ওকার রয়েছে, যেমন 'সদ্যোজাত', 'অকুতোভয়', 'ততোধিক', 'মনোকষ্ট', 'মনোযোগ', 'ইতোমধ্যে' ইত্যাদি। এই সাদৃশ্যে 'ছন্দোলিপি' ছন্দোমুক্তি' 'ছন্দোরূপ' ইত্যাদি করা হচ্ছে। আমাদের বক্তব্য যে, আগের শব্দগুলি আস্ত সমাসবদ্ধ শব্দ হিসাবে ওকার সুদ্ধই বাংলা ভাষায় এসেছে, সেগুলির ওকারকে আর তুলে দেবার প্রয়োজন নেই। কিন্তু পরবর্তী যে-যে-শব্দগুলির সমাস সংস্কৃতে ছিল না, সেগুলির আলাদা আলাদা খণ্ড যদি বাংলায় থাকে, তবে বাংলা নিয়মে তার ওকার বাদ দিলেও গবেষক বা ছাত্রের শাস্তি পাওয়া অসংগত হবে। ফলে 'সদ্যজাত', 'মনকষ্ট' লেখা যেতে পারে, 'মনযোগ' হতে পারে, কিন্তু 'মনরম' নয়, কারণ 'রম' কথাটি পৃথগ্ভাবে বাংলায় নেই। 'ছন্দমুক্তি' 'ছন্দলিপি' লেখারও কোনো বাধা নেই। তবে 'সদ্যোজাত' এবং 'মনোকষ্ট' পৃথগ্ভাবে বাংলা ভাষার সমাসরীতি মেনে তৈরি হয়নি, আস্ত সংস্কৃত সমাসরূপেই বাংলায় এসেছে, কাজেই এগুলির এই রূপই রেখে দেওয়া সংগত। বাংলা সমাস 'মন-মাঝি' 'মন-বেড়ি' (গানের উচ্চারণ 'মনো-বেড়ি' যদিও), 'মনদেওয়া-নেওয়া' ইত্যাদিতে আবার ওকার দেওয়ার পক্ষে কোনো যুক্তি নেই।

৩.৩ বিকল্প ব্যঞ্জনের সমস্যা

এটিও বানানের দিক থেকে অতিশয় গৌণ এক সমস্যা। অভিধানে মোটামুটি পরিচিত শব্দগুলির মধ্যে উশীর-উষীর, কিশলয়-কিসলয়, সরণি-শরণি,

এই ধরনের কয়েকটি বিকল্প ব্যঞ্জনাশ্রিত বানান চোখে পড়ে ; সবই উষ্ম শিস্ ধ্বনি সংক্রান্ত। এগুলিও প্রচলন মান্য করে লেখাই ভালো।

তবে ণত্ববিধি সংক্রান্ত সংশয়ের ফলে কোথাও মূর্ধন্য ণ হবে কি না তা নিয়ে অনেক সময় বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়। যেমন 'প্রবহমাণ' না প্রবহমান। জ্ঞানেন্দ্রমোহনের অভিধানে 'প্রবহমান' আছে। 'ব্যাকরণ কৌমুদী'তে প্রবহমাণ-এ মূর্ধন্য ণ বিধান আছে, হরিচরণের 'বঙ্গীয় শব্দকোষ'-এও মূর্ধন্য ণ। সম্ভবত র-এর সঙ্গে ধ্বনিগত দূরত্বই ণত্ববিধির এই দুর্বলতার কারণ।

৩.৪ অন্ত্য বিসর্গের সমস্যা

ক্রমশ অন্তত বস্তুত ইত্যাদি শব্দের শেষে বিসর্গ বজায় রাখা হবে কি না এ নিয়ে এক সময় তর্ক উত্তাল হয়ে উঠেছিল। দেবপ্রসাদ ঘোষ তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ব্যঙ্গের ভাষায় বলেছিলেন যে ক্রমশ ইত্যাদি শব্দকে শেষে হসন্ত দিয়ে হয়তো শেষ পর্যন্ত বাঙালিরা ক্রমশ উচ্চারণ করবে 'লোমশ'-এর মতো। তা যে হয়নি, তাঁর আশঙ্কা ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়েছে, তার কারণ তিনি এইসব চালু শব্দের ব্যবহারগত প্রক্রিয়াটি ঠিক ধরতে পারেননি। 'ক্রমশ' 'অন্তত' ধরনের শব্দ আগে মুখের কথায় আসে, পরে বাঙালি শিশু তা লিখতে শেখে। মুখে যদি সে ভুল না শেখে, তাহলে বানান থেকে তার 'লোমশ' উচ্চারণ করার কোনো যুক্তি নেই। সত্যিকারের লেখার ভাষা থেকে শেখা ঈদৃশ সদৃশ-কে যদি বাঙালি শিশু 'ইদরিশ্,' 'সদরিশ্' না পড়ে তাহলে ক্রমশকেও সে ক্রমশ্ পড়বে না।

তৎসম শব্দের বানানের একটি সুনির্দিষ্ট রূপ খাড়া করতে হলে অনেক ক্ষেত্রেই প্রচলিত অভ্যাসের বাইরে যেতে হবে। তা যাওয়া সংগত হত যদি বাংলা লেখায় শুধু হ্রস্ব স্বরচিহ্ন ব্যবহারের একটি অবিকল্প নীতি আমরা প্রতিষ্ঠা করতে পারতাম। তা এই মুহূর্তে সম্ভব নয়, কাজেই যৌথ অভ্যাসের গতি বুঝেই আমাদের চলতে হবে। অর্থাৎ 'গ্রন্থাবলী'-র জায়গায় ক্রমশ আরো বেশি লোক হয়তো 'গ্রন্থাবলি' লিখতে আরম্ভ করবেন, পরে সংবাদপত্র সচেতনভাবে বা অজ্ঞাতসারে সেটি গ্রহণ করবে—এবং তার ফলে আরো বেশি মানুষ সেটি পড়বেন এবং লিখবেন। এইভাবে পুকুরের মধ্যে ঢিল-ছুঁড়ে-জাগানো ঢেউয়ের মতো তা ক্রমশ ছড়িয়ে পড়বে এবং কালক্রমে অভিধানের প্রাথমিক এন্ট্রি হয়ে উঠবে। 'কুটির' যেমন এর মধ্যেই 'কুটীর'কে প্রতিযোগিতায় পরাভূত করতে চলেছে। ভাষার বিশেষ নিয়মের মতো বানানের নিয়মও এভাবেই ছড়ায়। এখানে সংস্কার-সমিতির চাপিয়ে দেওয়া নীতি কতটা কার্যকর হবে তাতে বেশ সন্দেহ আছে।

৪. তদ্ভব ও অর্ধতৎসম শব্দের বানান

১

তদ্ভব ও অর্ধতৎসম শব্দে নতুন বানান-নীতি নির্ধারণের মূল সমস্যাটি আর একবার স্মরণ করি : তা কতটা ব্যুৎপত্তিকে স্বীকার করবে, আর কতটা ধ্বনিসংবাদী হবে—এই হল প্রশ্ন। ধ্বনিসংবাদী হতে হলে বানানে সাধারণ-ভাবে দীর্ঘ ঈ দীর্ঘ ঊ বা তার কারচিহ্ন, ঋ, ঐ ঔ বা এদের চিহ্ন লেখা চলবে না, তার বদলে হ্রস্ব ই, হ্রস্ব উ বা এদের চিহ্ন, রি/র-ফলা হ্রস্ব-ইকার, ওই, ওউ ইত্যাদি লিখতে হবে। এ তো গেল স্বরবর্ণের কথা। ব্যঞ্জনবর্ণেও ঞ, মূর্ধন্য ণ, য, যুক্তব্যঞ্জন বা (বিদেশী শব্দ ছাড়া) দন্ত্য স, ষ, বিসর্গ ইত্যাদির ব্যবহার করা সম্ভব হবে না,—কারণ এই সংস্কৃত বর্ণগুলির উচ্চারণ বাংলা ভাষায় হয় সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়েছে, না হয় দু একটি সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্রে আংশিক বজায় আছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানান-সংস্কারের সবচেয়ে বড়ো প্রতিবাদী দেবপ্রসাদ ঘোষ এইখানেই সবচেয়ে তীব্র আপত্তি করেছিলেন।[১] তাঁর আপত্তির যুক্তিগুলি তুচ্ছ করার মতো নয়, সব কথা তাঁর অসংগতও ছিল না। ব্যুৎপত্তি ও বিবর্তিত রূপের মধ্যে একটা শারীরিক সাদৃশ্য থাকলে শিশুর পক্ষে ধরতে সুবিধা হয়। 'হীরক'-এ দীর্ঘ ঈকার ছিল বলেই 'হীরা' বা 'হীরে'-তে দীর্ঘ ঈকার রাখার জন্য সুপারিশ করা হলে তা হঠাৎ অগ্রাহ্য করা যায় না। তদ্ভব ও অর্ধতৎসম শব্দের বানানে ব্যুৎপত্তিকে কোথায় কতটা গ্রহণ করা হবে এবং উচ্চারণকেই বা কতটা সম্মান দেওয়া হবে, এই নিয়ে বাংলা বানানের ক্ষেত্রে একটা অনিশ্চয়ের টেনশন আছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, রবীন্দ্ররচনাবলী বা জনপ্রিয় সংবাদপত্রের যৌথ ও সম্মিলিত সংস্কার সমস্ত সাক্ষর বাঙালিকে এখনও স্পর্শ করেনি, তা আমরা জানি। ফলে এখনও এক-একজন এক-এক রকম লেখেন—কেউ ব্যুৎপত্তির দিকে বেশি ঝুঁকে থাকেন, আবার কেউ-বা উচ্চারণের দিকে। এক্ষেত্রে ছবিটি আরেকটু জটিল। একই মানুষ হয়তো কোনো-কোনো তদ্ভব-অর্ধতৎসম শব্দে ব্যুৎপত্তি-নিয়ন্ত্রিত বানান মানেন, আবার অন্য শব্দে বা শব্দগুচ্ছে উচ্চারণ-নির্ভর বানান গ্রহণ করেছেন। প্রত্যেকেই জানা ও মেনে চলার নানা

পর্যায় ও পরম্পরায় আছেন, খুব সচেতন লেখক ছাড়া একজনের ব্যক্তিগত অভিপ্রায়ের বা অভিরুচির ছবিটিও স্পষ্ট নয়। কারো কারো ক্ষেত্রে আবার বুদ্ধিগত সিদ্ধান্ত এবং চিরাচরিত অভ্যাসের অসংগতিও লক্ষ করা যায়, যেমন রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেও ঘটেছিল। বানানে রেফের পর ব্যঞ্জনদ্বিত্বের বর্জনে সম্মতি জানিয়েও তিনি লেখার সময় প্রায়ই দ্বিত্ব বজায় রেখেছেন।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৩৫-৩৬ সালের নতুন বাংলা বানানের নিয়ম এই জটিলতার নিরসনে বিশেষ সাহায্য করেনি। তাতে সবচেয়ে বড়ো দুর্বলতা ছিল ঢালাও বিকল্পের বিধান। অর্থাৎ দুইই চলবে, যে যেমন খুশি লিখতে পারে, এমন-কী তার অনিবার্য ফল হিসাবে একই ব্যক্তি দুই জায়গায় দুরকম বানান লেখারও অধিকার পেয়ে যায়। যেমন ৪ নম্বর নিয়মে।

অ-সংস্কৃত অর্থাৎ তদ্ভব, দেশজ ও বিদেশী শব্দ-এর বানানে যেখানে ই ঈ উ ঊ জড়িত, সে সম্বন্ধে বলা হয়েছে—

"যদি মূল সংস্কৃত শব্দে ঈ বা ঊ থাকে তবে তদ্ভব বা তৎসদৃশ শব্দে ঈ অথবা ঊ অথবা বিকল্পে ই অথবা উ হইবে যথা—কুমীর, পাখী, বাড়ী, শীষ, ঊনিশ, চূন, পূব অথবা কুমির পাখি, বাড়ি, শিষ, উনিশ, চুন, পুব। কিন্তু কতকগুলি শব্দে কেবল ঈ, কেবল ই অথবা কেবল উ হইবে, যথা—নীলা—নীলক, হীরা—হীরক[২], দিয়াশলাই—দীপশলাকা, খিল—কীল, পানি—পানীয়, চুল—চূল, তাড়ু—তর্দু, জুয়া—দ্যূত।

স্ত্রীলিঙ্গ এবং জাতি, ব্যক্তি, ভাষা ও বিশেষণবাচক শব্দের অন্তে ঈ হইবে, যথা—কলুনী, বাঘিনী, কাবুলী, কেরানী, ঢাকী, ফরিয়াদী, ইংরেজী, বিলাতী, দাগী, রেশমী। কিন্তু কতকগুলি শব্দে ই হইবে, যথা—ঝি, দিদি, বিবি, কচি, মিহি, মাঝারি, চলন্তি। পিসী, মাসী স্থানে বিকল্পে পিসি মাসি লেখা চলিবে।"[৩]

এ নির্দেশে সংস্কার-সমিতির আত্মবিশ্বাসের সবলতা বিশেষ ফুটে ওঠেনি। বিকল্প কেন থাকবে তার কারণ কোথাও জানানো হচ্ছে না—সম্ভবত এক্ষেত্রে সমিতি প্রচলনকেই মান্য করেছেন। কেবল "স্ত্রীলিঙ্গ এবং জাতি, ব্যক্তি" ইত্যাদি সংক্রান্ত নির্দেশে নিয়মটির আংশিক যুক্তিগত ভিত্তি তৈরির ক্ষীণ চেষ্টা দেখি। কিন্তু "কিন্তু কতকগুলি শব্দে" বলে আবার তাঁরা ঢালাও ম্যানডেট দিয়ে গেছেন "এ হইবে" বলে। সেখানেও প্রচলনের বিরুদ্ধে যাওয়ার মতো মনোবল তাঁরা দেখাতে পারেননি। অর্থাৎ তদ্ভব অর্ধতৎসম শব্দের বানানে ব্যুৎপত্তি ও উচ্চারণের টানাপোড়েন তাঁদের হাতেও নিরস্ত্র করার সুযোগ পায়নি।

যে-কাজ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওই বানান সংস্কার সমিতি অসম্পূর্ণ রেখে গিয়েছিলেন তা খানিকটা এগিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব সময় নিজের হাতে তুলে নিয়েছে।

অর্থাৎ সজ্ঞানে বা অজ্ঞানে হোক, একাধিক লেখক ব্যক্তিগত বানান-রীতিতে এবং আনন্দবাজারের মতো সংবাদপত্র প্রাতিষ্ঠানিকভাবে—বিকল্প ত্যাগ করে তদ্ভব-অর্ধতৎসম শব্দের উচ্চারণ-সংবাদী বানানের দিকে অগ্রসর হয়েছেন। লেখকদের মধ্যে সর্বাগ্রে আছেন রবীন্দ্রনাথ ; তাঁর বানান-নীতি তাঁর নিজের লেখায় যতটা না হোক, বিশ্বভারতী প্রকাশিত বইয়ে অনেক বেশি প্রতিফলিত। অন্যদের মধ্যে আছেন প্রমথ চৌধুরী, রাজশেখর বসু, বুদ্ধদেব বসু।[৪] বহুল প্রচারিত সংবাদপত্রের বানানের কোনো নির্দিষ্ট রূপ গৃহীত হলে তা মানুষের চিরাচরিত বানান-অভ্যাসকে খানিকটা আঘাত করে। তাকে পরিবর্তিত কতটা করে জানি না, কিন্তু ব্যঙ্গের মধ্যে যে-প্রতিবাদ বা আলোচনার আগ্রহ জাগিয়ে তোলে তার মূল্যও কম নয়। কিন্তু পরিবর্তনও ঘটেছে। বিকল্প ছেড়ে অভিন্ন রূপের দিকে তদ্ভব ও অর্ধতৎসম এবং এই জাতীয় শব্দের বানান ক্রমশ এগিয়ে চলেছে, তা অবশ্যই বলা সম্ভব। 'সংসদ বাঙ্গালা অভিধান'-এর তৃতীয় সংস্করণে (১৯৭১) সংকলক যথার্থই লক্ষ করেছেন যে "বর্তমানে বাঙ্গালা বানানে দীর্ঘস্বর বর্জনপূর্বক হ্রস্বস্বর ব্যবহারের প্রবণতা ব্যাপক হইয়াছে। অর্থাৎ এই জাতীয় সকল শব্দেই কেবল ি-কার ও ু-কার ব্যবহৃত হইতেছে।" এমন-কী "স্ত্রীলিঙ্গ এবং জাতি, ব্যক্তি, ভাষা ও বিশেষণ-বাচক" শব্দেও যে "ি-কারই ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হইতেছে" তাও তাঁর দৃষ্টি এড়ায়নি।[৫]

অর্থাৎ খুব নিঃশব্দে বিতর্কের একটি পক্ষের পরাভব ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠছে এবং অন্য একটি পক্ষের, অর্থাৎ ধ্বনি-সংবাদী বানান-পন্থীদের অগ্রগতি সূচিহ্নিত হচ্ছে। আমাদের মনে হয়, সমস্ত দিক থেকে সংগত হোক আর না-হোক, এই প্রবণতা অনিবর্তনীয় এবং অপ্রতিরোধ্য—ক্রমশ এ জাতীয় সমস্ত শব্দের বানানেই উচ্চারণের অধিকার বিস্তার লাভ করবে।

তবু সমস্যা কিছু থাকবে, এবং পরে আমরা সে সমস্যার এলাকাগুলিকে নির্দেশ করব। কিন্তু যে-পরিবর্তন এর মধ্যেই ঘটেছে, তার ছকটি দেখিয়ে দেবার চেষ্টা করি। প্রথমে স্বরচিহ্নের আলোচনা সেরে আমরা ব্যঞ্জনের আলোচনায় প্রবেশ করব।

স্বরচিহ্নের মধ্যে দীর্ঘ ঈকার ও দীর্ঘ ঊকারের উচ্চারণ বাংলায় নেই, অর্থাৎ এই উচ্চারণ ফোনিমিক নয়। এর সহজ অর্থ হল, স্বরের হ্রস্ব-দীর্ঘ উচ্চারণ-ভেদে অর্থ পালটাচ্ছে, এমন শব্দের দৃষ্টান্ত বাংলায় নেই।[৬] স্বরের দীর্ঘ উচ্চারণ ফোনিমিক না হওয়ার দরুন আলোচ্য শব্দগুলিকে উচ্চারণ-অনুগ করতে গিয়ে দীর্ঘ ঈকার .দীর্ঘ ঊকারের জায়গায় হ্রস্ব ইকার হ্রস্ব উকার লেখা চলছে, এবং এ ধরনের প্রয়োগ ক্রমশ বেশি লোকের কাছে গৃহীত হচ্ছে। এক্ষেত্রে সম্ভবত দুটি পর্যায় তৈরি হয়েছে। শব্দের অনাদ্য বা 'নন-ইনিশিয়াল' ী-কার ূ-কার আগে বা সহজে বর্জিত হয়েছে এবং আদ্য বা 'ইনিশিয়াল' অর্থাৎ গোড়ার ব্যঞ্জনের সঙ্গে যুক্ত ী-কার ূ-কার পরে স্থানচ্যুত হয়েছে—এই আমাদের আনুমানিক ধারণা। এ ধারণা সত্য হোক বা না হোক, ঘটনাটি কী ঘটছে তা দেখা যাক (আমরা প্রথমে তদ্ভব বা অর্ধতৎসম, তার পরে সংস্কৃত মূল শব্দ রাখছি)—

অনাদ্য দীর্ঘ চিহ্নের বদলে হ্রস্ব চিহ্ন

তিসি—অতসী, আইবুড়ো—অব্যূঢ়, আংটি—অঙ্গুষ্ঠী, আশি—অশীতি, আধলি—অর্ধস্থালী, আহির—আভীর, ইলিশ—ইল্লীশ, উলুখড়—উলূক ? কাঁটি—কণ্ঠী, কালি (লেখার)—কালী, গাড়ি—গন্ত্রী, গুনিন—গুণী, গোরু—গোরূপ, ঘটি—ঘটী, ঘড়ি-ঘটী, ঘুন্টি—ঘণ্টী, চাপাটি—চর্পটী, চৌকি—চতুষ্কী, ছাউনি—ছাদনী, জেঠি—জ্যেষ্ঠী, তাড়ু—তর্দূ, দিশি—দেশী, নই—নদী, : পড়শি—প্রতিবেশী, পাখি—পক্ষী, পানি—পানীয়, পিদিম—প্রদীপ, পোয়াতি—পোতবতী, বউ—বধূ, বাঁশি—বংশী, বাড়ি—বাটী, বিচ্ছিরি—বিশ্রী, বিভুঁই—বিভূমি, মাছি—মক্ষী, মশারি—মশহরী, জাউ—যবাগূ, শাড়ি—শাটী, সাবিত্তির—সাবিত্রী, সিঁড়ি—শ্রেণী, হাতি—হস্তী, হাঁড়ি—হণ্ডী ইত্যাদি।

আদ্য দীর্ঘ স্বরচিহ্নের বদলে হ্রস্ব চিহ্ন

আমাদের বানানের অভ্যাসে শব্দের গোড়াকার দীর্ঘ ঈ দীর্ঘ ঊকার সম্ভবত আরেকটু স্থায়ী হয়েছে। অভিধানে এখনও দুরকম বানানই দেখানো

হয়, তবে 'চলন্তিকা', 'সংসদ বাঙলা অভিধান' বা 'ব্যবহারিক শব্দকোষ'-এ যেমন—প্রথম 'এন্‌ট্রি'টি হ্রস্ব স্বরচিহ্নের, দ্বিতীয়টি দীর্ঘ স্বরচিহ্নের। এতে বাঙালির স্বাভাবিক প্রবণতাটি প্রতিফলিত হয়। তবু যিনি পাখি বাড়ি শাড়ি স্বীকার করে নিয়েছেন তিনি পুজো লিখতে প-এ দীর্ঘ-ঊকার দেওয়ার কথাও হয়তো ভাবেন। লক্ষ করি, তদ্ভব ও অর্ধতৎসম শব্দের আদিতেও হ্রস্ব স্বরচিহ্ন ক্রমশ গৃহীত হয়ে চলেছে। কিছু দৃষ্টান্ত দিই :

রিষ—ঈর্ষ্যা, উনা, উনো, উন্ [-পাঁজুরে]—ঊন, উরুত—ঊরু, উব্‌—ঊর্ধ্ব, খিল—কীলক, কুয়ো—কূপ, কুঁচি—কূর্চিকা, ঘুর্, ঘুল্—ঘূর্ণ, চুন, চুনা, চুনো, চুরন—চূর্ণ, চুল—চূল, চুড়ো—চূড়া, ছুঁচ, সুঁই—সূচী, সুতা, সুতো, ছুতা, ছুতার, ছুতোর—সূত্র, জিওল—জীব, জুয়া জুয়ো—দ্যূত, তিরি—স্ত্রী, তুলা, তুলো, তুলি—তূলা, তূলি, দিঘি—দীর্ঘিকা, দিয়া [শলাই]—দীপ, দুব্বো—দূর্বা, দুষা—দূষণ, ধুলা, ধুলো—ধূলি, পিরিত—প্রীতি, পিলে—প্লীহা, পুঁই—পূতিকা, পুব—পূর্ব, পুরা—পূর্ণ, পুজো—পূজা, পুন্নিমে—পূর্ণিমা, বিচি—বীজ, বিড়ি—বীটি, ভুঁই—ভূমি, ভুরু—ভ্রূ, মুখ্‌খু, মুখ্যু—মূর্খ, মুত—মূত্র, মুরছা—মূর্ছা, মুরতি—মূর্তি, মুলা, মুলো—মূল, রুপো—রূপ্য, শিষ—শীর্ষ, শিগ্‌গির—শীঘ্র, শুয়োর—শূকর, শুদ্দুর—শূদ্র, শুলোনো—শূল, শুনশান—শূন্য, ছিরি—শ্রী, ইত্যাদি।

বলা বাহুল্য, বানান-অভ্যাসের এই বিস্তার ও সর্বাঙ্গীণতার দিকে অগ্রগতি, অর্থাৎ 'জেনারালাইজেশন'-এর প্রবণতা ক্রমপর্যায়ী। তা এক লাফে ঘটে না, বিবর্তনসূত্রে ধীরে ধীরে এগোয়। ফলে আমরা অনেকে যেখানে শাড়ি বাড়ি গাড়ি হাতি ইত্যাদির সঙ্গে একই ঢালাও নিয়মে দিল্লি হিন্দি বাঙালি জাপানি মাসি পিসি ধোপানি ইত্যাদি লিখি, সেখানে অন্যরা হয়তো পরের শব্দগুলির শেষ বর্ণে দীর্ঘ-ঈকার দেওয়াই এখনও পছন্দ করেন বা তাতেই অভ্যস্ত। ব্যক্তিগত বানান পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নানা পর্যায়ে, নির্দিষ্ট শব্দ বা শব্দগুচ্ছের পরিপ্রেক্ষিতে নিতে হয়। তাতে যেমন নিজের জন্য যুক্তি তৈরি করার দরকার পড়ে, তেমনই বহুলপ্রচারী সংবাদপত্রে ও অন্যান্য মুদ্রিত-লিখিত রূপে সেই সব বানানের ব্যবহারও সেই সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করে।

হ্রস্ব স্বরচিহ্নের দিকে এই একমুখী প্রবণতার মধ্যেও কিছু কিছু দীর্ঘ চিহ্ন বিষয়ে সিদ্ধান্ত বিলম্বিত হয়েছে। অর্থাৎ তদ্ভব-অর্ধতৎসম শব্দের দীর্ঘ স্বরচিহ্ন এখনই স্থানচ্যুত করতে পারা যাবে কি না, সে সম্বন্ধে আমরা সম্পূর্ণ নিঃসংশয় হতে পারিনি। এসব ক্ষেত্রে দেবপ্রসাদ ঘোষ প্রমুখের আপত্তি যাকে বলে 'লাস্ট ডিচ্ ব্যাট্‌ল' বা দেয়ালে পিঠ দিয়ে লড়াই তা-ই

যেন চালিয়ে যাচ্ছে। আগে যে-সমস্যার কথা বলেছি তার এলাকা এইটাই। এর দুটি ভাগ আছে। আস্ত শব্দে হ্রস্ব চিহ্ন ব্যবহারে দ্বিধা, যেমন উনচল্লিশ, কীড়া—কীট, কীর্ত্তি—কীর্তি, পূরবী—পূর্ব, বীন্—বীণা, সীসে—সীসা, হীরা, হীরে—হীরক। অন্যদিকে তৎসম শব্দের সঙ্গে বাংলা প্রত্যয় যোগ করে বা অসংস্কৃত শব্দের সঙ্গে সমাস করে যে 'বাংলা' শব্দ তৈরি হয়, তার তৎসম অংশে দীর্ঘ স্বরচিহ্নের অটলতা, যেমন—

কূটকচাল, চীনা, দূতিয়ালি, ধূর্তামি, নীলা, ভূতুড়ে, ইত্যাদি। সম্প্রতি বহুল-প্রচারিত একটি পত্রিকায় চিনা, চিনদেশ, নিলা, হিরে ইত্যাদি লক্ষ করা যাচ্ছে। এই বানান কালক্রমে বিস্তৃত হওয়া অসম্ভব নয়। কিন্তু ঐ পত্রিকাতেও এ বানান নতুন এবং অনেক বাঙালির বানান-অভ্যাসে এখনও এগুলি ততটা স্বচ্ছন্দভাবে গৃহীত হয়নি। আর সংস্কৃত শব্দের সঙ্গে বাংলা প্রত্যয় যোগ করলেও তার তৎসম রূপটি খুব স্পষ্ট থাকে, ফলে 'ভূতুড়ে'কে 'ভুতুড়ে' লেখা উচিত কি না, তা ভেবে দেখতে হবে।

এই প্রবণতা একদিকেই অঙ্গুলি নির্দেশ করে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানান সংস্কার সমিতির বিকল্প-বিধান ও দ্বিধামনস্কতা অতিক্রম করে এবং দেবপ্রসাদ ঘোষ প্রমুখের যুক্তির লজিক উপেক্ষা করে বানানের একটি সাধারণীকরণ ঘটছে। ঘটছে খুব ধীরে ধীরে, খবরের কাগজ তাতে খানিকটা প্রবর্তনা দিয়েছে, কিন্তু ঘটনার বাস্তবতা ও অভিমুখিতা বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। পরে যাঁরা বানান সংস্কারের কাজে নিয়োজিত হবেন তাঁদের এই অপ্রতিবর্তনীয় ঘটনার দিকে লক্ষ্য রাখতেই হবে। এর বিপরীত কোনো সিদ্ধান্ত নিতে গেলে তা নদীর স্রোতকে তার উৎসের দিকে ফিরিয়ে দেওয়ার মতো ব্যাপার হবে এবং সে চেষ্টায় সাফল্যের সম্ভাবনা বেশি থাকবে না।

দীর্ঘ-ঈকারের দীর্ঘসূত্রী অবস্থানের আরেকটি ক্ষেত্র আছে সেটি স্ত্রী-লিঙ্গ বিশেষ্য শব্দে। বিশেষণ শব্দে তা ক্রমশ হ্রস্ব ইকারকে জায়গা ছেড়ে দিচ্ছে তা আমরা লক্ষ করি, ফলে খুশি (রাজশেখর বসুর বিশেষ্য 'খুশি' এবং বিশেষণ 'খুশী'র পার্থক্য এখন আমরা অনেকেই রক্ষা করি না), রাজি (=সম্মত), ভারি—এর সব শব্দ তদ্ভব অর্ধতৎসমের মধ্যে না পড়লেও এগুলিতে হ্রস্ব ইকারের সংক্রমণ ক্রমশ বাড়ছে। কিন্তু তদ্ভব অর্ধতৎসম স্ত্রীলিঙ্গে, বিশেষত 'ই', 'ইনি' বা 'নি' ধ্বনিযুক্ত স্ত্রীপ্রত্যয়ে দীর্ঘ ঈকার লেখার প্রবণতা বিশেষ দুর্বল হয়নি। এখানে স্ত্রীবাচক অর্থ অভ্যস্ত বানান লেখার প্রবণাতকে আরো শক্তিশালী করছে।

পাঠকদের জানা আছে যে, রবীন্দ্রনাথ তদ্ভব বাংলার স্ত্রী-প্রত্যয়ের হ্রস্ব-ইকার লেখার পক্ষপাতী ছিলেন[৭]। তাঁর হ্রস্ব ইকার দেওয়া স্ত্রীবাচক শব্দের তালিকা—

ছুঁড়ি, ছুকরি, খুড়ি, কাকি, মামি, পাগলি, জেঠি, বেটি, দিদি, মাসি, পিসি, পাঁঠি, ভেড়ি, খুড়ি, বুড়ি, বামনি, খুকি, শ্যালি, নেড়ি ;

নি প্রত্যয় যোগে তাঁর শব্দমালা—

কলুনি, তেলিনি, গয়লানি, বাঘিনি, ধোবানি, নাপতিনি, কামারনি, চামারনি, পুরুৎনি, মেতরানি, তাঁতিনি, মজুরনি, ঠাকুরানি, চাকরানি, সাপিনি, পাগলিনি, উড়েনি, কায়েৎনি, খোট্টানি, মোগলানি, মুসলমাননি, জেলেনি, রাজপুৎনি…

বাংলা ব্যাকরণ বিষয়ে শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রীর সঙ্গে তর্কে[৮] রবীন্দ্রনাথ এ সম্বন্ধে যে-যুক্তি দিয়েছিলেন সে-যুক্তি ভাষাবিজ্ঞান-সম্মত। অর্থাৎ উচ্চারণের দিক থেকে ধরলে এ সব শব্দে ই, ইনি নি প্রত্যয়ই আছে, বাংলা প্রত্যয়ে 'ঈ' বলে কোনো বস্তু নেই[৯]।

এ সম্বন্ধে আমাদের মত রবীন্দ্রনাথকেই সমর্থন করে। দিদি গিন্নি বুড়ি খুকি মাসি পিসি যদি হ্রস্ব-ইকার নিয়ে তাদের স্ত্রীত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ না জাগায় তাহলে ঘুড়ি, ছুঁড়ি, ছুটকি, মুটকি, কলুনি, তেলেনিরও ওই ব্যাপারে কোনো অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। লিঙ্গবিধানযুক্ত ব্যাকরণে পদের লিঙ্গ চেনবার শুধু একটি মাত্র cue বা ইঙ্গিত আছে, এমন দৃষ্টান্ত দুর্লভ। সংস্কৃত ভাষাতেও স্ত্রীলিঙ্গ কেবল ঈ বা ইনী-অন্তক নয়। সেখানে আকারান্ত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ প্রচুর আছে, এমন-কী হ্রস্ব-ইকারন্ত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দও কম নেই। ব্যাকরণ কৌমুদীতে মতি বুদ্ধি স্মৃতি আকৃতি নীতি ইত্যাদি হ্রস্ব-ইকারন্ত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের তালিকা রীতিমতো দীর্ঘ[১০]।

আর সংস্কৃতে স্ত্রীলিঙ্গ শুধু অর্থের ব্যাপার নয়, তা ব্যাকরণগতও বটে। অর্থাৎ বাংলায় তদ্ভব-অর্ধতৎসম শব্দে ই-ইনি লাগিয়ে স্ত্রীলিঙ্গ লিখলে কিছু লোকের মতে বানান ভুল হবে, কিন্তু তার বাইরে আর কোনো অপরাধ হবে না। কিন্তু সংস্কৃতে এ শব্দগুলি স্ত্রীলিঙ্গ বলে না চিনলে এদের বিশেষণ সর্বনাম ইত্যাদির প্রয়োগে অর্থাৎ ব্যাকরণেও ভুল হবে। আমরা সংস্কৃত প্রত্যয় এবং বাংলা প্রত্যয়—এ দুয়ের পার্থক্য স্বীকার করি এবং বাংলা প্রত্যয়ে সম্ভব ক্ষেত্রে হ্রস্ব স্বরচিহ্নের ব্যবহারই উচিত বলে মনে করি।

৪

তদ্ভব-অর্ধতৎসম শব্দের, বিশেষত তদ্ভব শব্দের, আরেকটি সমস্যা ঐ ঔ নিয়ে। সংস্কার-সমিতির সিদ্ধান্ত ছিল, এ ধরনের শব্দে বর্ণ দুটিকে উচ্চারণগত ভাবে বিশ্লিষ্ট করে ওই/অই বা ওউ/অউ লিখতে হবে। দেবপ্রসাদ ঘোষ তাতে ব্যঙ্গ করে লিখেছিলেন যে, "অতঃপর ফুলের ওপর শুধু

'মউমাছিরা' গুঞ্জন করবে, কুকুরগুলো শুধু 'ভউ ভউ' করে ডাকবে, ছেলেরা শুধু 'দউড়া দউড়ি' করবে, আর রাস্তার 'হই হই রই রই' শুনে পুলিশ 'ফউজ' তাড়া করে আসবে।"[১১]

আমরা এ যুক্তির সারবত্তা স্বীকার করি না। বরং মনে করি মৌ এর বদলে মউ এবং দৈ-এর বদলে দই, এমন-কী এই শর্তকে বিস্তার করে 'দউড়া দউড়ি' 'চউমাথা' ইত্যাদি অনায়াসে লেখা যেতে পারে।

মনে রাখতে হবে, এসব শব্দের ক্ষেত্রে ঐ ঔ বা তাদের চিহ্ন রাখার যুক্তি ব্যুৎপত্তির যুক্তি নয়, কারণ সংশ্লিষ্ট সংস্কৃত শব্দ-গুলির মধ্যে ঐকার ঔকারের বালাই ছিল না। ভাষার বিবর্তনে এইসব শব্দ যখন বাংলায় এসে অর্ধস্বরান্ত একাক্ষর ('মনোসিল্যাবিক') রূপ পেয়েছে তার পর থেকেই ঐকার ঔকার লেখা শুরু হয়েছে মাত্র। কাজেই এগুলিতে ঐকার ঔকার না লিখলে ব্যুৎপত্তি বর্জনের অপরাধ ঘটে না, নেহাৎ একটি প্রাক্তন অভ্যাস লঙ্ঘনের ত্রুটি ঘটে। চউমাথা, চউকি দউড়া-দউড়ি, নউকা, লউ (রক্ত)— ইত্যাদিকে ঔকার বাদ দিয়ে লিখতে এমন কিছু বেশি সময় লাগে না, প্রেসেও একটি টাইপ-ইউনিট কম বসাতে হয়। বই (পুস্তক) এবং 'বই কি' (যাব বই কি)-র বই একই ভাবে লেখা যেতে পারে, প্রতিবেশ থেকে দ্ব্যর্থকতার নিরসনে কোনো সমস্যা নেই। 'লক্ষ্ণৌ' 'লখনউ' হতে পারে, হয়েওছে। এতে তৎসম এবং অ-তৎসম শব্দে ভেদ রাখাও সম্ভব হবে। বিদেশী শব্দে অউরঙগজেব লেখাতেও অসুবিধা নেই। এখানে সময় অল্প বেশি লাগছে, টাইপ একটি বেশি ব্যবহার করতে হচ্ছে, কিন্তু এ শব্দটি বহুল-ব্যবহৃত নয়, কাজেই ইতিহাস বইয়ের অংশে বা দু-একটি নাটকে ছাড়া সে সমস্যা গুরুতর বলে বোধ হবে না। যদি আওরঙগজেব লিখি, তাহলে এটা মেনে নিতেই হচ্ছে, 'আও' বা 'আউ'-কে আর সংক্ষেপ করার উপায় নেই। এক্ষেত্রে সুনীতি-কুমারের যুক্তিই প্রবল—বাংলার ছাব্বিশটি[১২] যৌগিক স্বরকে যদি সংক্ষিপ্ত না করা যায় অই /ওই অউ /ওউ-কে তা করারও কোনো প্রয়োজন নেই[১৩]।

৫

ব্যঞ্জনধ্বনির রক্ষা / বর্জনের সমস্যা

তদ্ভব অর্ধ-তৎসম শব্দে দীর্ঘ স্বরচিহ্ন ক্রমশ লঘুস্বরচিহ্নের দ্বারা স্থানচ্যুত হচ্ছে—এই ঘটনার ক্রমবিস্তার আমরা লক্ষ করেছি। ব্যঞ্জনের ক্ষেত্রেও অংশত এটা ঘটছে। কিন্তু এখানেও আমরা দুটি পরস্পরবিরোধী অভিপ্রায়েরই সাক্ষাৎ পাই। প্রথমত, পদের অনাদ্য ব্যঞ্জনকে যত সহজে স্থানচ্যুত করা সম্ভব

হয়েছে, যেমন মূর্ধন্য ণ-কে দন্ত্য-ন-র দ্বারা—পদের আদ্য ব্যঞ্জনকে তত সহজে করা যায়নি। দ্বিতীয়ত, অন্তঃস্থ য এবং মূর্ধন্য ষ-এর স্থানচ্যুতি —যথাক্রমে জ এবং শ-এর দ্বারা, বেশ কঠিন বলে গণ্য হয়েছে। এই দুটি বৈশিষ্ট্য মিলিয়ে যা দাঁড়ায়, তার উদাহরণ হল—'ষাঁড়'-এর মূর্ধন্য ষ দিব্যি টিকে আছে, কিন্তু অর্ধতৎসম তদ্ভবয় না হক, বিদেশী শব্দে দেখি 'পোশাক'-এ মূর্ধন্য ষ তালব্য শকে ক্রমশ জায়গা ছেড়ে দিচ্ছে। তবু সাধারণভাবে বলা যায়, দীর্ঘ স্বরচিহ্নের বদলে লঘু স্বরচিহ্নের ব্যবহার ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছে, ফলে এখন আর তা বিশেষ ভ্রূকুঞ্চন জাগায় না। 'নিলা' 'হিরে'-ও হয়তো চলে যাবে। কিন্তু 'ষাঁড়'কে শাঁড়' লিখতে এখনও একটি বড়ো সামাজিক মনস্তত্ত্বের দেয়াল আমাদের ডিঙোতে হবে।

অর্ধতৎসমর বেলায় এখনও কিছু সমস্যা অবশ্য আছে, বিশেষত যে অর্ধ-তৎসমগুলি মূল সংস্কৃত শরীরের বেশ কাছাকাছি। সেক্ষেত্রে দুটি বিকল্পের মধ্যে টেনশন চলে। এই টেনশন স্বরচিহ্নের ক্ষেত্রে যেমন অল্পবিস্তর আছে ব্যঞ্জনচিহ্নের ক্ষেত্রেও তেমনই স্পষ্ট। খেত/খ্যাপা আমরা গ্রহণ করেছি কিন্তু এখনও 'সংসদ'-এর মতো অভিধানে 'ক্ষীরা', 'ক্ষীরাই' এন্‌ট্রি পাই। 'জিজ্ঞাসা' তৎসম বানান হিসাবে ঠিকই আছে, কিন্তু অর্ধতৎসম 'জিজ্ঞেস' এবং 'জিগ্‌গেস' দুইই পাই, অকারণ য-ফলা লাগানো 'জিগ্যেস'-ও বিরল নয়। 'প্রত্যাশা'র অর্ধতৎসম রূপকে য-ফলা দিয়ে 'পিত্যেশ' লিখব, না 'পিত্তেশ' লিখব উচ্চারণ মেনে? অর্ধতৎসম যদি পুরোপুরি উচ্চারণ অনুযায়ী বানান লিখতে যাই তাহলে এখানকার চেনা অনেক শব্দের বানান কী দাঁড়াবে তা লক্ষ করুন। আমরা যুক্তব্যঞ্জনই লিখছি, তা ভাঙলে আরো ভিন্ন একটি রূপ দাঁড়াবে।

তৎসম	অর্ধতৎসম প্রচলিত বানান	উচ্চারণ-অনুগ বানান
অখ্যাতি, সুখ্যাতি	অখ্যেত, সুখ্যেত	অক্‌খেত, সুক্‌খেত
অত্যাচার	অত্যেচার	ওত্তেচার
অনবদ্য	অনবদ্যি	অনোবোদ্দি
অন্যায্য	অনেয্যি	অনেজ্জি
	অলেয্য	অলেজ্জ
অবশ্য	অবিশ্যি, ওবিশ্যি	ওবিশ্‌শি
অবাধ্য	অবাধ্যি	অবাদ্ধি
অভ্যাস	অভ্যেস, ওভ্যেস, ওব্যেস	ওব্‌ভেশ, ওব্বেশ

অমান্য	অমান্যি	অমান্নি
অযোগ্য	অযুগ্যি	অজুগ্‌গি
আজ্ঞা	আজ্ঞে	আগ্‌গে*
আঢ্য	আড্যি, আঢ্যি	আড্ডি, আড্‌ঢি
আদ্য	আদ্যি	আদ্দি
আধিক্য (+তা)	আদিখ্যেতা	আদিক্‌খেতা
আলস্য	আলিস্যি	আলিশ্‌শি
কাব্য	কাব্যি	কাব্বি
গম্য	গম্যি	গোম্মি
জন্য	জন্যে	জোন্নে
ধন্য	ধন্যি	ধোন্নি
প্রত্যয়	পেত্যয়	পেত্তয়
প্রত্যাশা	পিত্যেশ	পিত্তেশ
বিদ্যা	বিদ্যে	বিদ্দে
বৈদ্য	বদ্যি	বোদ্দি
ভব্য	ভব্যি	ভোব্বি
মিথ্যা	মিথ্যে	মিত্থে
সাধ্য	সাধ্যি	শাদ্দি

দৃষ্টান্ত বাড়ানোর প্রয়োজন নেই, কিন্তু এ থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে য-ফলান্ত অর্ধতৎসম শব্দে য-ফলা ত্যাগ করা সহজ নয়। এক্ষেত্রে তদ্ভব থেকে অর্ধতৎসম আলাদা হয়ে যায়। তদ্ভব শব্দে আবার য-ফলা রাখারই কোনো অবকাশ নেই।

কিন্তু য-ফলার প্রশ্নটি আসছে পরে। বর্ণমালায় ব্যঞ্জনের ক্রম অনুযায়ীই আমরা অগ্রসর হই। মূর্ধন্য ণ যে তদ্ভব বানান থেকে প্রায় সম্পূর্ণরূপে নির্বাসিত হতে চলেছে তা আমরা লক্ষ করেছি। 'ব্যবহারিক শব্দকোষ'-এ[১৪] কাজী আবদুল ওদুদ "উৎকূণ" থেকে এসেছে বলে প্রথম এনট্রি রেখেছেন মূর্ধন্য ণ ওয়ালা 'উকুণ'। কিন্তু তাঁর এই মূর্ধন্য-ণ মমতা লোকের অভ্যাসে দীর্ঘদিন পরিত্যক্ত হয়েছে।

এখন কাণ, চূণ, পাণ, বাণান, সোণা ইত্যাদি বানান দেখলে আমরা কৌতুক বোধ করি—দেবপ্রসাদ ঘোষ তাঁর প্রয়াণের (১৯৮৫) বহু আগে নিশ্চয়ই তাঁর ক্রুসেডের নিষ্ফলতা লক্ষ করে গেছেন। কিন্তু দু একটি অর্ধতৎসম শব্দের ক্ষেত্রে মূর্ধন্য ণ-কে নিয়ে সমস্যা আছে। "গুণী"তে অবশ্যই মূর্ধন্য ণ, কিন্তু "গুনিন"-এ? রবীন্দ্রনাথ "বীণা"-তে মূর্ধন্য-ণ রেখেও 'বীন', 'বীনকার'-এ দন্ত্য-ন, ব্যবহার করছেন। 'গণ্য'-তে মূর্ধন্য

ণ, কিন্তু 'মান্যি-গন্যি-তে ? 'পুন্নিমে' "পুন্নিমা" দন্ত্য-ন দিয়ে লিখতে পারি, কিন্তু 'পুণ্যি' হবে না পুন্যি/পুন্নি হবে ?

কাজেই মূর্ধন্য ণ-র প্রসঙ্গেও তদ্ভব-অর্ধতৎসমর মধ্যে বৈষম্য ঘটে, তদ্ভব মূর্ধন্য ণ বর্জন করতে চায় তো অর্ধতৎসম, অন্তত যে-অর্ধতৎসমগুলি মূল রূপের বেশ কাছাকাছি, কেবল স্বরসংগতির ফলে একটু ভিন্নতা পেয়েছে, সেগুলি মূর্ধন্য ণ সম্বন্ধে একটু রক্ষণশীল। একটা জিনিস লক্ষ করি যে, স্বরসংগতি ছাড়াও সমীভবনের ফলে যে র + ণ্ 'ন্ন্' রূপ পেয়েছে, সেখানে 'ন্ন' অনেক বেশি গৃহীত। অর্থাৎ গিন্নি (গৃহিণী>গিরিনি> গির্নি>) বন্ন (বর্ণ), ধন্না ইত্যাদির সাদৃশ্যে পুন্নিমা খানিকটা গ্রাহ্য হয়ে এসেছে কিন্তু অন্যত্র, বিশেষত য-ফলা যুক্ত মূর্ধন্য ণ সহজে দন্ত্য নকে স্থান ছেড়ে দিতে প্রস্তুত নয়।

য-এর বিষয়ে আমরা যে বিচিত্র ব্যাপারটি লক্ষ করি তা এই। অনাদ্য যুক্তব্যঞ্জনের য[১৫] সব ক্ষেত্রেই উচ্চারণ-সংগত জ-কে জায়গা ছেড়ে দিয়েছে কিন্তু শব্দের আদ্য অবস্থানে সে সরে যাবার লক্ষণ দেখাচ্ছে না। য-র এই স্ববিরোধ কিছু উদাহরণে লক্ষ করা যাক—তদ্ভব শব্দে এই আদ্য রক্ষণশীলতা ও অনাদ্য বিপ্লব খুবই স্পষ্ট।

আদিতে য	অনাদ্য জ
যা, যিনি, যে, যার,	কাজ (কার্য)
যাওয়া, যেমন,	আজি (আর্যিকা)
যখন ইত্যাদি	সেজ (শয্যা)
অর্ধতৎসম	অর্ধতৎসম
যজ্ঞি	সুজ্জি, আচাজ্জি, ভটচাজ্জি,

অনেকেই লক্ষ করেছেন প্রাচীন বাংলায় যে, যিনি, যেন যাওয়া ইত্যাদি বানান 'জ' দিয়ে লেখা হত। তাই সুনীতিকুমার প্রস্তাব করেছিলেন বাংলাতেও তদ্ভব যেন, যখন, যা, যিনি ইত্যাদি শব্দ জ দিয়ে লেখা হোক। দেবপ্রসাদ ঘোষ এই যুক্তি মানতে রাজি ছিলেন না,[১৬] তাঁর মতে ওগুলি ভ্রান্ত বানান। হিন্দিতে 'যাওয়া'-র ক্রিয়াটি 'জানা' হিসাবে লেখা হয়, লেখা হয় 'জব' (যখন), 'জিসকো' (যার), ইত্যাদি, কিন্তু য-র ব্যবহার সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত হয়নি, ফলে আমরা ইয় উচ্চারণ থাকলে সর্বত্রই য পাই।[১৭] সে

তুলনায় বাংলার তদ্ভব শব্দের য-চিত্রটি অনেক স্পষ্ট—শব্দের গোড়ায় য রাখো, অন্যত্র জ। যাই হোক, বাংলায় জাঁতি, জুঁই (যন্ত্র, যূথিকা) ধরনের দুএকটি শব্দে ব্যতিক্রম দেখা গেলেও শব্দের গোড়ায় য-ই মূল নিয়ম। শব্দের আদি স্থানটি সকলের সর্বাগ্রে নজরে আসে বলেই কি আমরা এখানে বেশি রক্ষণশীল ? এই রক্ষণশীলতার কোনো ন্যায্য ভিত্তি নেই।

শ-ষ-স-র সমস্যাটি আমাদের বানান স্বভাবের অন্তর্গত অসামঞ্জস্যকে আরো স্পষ্ট করে তোলে। বাংলায় ষ ও স-এর উচ্চারণ খুবই সীমাবদ্ধ—ট-ঠ ধ্বনির আগে ষ এবং এই ধরনের অন্য কয়েকটি ক্ষেত্রে[১৮] স্ (s) উচ্চারিত হয়। তার বাইরে সর্বত্রই শ্—এবং বাংলার প্রধান ও সর্বব্যাপ্ত শিস্ ফোনিম হল এই শ্। তা সত্ত্বেও তদ্ভব এবং অর্ধতৎসম শব্দের বানানে তার উচ্চারণকে অগ্রাহ্য করে আমরা ব্যুৎপত্তির ষ বা স-কে এনে বসাই। এবং এক্ষেত্রে আরো যা কৌতূহলের বিষয়—আদ্য বা অনাদ্য অবস্থান-নির্বিশেষে তা করি আমরা। অর্থাৎ য-জ-এর মতো বিন্যাস এখানে ঘটে না। যে রবীন্দ্রনাথ দন্ত-নকে মূর্ধন্য ণ-র আসনে বসাতে এত ব্যস্ত ছিলেন, তিনি যে কেন মূর্ধন্য-ষ-র জায়গায় বাঙালির নিজস্ব ও স্বাভাবিক তালব্য-শকে স্থাপনের বিষয়ে এত উদাসীন রইলেন তা ভেবে বিস্ময় লাগে। সুনীতি-কুমার প্রমুখ অন্যদেরও এ বিষয়ে মুখর হতে দেখি না। ফলে তদ্ভব শব্দের ধ্বনিসংগত বানানের নীতি সরকারিভাবে গ্রহণ করার পরেও দেখি সংস্কৃত শব্দের মূর্ধন্য-ষ প্রায় সর্বত্রই বহাল তবিয়তে থেকে গেছে। তার উদাহরণ—

সংস্কৃত	অর্ধতৎসম	তদ্ভব
উষা	উষ, ওষ, ওস (ওশ্ নয় কেন ?)	—
কষায়	কষা	—
কৃষ্ণ	কেষ্ট	
ঘর্ষণ	ঘষা	
চষ্	চাষা	
চুষ	চুষা, চোষা, চুষি	—
তৃষ্ণা	তেষ্টা	—
নিষুপ্তি	—	নিষুত (নিশুত ?)
পুষ্	পুষা, পোষা	—
পিষ	পেষা	—
পৌষ	পোষ, পোষড়া	—

বর্ষা, বর্ষণ	বরষা, বরষন	—
	বর্ষাতি, বর্ষান	
মনুষ্য	মিনসে মুনিস	মানুষ
মহিষ	—	মোষ, মইষাল
শীর্ষ	—	শিষ
ষষ্ঠি	—	ষাট, -ষট্টি
		ষেট
ষণ্ড	ষণ্ডা (মার্ক')	ষাঁড়
শোড়ষ	—	ষোল

এখানেও আমিষ থেকে জাত আঁইশ, আঁশ (-বটি) ইত্যাদি ব্যতিক্রম আছে, কিন্তু তা নিয়মকেই স্পষ্টতর করে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মে এই সংস্কার মেনে তো বলেই দেওয়া হয়েছে যে "মূল সংস্কৃত শব্দ অনুসারে তদ্‌ভব শব্দে শ ষ বা স হইবে।" কিন্তু কেন হবে, তার কোনো উত্তর তাঁরা তৈরি করেননি। মূর্ধন্য-ণ হতভাগ্য চটপট দন্ত্য-নকে জায়গা ছেড়ে দিতে বাধ্য হল, কিন্তু মূর্ধন্য-ষ সমগোত্রের হয়েও নিজের গোঁ বজায় রাখতে পারল, এতে বিচারকদের সম্বন্ধে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ আসতে পারে। তাই দেখি, দন্ত্য-স, যেখানে তার উচ্চারণ স্পষ্ট তালব-শ, সেও অর্ধতৎসম-তদ্ভব শব্দে তালব্য-শকে জায়গা ছেড়ে দিতে কোনো উদ্যম দেখাচ্ছে না। কয়েকটি উদাহরণ যথেষ্ট :

উপবাস	—	উপোস
কাংস্য	—	কাঁসা
গ্রাস	গরাস, গেরাস	—
দস্যু	দস্যি	—
নস্য	নস্যি	—
নিঃশ্বাস	নিশাস	—
নীরস	নিরেস	—
প্রসাদ	পেসাদ	—
পারসিক	পারসী, ফারসী	—
মাংস	—	মাস
শস্য	—	শাঁস
সরস	সরেস	—

ইত্যাদি

এর মধ্যে একটি মজার ব্যাপার লক্ষ করা যায়। মূল সংস্কৃতে তালব্য-শ ছিল বানানে, কিন্তু বাংলায় তদ্ভব চেহারায় দন্ত্য-স দিয়ে বানান লেখার

খুব প্রাচীন ঐতিহ্য দাঁড়িয়ে গেছে, এরকম দৃষ্টান্তও যে নেই তা নয়। যেমন আস্ এবং বস্ এই দুটি খুব চেনা ও বহুলব্যবহৃত ধাতু। ভাষাবিজ্ঞানী-দের মতে সংস্কৃত আবিশ্ থেকে হয়েছে আস্ এবং উপ-বিশ্ থেকে বস্। তা যদি হয়, তাহলে বিশ্ববিদ্যালয় বিশেষজ্ঞদের নির্দেশ মেনে 'আশা' 'বশা'-ই লেখা উচিত, কারণ মূল সংস্কৃতে শ-ই ছিল। উচ্চারণ-সংগতির দিক থেকেও আমরা মনে করি আশ্ বশ্ লেখা উচিত। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কার সমিতির বিশেষজ্ঞতা এদিকে মনোযোগ কেন দেয়নি আমরা জানি না।

এর আগে আমরা য-ফলার কথা বলেছি, কিন্তু যুক্তব্যঞ্জনের বিষয়টি আলাদা করে আলোচনা করা দরকার। আমরা লক্ষ করেছি যে ক্ষ কোথাও কোথাও তদ্ভব-অর্ধতৎসম দুরকম বানানেই রক্ষিত, যেমন ক্ষীরিকা থেকে ক্ষীরাই, কিন্তু কোথাও কোথাও খ-এর দ্বারা স্থানচ্যুত। যেমন ক্ষুধা থেকে খিদে, ক্ষিপ্ত থেকে খ্যাপা, ক্ষেত্র থেকে খেত, ক্ষুদ্র থেকে খুদ। অর্ধতৎসম-তে এই বিকল্পন সহজ হয়নি, ফলে সাক্ষি (=সাক্ষ্য), যক্ষি (যক্ষ), প্রাদে, চইক্ষ্ (চক্ষু) যেমন 'চইক্ষে হারায়'। জ্ঞ শব্দের গোড়ায় তত নেই, অর্ধ-তৎসম গেয়ান, গেঁয়াতি (জ্ঞেয়াতি-ও আছে), তবে শব্দের অন্যত্র কেন জানি না এখন টিঁকে থাকবার চেষ্টা করছে। 'জিগগেস' বানান কেউ কেউ লেখেন, তবু জিজ্ঞেস-ই জনপ্রিয় বেশি। জিগ্যেস লেখা কখনোই উচিত নয়। আর 'অভিজ্ঞি' এই অর্ধতৎসমরূপে স-র স্থানচ্যুতির কথা এখনও ভাবা যাচ্ছে না।

বাংলায় কোনো কোনো শব্দে ঙগ হবে না ঙ হবে—এই নিয়ে কেউ কেউ সংশয় বা বিতর্ক পোষণ করেন। যেমন বাঙগালী না বাঙালী, রাঙগা না রাঙা। এই সংশয়ের নিরসন ঘটবে যদি আমরা মেনে নিই যে, দু-টি দুই ঐতিহাসিক বা ভৌগোলিক উপভাষার শব্দ। দুয়ের উচ্চারণ আলাদা হয়ে গেছে,—প্রথমটি ঙ-র পরে গ্ উচ্চারিত, দ্বিতীয়টিতে শুধু 'ঙ' উচ্চারিত, ফলে দুই উচ্চারণকে দুটি ভিন্ন বানানেই লেখা দরকার। জঙগল লিখতে ঙগ অবশ্যই দিতে হবে, কিন্তু জংলা লিখতে তার প্রয়োজন নেই। তেমনি যে শব্দগুলিতে 'ঙগ' যুক্ত-ব্যঞ্জনের সরলীকরণের ফলে শুধু 'ঙ' বজায় রেখেছে, সেগুলির ক্ষেত্রে ঙ-ই লেখা উচিত, যেমন কাঙাল, কামরাঙা, (কিন্তু 'তেরঙগা' ঝান্ডা), গাঙুর, ঘ্যাঙর-ঘ্যাঙ্ ঘুঙুর, চাঙা, চাঙারি, চোঙা, জাঙাল (কিন্তু জঙিগ), ট্যাঙস-ট্যাঙস, ডাঙা, ডাঙ, ঢ্যাঙা, ঢঙ, (কিন্তু দঙগল, দাঙগা). ধাঙর (কিন্তু ধিঙিগ, পাঙগাশ, ফুঙিগ), বাঙাল, বাঙালি, ভাঙা, ভাঙন, রঙিন, লাঙল, লুঙি, ল্যাঙট, (কিন্তু সঙিগন) হাঙর (কিন্তু হাঙগামা), ইত্যাদি। এখানে উচ্চারণ মেনে ঙগ বা ঙ লেখাই ভালো। তবে আমাদের ধারণা এখন যে-সব অ-সংস্কৃত শব্দে ঙগ টিকে আছে ভবিষ্যতে সেগুলি থেকেও গ খসে

পড়বে, থাকবে একমাত্র ঙ। এই নিয়মে ইংরেজিতে 'ng'-যুক্ত ধ্বনিকে শুধুমাত্র 'ঙ'-তে পরিণত করেছে—singer, singing -এ যেমন, যদিও finger -এ ঙগ-ই আছে। বাংলাতেও এই নিয়ম, অর্থাৎ ঙগ-এর ঙ-পরিণাম—ক্রমশ ব্যাপক হচ্ছে। যাঁরা মমতাবশত, প্রাচীন বা প্রাদেশিক উচ্চারণের কথা মনে করে ঙগ রাখতে চান তাঁরা চমস্কি ও হালি-কথিত underlying structure-এর দোহাই দিতে পারেন।[১৯] কিন্তু তা সংগত হবে না, কারণ মনে রাখতে হবে চমস্কি ও হালি underlying structure-এর সূত্রটি এনেছেন ইংরেজি বানানের মধ্যে একটি প্যাটার্ন ও নীতি আবিষ্কার করে তার দীর্ঘ বিশৃঙ্খলার কলঙ্ক আংশিক মোচনের উদ্দেশ্যে, বানান সংস্কার প্রতিরোধের যুক্তি হিসাবে নয়।

উচ্চারণে যেখানে যুক্তব্যঞ্জন আছে সেখানে আমরা বানান এবং লেখার অভ্যাস, এমন কি মুদ্রণেও যুক্তব্যঞ্জন রাখার পক্ষপাতী, একথা অন্যত্র বলেছি; শুধু তা যেখানে অস্বচ্ছ, অর্থাৎ কোন্ কোন্ ব্যঞ্জন যুক্ত আছে তা ধরা যাচ্ছে না, সেখানে তাকে স্বচ্ছ করে দিতে হবে।[২০] সেজন্য লাইনো টাইপে ঙ্গ-কে ঙগ করা খুবই সংগত হয়েছে। ক্ষ নিয়ে যে অসুবিধা আছে তা লিপির প্রসঙ্গে আলোচ্য।

তবে কোনো ক্ষেত্রেই তদ্ভব শব্দে য-ফলা ব্যবহার করা উচিত নয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর অসমাপিকার রূপে কর্‍্যে, বল্যে এইসব বানান দেখা যেত, তা বর্জিত হওয়ায় ভালোই হয়েছে। বর্তমানেও কিছু কিছু বিদেশী শব্দে যুগ্ম ব্যঞ্জনের জায়গায় য-ফলা লেখার একটি প্রবণতা দেখা যায়, যেমন হিস্‌সা কে 'হিস্যা' লেখাতে. তা অবশ্যই পরিত্যাজ্য। আদালতের লিপি-করদের হাতে এ ধরনের য-ফলা ব-ফলা প্রচুর এসেছে যুগ্মব্যঞ্জনের জায়গায়। এর মূলে সাদৃশ্য বা 'অ্যানালজি'-র প্রভাব থাকে।

তদ্ভব শব্দের বানানে ধ্বনিসংবাদী বানান অবশ্যই লেখা উচিত। তাতে যদি য-কে জ এবং ষ-স-কে শ দিয়ে উৎখাত করতে হয় সেকথাও ভাবতে হবে। কিন্তু অর্ধতৎসম শব্দের সমস্যাটি একটু আলাদা, কারণ অর্ধতৎসম-র একটা নির্দিষ্ট রূপ নেই। কিছু অর্ধতৎসম স্বরধ্বনির অল্পবিস্তর পরিবর্তনে তৎসম-র কাছাকাছিই থেকে গেছে, বিশেষত স্বরসংগতি বা স্বরের উচ্চতা-সাম্য প্রাপ্ত যে-সব শব্দ—সেগুলির ক্ষেত্রে তৎসম শব্দের বানানের নৈকট্য বজায় রাখা উচিত বলে আমাদের ধারণা। এর আগে য-ফলা যুক্ত অর্ধ-তৎসম-র যে দীর্ঘ তালিকা দিয়েছি সেই শব্দগুলিকে মনে রেখে একথা বলছি। 'মিথ্যা'কে মিৎথে / মিথে করে এখনই কোনো সুরাহা হবে কি না সন্দেহ। কিন্তু তৃষ্ণা থেকে তিয়াশা না করার কোনো যুক্তি নেই, তিয়াস তিয়াসা পর্যন্ত এগোনো সম্ভব হয়েছে যখন।

তদ্ভবতেও অর্থের নৈকট্য রূপের নৈকট্যের পক্ষে একটা যুক্তি হতে পারে। যেমন 'ষণ্ড' আর ষাঁড় অর্থের সূত্রে পরস্পরের কাছাকাছি, ফলে মূর্ধন্য ষ থাকতেও পারে ষাঁড় বানানে। কিন্তু তাই বলে জাঁতা জাঁতির জ-কে য-তে নিয়ে যাবার কেনো অর্থ হয় না, কারণ যন্ত্র বা যন্ত্রিকা থেকে দুয়ের অর্থের আপাত দূরত্ব বেশ স্পষ্ট।

তবু কিছু সমস্যা থেকেই যায়। ক্ষণ শব্দে মূর্ধন্য-ণ তৎসম নিয়মে, কিন্তু এক্ষুনি, তক্ষুনি কক্ষনো-তে দন্ত্য-ন দিলে এই নিয়মের ব্যত্যয় ঘটবে না কি? এখানে তো অর্থ এবং রূপ দুইয়েরই নৈকট্য স্পষ্ট। তাহলে হয়তো লেখা যায় একখুনি, তক্‌খুনি, কক্‌খনো। শেষ বানানটি কোথাও কোথাও দেখেছি। এখানে প্রচলিত অভ্যাসই শেষ কথা বলবে।

সংস্কৃত শব্দের সঙ্গে বাংলা বিভক্তি-প্রত্যয় লাগালে, কিংবা বাংলা শব্দের সঙ্গে তার সমাস ঘটলে, এবং সম্ভবক্ষেত্রে স্বরসংগতির দ্বারা তার উচ্চারণের পরিবর্তন ঘটলে সংস্কৃত বা তৎসম শব্দের বানান অক্ষত রাখা চলবে কি না সেটা আরেকটা সমস্যা। এরকম কয়েকটি শব্দ :

ঊনত্রিশ/তিরিশ, ঊনচল্লিশ, ঊনপঞ্চাশ (ইত্যাদি) ; কূটকচাল, দূতিয়ালি, ধূতামি, ভূতুড়ে, ভূতপেরেত। আমাদের মতে বর্তমান প্রচলন রেখে দেওয়াই ভালো।

৫. বাংলা ক্রিয়াপদের বানান

খুব অল্প কয়েকটি নামধাতুকে (যেমন 'অংশানো', 'দর্শানো' ইত্যাদি) বাদ দিলে বাংলা ক্রিয়াপদগুলি, অর্থাৎ ক্রিয়াপদের ধাতু অংশটি, মূলত অর্ধতৎসম, তদ্ভব ও দেশী শব্দভাণ্ডারের অন্তর্গত। তার মধ্যে আবার তদ্ভব, অর্থাৎ সংস্কৃত (প্রাচীন ভারতীয় আর্য) থেকে প্রাকৃতের (মধ্য ভারতীয় আর্যের) মধ্য দিয়ে বিবর্তিত হয়ে বাংলায় আসা ধাতুর সংখ্যাই খুব বেশি। এগুলিতে বানানের সমস্যা একটু অন্য ধরনের. এইজন্য যে, এগুলিতে দীর্ঘ-ঈ দীর্ঘ-ঊ কার, ণত্ব-ষত্ব, যুক্তব্যঞ্জন, কিংবা বিসর্গ ইত্যাদির সমস্যা আদৌ বড় নয়, কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাংলা ধাতুতে প্রচলিত বানানে দীর্ঘ-ঈ বা ঊ-কার, যুক্তব্যঞ্জন, মূর্ধন্য-ণ, বিসর্গ ইত্যাদির ব্যবহারই নেই। ক্রিয়াপদ সমস্ত ভাষারই নিজস্ব, কেন্দ্রীয় অংশ। ফলে ক্রিয়াপদেই ভাষার নিজস্বতা সবচেয়ে বেশি করে ফুটে ওঠে।

সেদিক থেকে এই আশা করলে অসংগত হত না যে, তদ্ভব ও দেশী উৎসের বাংলা ধাতুগুলির বানানেই 'বাংলাত্ব' সবচেয়ে বেশি প্রকাশিত হয়েছে, অর্থাৎ সেগুলির বানানে নিশ্চয়ই উচ্চারণের ইশারা সবচেয়ে বেশি করে মানা হয়েছে।

এই উচ্চারণের ইশারাগুলি কী কী? তৎসম শব্দের উচ্চারণ প্রসঙ্গে আমরা তার কিছু উল্লেখ করেছি। এবার বাংলা ধ্বনিতত্ত্বের কিছু নতুন বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে আরেকবার সংক্ষেপে স্মরণ করা যেতে পারে যে,

১. 'অ' বর্ণটি স্থলবিশেষে 'ও' হয়ে যায়, সেখানে 'ও' বা 'ও'-কার আশা করা যেতে পারে ;

২. বাংলায় ফোনিম বা মৌলিক ধ্বনি হিসেবে দীর্ঘস্বর নেই, কাজেই দীর্ঘ ঈ / দীর্ঘ ঈ কার, দীর্ঘ-ঊ / দীর্ঘ-ঊ কার বাংলা তদ্ভব শব্দের বানানে প্রত্যাশিত নয় ;

৩. 'এ' বা একার (ে) কখনো কখনো 'অ্যা'-[১]রূপে উচ্চারিত হয় ;

৪. ঋ, ঋ-ফলার উচ্চারণ মূলত 'রি' ;

৫. ঐ, ঔ উচ্চারিত হয় 'ওই়', 'ওউ়' ;

৬. ঞ-র যথার্থ উচ্চারণ বাংলায় নেই ; ঞ্চ, ঞ্ছ, ঞ্জ ইত্যাদি যুক্ত ব্যঞ্জনে তার উচ্চারণ ন্-এর কাছাকাছি।

৭. বাংলায় মূর্ধন্য ণ-এর উচ্চারণ ন্-এর মতো, দন্তমূলীয়[২]।

৮. বাংলায় য্-এর উচ্চারণ জ্ ;

৯. একক ও আলাদা দন্ত্য-স ও মূর্ধন্য ষ-এর উচ্চারণ তালব্য শ-এর মতো ; কেবল যুক্তব্যঞ্জনে কোথাও কোথাও[৩] প্রথম দন্ত্য-স-এর উচ্চারণ ইংরেজি [s]-এর মতো দন্তমূলীয়[৪], আর ট্ ঠ্-এর আগে যুক্তভাবে ষ-এর উচ্চারণ মূর্ধন্য ;

১০. অনুস্বার আর ঙ্-তে বাংলায় কোনো তফাত নেই ; এবং

১১. বিসর্গ শব্দের মাঝখানে বসলে পরবর্তী ধ্বনির দ্বিত্ব বোঝায়। যেমন অতঃপর=অতোপ্পর, দুঃখ=দুক্খো, অধঃপাত= অধোপ্পাত। পদান্ত বিসর্গের উচ্চারণ লুপ্ত।

১২. যুক্তব্যঞ্জনে য-ফলা এবং ব-ফলা অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিজেরা লুপ্ত হয়ে সংলগ্ন ব্যঞ্জনটির দ্বিত্ব ঘটায়, যেমন সত্য=শোত্তো, বিশ্ব= বিশ্শো, পদ্ম=পদ্দোঁ। ব-ফলা ও ম-ফলার ক্ষেত্রে দুচারটি ব্যতিক্রম আছে এই নিয়মের—উদ্বোধন=উদ্বোধোন, উদ্বাহ= উদ্বাহো, উদ্বেগ=উদ্বেগ্ ; গুল্ম, বাল্মীকি, কাশ্মীর, স্মিত, উষ্মা, ('শিঁতো' 'উশ্শাঁ' ও শোনা যায় কলকাতার বনেদি উচ্চারণে)। আর ম-ফলার যেখানে লোপ হয়, সেখানে কোথাও কোথাও আগের বা পরের স্বরধ্বনিটি অনুনাসিক হয়ে ওঠে, যেমন আত্মা=আঁত্তা, গ্রীষ্ম=গ্রিশ্শোঁ।

১৩. ঋ-ফলা ও র-ফলা যুক্ত ব্যঞ্জন শব্দের গোড়ায় থাকলে দ্বিত্ব হয় না। কিন্তু র-ফলা যুক্ত ব্যঞ্জন যখন শব্দের অনাদ্য স্থানে (**non-initial position**-এ) থাকে তখন তার দ্বিত্ব ঘটে, তবে আধুনিক পরিশীলিত উচ্চারণে ঋ-ফলার ব্যঞ্জনের ঐ জায়গায় দ্বিত্ব হয় না। যেমন,

অকৃত=অক্রিতো, কিন্তু অক্রীত=অক্ক্রিতো

অপৃথক=অপ্রিথোক্, কিন্তু অপ্রিয়=অপ্প্রিয়ো।

সকৃতজ্ঞ=শক্রিতোগ্গোঁ, কিন্তু সক্রিয়=শক্ক্রিয়ো।

অভিনেতৃ=ওভিনেত্রী, অভিনেত্রী=ওভিনেৎত্রি

১৪. ক্ষ, জ্ঞ শব্দের গোড়ায় / শুরুতে যথাক্রমে খ ও গ, কিন্তু শব্দের মাঝখানে ক্খ ও গ্গঁ।

উচ্চারণের এইসব ইশারা মান্য করতে হলে বংলার নিজস্ব ক্রিয়াপদগুলির কোথাও, আর কিছু না হোক, দীর্ঘ ঈ, ঊ কার,

ঋ-ফলা, ণ্, য্, স্; ষ্, এবং কিছু যুক্তব্যঞ্জন বানানে ব্যবহার করা যাবে না।

বাংলা ক্রিয়াপদের বানানে আমরা এ লক্ষ করে আশ্বস্ত হই যে, সেখানে সাধারণ ভাবে দীর্ঘ স্বরের ব্যবহার বা, ঋ-ফলা, বা মূর্ধন্য-ণ নেই। যুক্ত-ব্যঞ্জনও তদ্ভব ক্রিয়ায় নেই বললেই হয়। তবু কোনো কোনো ক্ষেত্রে ক্রিয়ার ধাতু অংশে, অর্থাৎ বিভক্তি বাদ দিলে যেটুকু বাকি থাকে সেই অংশে, এমন কিছু বানান পাই যেখানে দেখি উচ্চারণের এই ইশারা মানা হয়নি। সেখানে এমন সব বর্ণের প্রয়োগ গৃহীত হয়ে আসছে বাংলা উচ্চারণের দিক থেকে যেগুলি সমর্থনযোগ্য নয়। অর্থাৎ সেগুলি থাকার ফলে উচ্চারণে হয়তো বিভ্রান্তি ঘটে না, কিন্তু দ্ব্যর্থকতা (ambiguity) ঘটে। একই উচ্চারণে দুরকম বানানের সম্ভাবনা তৈরি হয়। তা হওয়া উচিত নয়। তবু দেখি, উচ্চারণ যেখানে 'শ্' সেখানে বাংলা ধাতুতে বানানে কোথাও কোথাও 'স্' এবং 'ষ' ব্যবহার করা হয়েছে, উচ্চারণে যা 'জ' বানানে তা 'য' রূপ নিয়ে আছে। কোথায় কোথায় এমন ঘটছে বাংলা ধাতুতে তার একটা তালিকা করছি। তাহলে দেখতে পাব, তদ্ভব হোক, দেশী হোক, অভ্যস্ত ও গৃহীত বানানে উচ্চারণের ইশারা অগ্রাহ্য করে প্রচলনকেই রেখে দেওয়া হয়েছে।

ক. শব্দের গোড়ায় উচ্চারণ-ব্যবহিত [অর্থাৎ যার মূল উচ্চারণ থেকে বাংলা উচ্চারণ সরে এসেছে] বর্ণ :

যাচা, যাওয়া, যাঁতানো

[এই একটি বিশেষ ক্ষেত্রে হিন্দিভাষার রক্ষণশীলতা কম দেখি। সেখানে 'যাওয়া' ক্রিয়াটিতে বর্গীয় 'জ' ব্যবহার হচ্ছে 'জা-না', 'জায়েঙ্গে'।]

সটকানো, সঁপা, সওয়া, সরা, সরানো, সাজা, সাজানো, সাধা,
সাধানো, সামলানো, সাঁতরানো, সাঁৎলানো, সানানো, সোঁধানো,
সোঁকা, সোঁকানো, সোলকানো, সাঁটানো, সাপানো, সারা, সারানো,
সুধানো সুধোনো, সেঁকা, সেঁকানো, সেঁচা, সেঁচানো, সেঁধানো
জুরা, জ্বলা, জ্বালা, জ্বালানো, ক্ষওয়া, ক্ষরা, ক্ষেপানো,
ক্ষুরোনো।

খ. শব্দের অনাদ্য অংশে উচ্চারণ-ব্যবহিত বর্ণ :

অসানো, আসা, আওসানো উলসানো, ওসকানো, কসা, কসানো, খসা, খসানো, খোঁসড়ানো, ঘসা, ঘসানো, ঘসটানো, ঘসড়ানো, ঘেঁসা, ঘুসানো, ঘুসটানো, চষা, চসা, চোষা, চোপসানো, ঝলসানো ঠাসা, ঠাসানো, ঠেসা, ঠোসা, ঢোঁসানো, তাসানো, ধসা, ধসানো, পোষা, ফসকানো, ফাঁসা, ফাঁসানো, ফুসলানো, ফুঁসা, ফুঁসানো, বসা, বসানো, বিষানো, ভাসা, ভাসানো, ভেপসানো, মসটানো,

মোসড়ানো, রসা, রসানো, শাসানো, শিসনো, শোষা, হাসা, হাসানো[৫]।

উপরে আমরা ক্রিয়াগুলির ঠিক ধাতুগত চেহারা রাখিনি পড়তে অসুবিধে হবে বলে। ধাতুর ক্রিয়াবিশেষ্য (verbal noun) রূপ লিখেছি। কিন্তু আকারান্ত রূপের আ-কার এবং 'নো'-অন্ত্য রূপের 'নো' বাদ দিলেই ধাতুর একান্ত চেহারাটি বেরিয়ে আসবে।

ধাতুর এই লিস্টি থেকে যা বুঝতে পারছি তা হল, কোথাও কোথাও ব্যুৎপত্তির শাসন মেনে (তদ্ভব ধাতুগুলির ক্ষেত্রে), এবং দেশী ধাতুগুলির ক্ষেত্রে গৃহীত ও প্রচলিত রীতির অনুরোধে এমন সব বর্ণের ব্যবহার আছে যেগুলির বাংলা উচ্চারণ সেগুলির সংস্কৃত-বিহিত উচ্চারণ থেকে দূরবর্তী। বাংলা ভাষায় এগুলির উচ্চারণ প্রকাশের জন্য অন্য বর্ণ ব্যবহারই সংগত, কারণ সেগুলি উচ্চারণ-প্রক্রিয়ার অনুষঙ্গে আমাদের কাছে আরো স্বাভাবিক বলে গণ্য। আর তাতে লিপিবিজ্ঞানের 'ধ্বনিপিছু একবর্ণ' (one sound one symbol) নীতিও অমান্য করা হয় না। ফলে এই ধাতুগুলিতে

১. যেখানে 'য' বা 'জ্ব' আছে সেখানে আমরা 'জ' ব্যবহার করতে পারি ;
২. যেখানে 'স' বা 'ষ' আছে সেখানে আমরা তালব্য 'শ' ব্যবহার করতে পারি ;
৩. যেখানে 'ক্ষ' আছে সেখানে আমরা 'খ' ব্যবহার করতে পারি।

বাছবিচার না করে আনুপূর্বিক যদি তাই করি, তাহলে ধাতুর চেহারা-গুলি কী দাঁড়াবে দেখা যাক ;

জাওয়া, জাচা, জাঁতানো
শওয়া শটকানো, শঁপা, ইত্যাদি
অর্শানো, আশা, চশা, (চাষ করা) ভাশা শোশা ইত্যাদি

এখানে এইরকম ঢালাও পরিবর্তন করে সমস্ত ধাতুগুলির চেহারা বদলে দেওয়া নিশ্চয়ই সম্ভব। কিন্তু তার ফলে কিছু সমস্যা দাঁড়িয়ে যাবে। স্বীকার করা ভালো যে, সমস্যাগুলির সবগুলি সমান গুরুত্বপূর্ণ নয়। তবু সেগুলি সমস্যা, এবং সেগুলির ধরন সম্বন্ধে আমাদের স্পষ্ট ধারণা থাকা দরকার।

প্রথমত, ক্রিয়াপদ ছাড়া ভাষার অন্যান্য অংশে আমরা যদি একইভাবে বানান-সংস্কার না করি, তাহলে ব্যুৎপত্তির সঙ্গে তো তাদের চেহারার তফাত হবেই। সেই সঙ্গে ভাষায় প্রচলিত বিশেষ্য, বিশেষণ বা অন্যান্য পদ—যেগুলির সঙ্গে এসব ধাতু অর্থের সম্বন্ধে যুক্ত বলে আমরা এগুলির বানানে খানিকটা নৈকট্য প্রত্যাশা করি—এবং এই যুক্তিতেই 'চাষ' এবং 'চষা'-র

ব্যঞ্জনগত চেহারা এক রাখা হয়েছে—তাদের মধ্যে দূরত্ব তৈরি হবে। এই দূরত্বের সম্ভাব্য চেহারা এইরকম—

ধাতু	সম্পর্কিত অন্যান্য পদ
জাচা	যাচ্ঞা
জাওয়া	যাতায়াত, যাত্রা, যান
জাঁতানো	যন্ত্র
জরা, জালা	জ্বর, জ্বলন জ্বালা, প্রজ্বলিত, উজ্জ্বল
শটকানো	—
শঁপা	সমর্পণ
শওয়া	সহ্য
শরা-শরানো	অনুসরণ, সরণী
শাজা-শাজানো	সজ্জা, সজ্জিত
শাধা	সাধিত, সাধ্য
শামলানো	—
শাঁৎরানো	সন্তরণ
শাঁৎলানো	—
অর্শানো	—
আশা	—
কশা	কষায়
চশা	চাষ, চাষী
চোশা	চূষ্য, চোষ্য
পোশা	পোষা (কুকুর), পোষ্য
শাশানো	শাসন. শাসিত, শাসক
হাশা	হাসি, হাস্য, হাস

এখানে আবার সমস্ত ধাতুগুলির লিস্ট করার দরকার নেই, পাঠকেরা নিজেরাই বাকিগুলির ক্ষেত্রে সম্ভাব্য সুনির্দিষ্ট সমস্যাগুলি,—অর্থাৎ ঐ দূরত্বের ছকগুলি—অনুমান করে নিতে পারবেন। তাঁদের এটাও খেয়াল রাখতে হবে যে, তদ্ভব বাংলা বানান অনেক ক্ষেত্রে হিন্দিরই ধরনেই ঐ ব্যুৎপত্তির শাসন অগ্রাহ্য করেছে। ফলে 'যন্ত্র'-এর সঙ্গে যোগ থাকা সত্ত্বেও 'জাঁতি' এখন গৃহীত ও স্বীকৃত বানান। সম্ভবত ব্যুৎপত্তির ঐ যোগ এখানে তত স্পষ্ট নয় বলেই। তেমনই সংস্কৃত 'সুধ্-' ধাতু থেকে আসা বাংলা তদ্ভব ধাতু সুধোনো 'শুধোনো' বানানে চলছে—হিন্দিতে তারই

আত্মীয় রূপ (cognate) হল 'সুঝানা'। তেমনই 'ক্ষওয়া', 'ক্ষরা'-তে না হলেও 'ক্ষেপানো'-তে 'খ' এসে দিব্যি 'ক্ষ'-কে স্থানচ্যুত করেছে ; 'খেপানো' বা 'খ্যাপানো' দেখলে আমরা মোটেই বিচলিত হই না। বিশেষ্য / বিশেষণ 'খেপা-খ্যাপা' শব্দটিও বেশ চলে গেছে, যেমন চলেছে প্রত্যয় যোগে 'খ্যাপামি'। 'ক্ষিপ্ত' থেকে বানানের রূপগত দূরত্বে চলে এসেছে এই সব শব্দ—ব্যুৎপত্তির বন্ধনকে অস্বীকার করেই। তাতেই আমাদের সংগতির বোধ আর আহত হচ্ছে না।

ভাষার এই ইঙ্গিত ও প্রবণতাকে যদি আমরা নির্দেশ হিসেবে অনুবাদ করে নিই, তাহলে বাংলা ক্রিয়ার সমস্ত ধাতুর বানানকেই উচ্চারণ-বর্ণের এক এক-প্রতিসম্পর্ক (one-one-correspondence) মেনে উপরের বাঁদিককার কলমের মতো আকৃতিতে লেখা যায়। অর্থাৎ 'য' 'জ'-কে 'জ' দিয়ে, 'স' ও 'ষ'-কে 'শ' দিয়ে এবং 'ক্ষ'-কে 'খ' দিয়ে স্থানচ্যুত করা যায়। এবং বলা যায় যে, এই বানানই হবে অনড় ও অবিকল্প। কারণ বিকল্প বিধানেই বিভ্রান্তির জন্ম হয় তা আমরা অভিজ্ঞতায় দেখেছি। এও সত্য কথা যে, তদ্ভব শব্দের বানানের, সমগ্র ভাবে অতৎসম শব্দের বানানের বড়ো সমস্যা হল একাধিক বিকল্পের বা multiple choice-এর সমস্যা। তৎসম শব্দের বেলায় যেমন অধিকাংশ ক্ষেত্রে একটিই শুদ্ধ রূপ (কুটির-কুটীর জাতীয় কিছু ব্যতিক্রম বাদ দিলে) এবং তা থেকে বিচ্যুতি ঘটালেই বানান-ভুল ঘটবে—অতৎসম শব্দের বানানে ঠিক তা খাটছে না। সেখানে অনেক স্থলে একই শব্দের একাধিক বানান প্রচলিত—তার প্রত্যেকটিই সমান 'শুদ্ধ' বলা চলে। এক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট বিকল্পহীন বানানকে বেছে নেওয়া অরাজকতাবিরোধী প্রথম পদক্ষেপ। তাতে শিশুর শিক্ষার সুবিধা হয়, পাঠকের বিভ্রান্তি কমে। আর এই নির্বাচিত বানানটি যদি লেখক ও মুদ্রকের দিক থেকেও সবচেয়ে সুবিধাজনক হয়—অর্থাৎ তাতে প্রয়োজনের অতিরিক্ত (redundant) চিহ্ন, যেমন ঊর্ধ্বকমা, প্রথম পুরুষ সাধারণ অতীত বা উত্তম পুরুষ ভবিষ্যৎ বিভক্তির শেষে ও-কার ইত্যাদি পরিহার করা সম্ভব হয় তাহলে তো কথাই নেই।

কিন্তু এতদূর এগিয়ে যাওয়াতে অনেকের আপত্তি হতে পারে, অনেকেই ব্যুৎপত্তির সম্বন্ধটিকে সবক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অস্বীকার করতে রাজি হবেন না—এমন হতে পারে। সেক্ষেত্রে আমরা একটা জিনিস ভেবে দেখতে বলি। এমন দেখা গেছে যে তদ্ভব ও পাশাপাশি প্রচলিত তৎসম শব্দ ব্যুৎপত্তির দিক থেকে সম্বন্ধিত হওয়া সত্ত্বেও অনেক সময় বক্তার মনে ওই সম্বন্ধটি অস্পষ্ট হয়ে এসেছে। যেমন 'জাঁতা', 'জাঁতি' ও 'যন্ত্র'-এর ক্ষেত্রে। ব্যুৎপত্তি-সম্বন্ধের এই অস্পষ্টতা বা ব্যুৎপত্তিগত দূরত্বের এই প্রস্তাবিত ধারণাটি

অবশ্য ব্যক্তিগত অনুভবনির্ভর। কাজেই এ নিয়ে মতভেদ হতেই পারে। কিন্তু এটা তো আমরা লক্ষ করি যে, 'সরা' আর 'অনুসরণ', 'সরণী (সংস্কৃত 'সৃ' ধাতু জাত)-র ব্যুৎপত্তি-বন্ধন আমাদের কাছে যতটা স্পষ্ট, তার চেয়ে অনেক বেশি স্পষ্ট 'শাসানো' আর 'শাসন', 'শাসিত' 'শাসক'-এর ব্যুৎপত্তি-বন্ধন। সেক্ষেত্রে এইরকম একটি যুক্তি কি আমরা উপস্থিত করতে পারি না যে, যেখানে ঐ ব্যুৎপত্তি-বন্ধন অপেক্ষাকৃত অস্পষ্ট, সেখানে বানানে উচ্চারণের অনুরোধ মেনে সংস্কার করাই উচিত। যেমন এই লেখকের ব্যক্তিগত মত হল, 'সাজা-সাজানো', 'জ্বরা', 'জ্বলা-জ্বালা-জ্বালানো', 'ক্ষরা' 'পোষা', 'বিষানো', 'শাসানো', 'হাসা-হাসানো' ছাড়া আর প্রায় সমস্ত ক্রিয়ার ধাতুকেই বানান-সংস্কারের আওতায় নিয়ে আসা চলে।

আর যে-সমস্ত ধাতু দেশী উদ্ভবের, অর্থাৎ যাদের কোনো তৎসম শব্দের সঙ্গে ব্যুৎপত্তি-সম্বন্ধ নেই, তাদের ক্ষেত্রে উচ্চারণ-বোধক বানানে কোনো আপত্তি ওঠা উচিত নয়। 'সটকানো' কে 'শটকানো' 'সামলানো'-কে শামলানো, 'ঢেঁসানো'-কে 'ঢেঁশানো' করার বিপক্ষে কোনো প্রবল ভাষাতাত্ত্বিক যুক্তি থাকতে পারে না।

দুর্বল একটি-দুটি যুক্তি থাকতে পারে, সেটা তদ্ভব ও দেশী উভয় ধাতুর ক্ষেত্রে। যদি দেখা যায় যে নতুন বানান গ্রহণের ফলে homograph বা সমরূপী শব্দ তৈরি হচ্ছে—দুটি পৃথক শব্দ উচ্চারণ ও বানানে অভিন্ন হয়ে যাওয়ার ফলে বিভ্রমের জন্ম দিচ্ছে, তখন একটু পুনর্বিবেচনার দরকার হবে। যেমন 'আসা' ক্রিয়াপদটি। এটিকে যদি এখন 'আশা' বানানে লিখি, তাহলে সম্ভাব্য ৪৬টি[৬] বিভক্তিযুক্ত পূর্ণ রূপের মধ্যে মোট এই চারটির সমরূপ অন্য শব্দ বাংলায় পাওয়া যায়।

নিত্য বর্তমান	আশি (I come)	আশি (৮০)
"	আশ (তুমি—)	আশ ('আশা'-র খণ্ডিত রূপ)
"	আশে (সে—)	আশে (='আশায়')
ক্রিয়াবিশেষ্য	আশা (তার—)	আশা (hope)

অর্থাৎ এই শব্দগুলি যতক্ষণ উচ্চারণে এক (সমোচ্চারিত শব্দ বা homonym) ছিল ততক্ষণ সমস্যা ছিল না, কারণ পৃথক বানান তাদের পৃথক সত্তা চিনিয়ে দিত। কিন্তু বানান সংস্কারের ফলে এখন সমরূপী শব্দ বা homograph-ও হয়ে পড়ায় তাদের রূপগত বিভিন্নতা লুপ্ত হল এবং অর্থবোধে সংশয়ের সম্ভাবনা বাড়ল—এমন কথা অবশ্যই বলা যেতে পারে।

কিন্তু আগেই আমরা দেখেছি যে, সমোচ্চারিত ও সমরূপী শব্দের অর্থবোধে সংশয় নিরাকরণের নানারকম উপায় ও প্রতিবিধান ভাষা নিজেই

তৈরি করে। তার একটি হল প্রতিবেশ বা context। ভাষায় কদাচিৎ কোনো শব্দ এককভাবে, অন্য শব্দের থেকে বিচ্ছিন্নভাবে, উচ্চারিত হয়। হয়তো কোনো বাক্যের অন্তর্গত হয়ে ব্যবহৃত হয়, যেমন "আমি এখন 'আশি' তাহলে", না হয় তা একাই একটি বাক্যের বিকল্প হয়ে দাঁড়ায়—এবং টানা কথোপকথনে পূর্ববর্তী বা / এবং পরবর্তী 'বাক্যের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করে তার ব্যবহার হয়, যেমন "তার বয়স কত ?" "আশি।" "এত হবে কি ?" ইত্যাদি।

আমরা জানি শুধুমাত্র ভাষাগত প্রতিবেশ থেকেই আমরা শব্দটির অভিপ্রেত অর্থটি ধরে নিতে পারি, সমরূপী অন্য শব্দের সঙ্গে তাকে গুলিয়ে ফেলি না। "আমি এখন 'আশি' তাহলে"—তে 'আশি'-কে যদি বছরের সংখ্যায় বয়স মনে করার কোনো দূরবর্তী সম্ভাবনাও থাকে—আগে-পিছনের আরো দু-একটি বাক্য দেখলেই তা আরো দূরে সরে যাবার কথা। আর মৌখিক ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে এ তো কোনো সমস্যাই নয়। সেখানে বক্তার আচরণ ভাষার অনুষঙ্গী, ফলে ভাষার অর্থ সেখানে আরো স্পষ্ট। একটি ভাষা তার মোট শব্দভাণ্ডারের মোট কতগুলি শব্দের মধ্যে এই উচ্চারণ ও বানানগত সমরূপিতা স্বীকার ও সহ্য করতে পারে তার কোনো শতকরা বা অনুপাতের হিসাব আমাদের চোখে পড়েনি। তবে তার অভাব সত্ত্বেও এটুকু হয়তো বিনা দ্বিধায় বলা যায় যে, বাংলাভাষায় homographic homonym বা সমরূপী সমধ্বন্যাত্মক শব্দ এমন কিছু বেশি নয় যে, এ বিষয়ে উদ্বিগ্ন হতে হবে। নতুন বানানে ক্রিয়াপদগুলিকে লিখলেও তার সংখ্যা মাত্রার বাইরে যাবে বলে মনে হয় না।

বাংলা ক্রিয়াপদের ধাতু-অংশের ক্ষেত্রে নতুন বানান গ্রহণের সম্ভাব্য ক্ষেত্রগুলিকে নির্দেশ করার চেষ্টা করেছি। এখানে কিছু অর্ধতৎসম ধাতুর কথাও উঠে পড়বে—সেগুলির বানান কী হবে ? এখানে বক্তব্য হল, অর্ধ-তৎসম অন্তত বোধের দিক থেকে তৎসমর বেশি কাছাকাছি, ফলে তার ব্যুৎপত্তিসূচক বানান রেখে দেওয়া যেতে পারে। আমরা আগেই বলেছি, বানানের ক্ষেত্রে একটা ঢালাও নীতি বা "একটি যথাযথ মানদণ্ড" তৈরি করা গেলে চমৎকার হত, কিন্তু বাংলা শব্দভাণ্ডারের গঠন, বাংলা ভাষার ঐতিহাসিক বিবর্তন এবং বাংলা লিখিত ভাষা ও লিপিরূপের বৈশিষ্ট্যের জন্য একমাত্র ও সর্বাঙ্গীণ নীতি তৈরি করা সম্ভব বলে মনে করি না। যা সম্ভব, তা হল কয়েকটি যথাসাধ্য ব্যাপক (general) নীতি নির্মাণ, একসঙ্গে বেশ কিছু শব্দের বানান যে-সব নীতির দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করা যাবে। তারও একটা নির্দিষ্ট ছক ও পরিকল্পনা দাঁড়িয়ে যাবে। এটুকু করা গেলেও অগ্রগতি কম হবে বলে মনে হয় না।

২. বাংলা ধাতুর স্বরপরিবর্তন ও বানানে তার প্রতিফলন

চলিত শিষ্ট বাংলার পূর্ণাঙ্গ সমাপিকা ক্রিয়ারূপের বিশ্লিষ্ট চেহারাটি দৃষ্টান্ত স্বরূপ এইরকম :

সাধিত ধাতু		বিভক্তি		
সিদ্ধ ধাতু	(সাধিত বিভক্তি)	(প্রকার বিভক্তি)	(কাল-বিভক্তি)	পুরুষ বিভক্তি
কর্-	-ই-	-এছ্-	-ইল্-	-আম

অর্থাৎ চূড়ান্ত সম্প্রসারিত ক্ষেত্রে বাংলা সমাপিকা ক্রিয়ার পূর্ণ রূপে ধাতুর সঙ্গে সব মিলিয়ে চারটি বিভক্তি পর-পর যুক্ত হয়—উপরের ক্রম মেনে। সমস্ত রূপে সব কটা বিভক্তি যোগ হওয়া আবশ্যিক (obligatory) নয়। যে-বিভক্তিগুলিকে সব সময় উপস্থিত দেখা যায় না সেগুলিকে উপরের সরণীতে প্রথম বন্ধনী [(   )]-এর মধ্যে নির্দেশ করা হয়েছে। এটা লক্ষ করতে হবে যে বাংলার পাঁচটি পুরুষ[৭]। ধাতুর ঐ প্রথম তিনটি বিভক্তির রূপ অব্যতিক্রমী বা constant—সেগুলির কোনো পরিবর্তন নেই। কিন্তু চতুর্থ বা শেষ বিভক্তিটি (ending) শুধু যে সর্বদা উপস্থিত তা নয়—পাঁচটি পুরুষে সাধারণভাবে তার পাঁচটি ভিন্ন ভিন্ন পরিবর্তমান (variable) রূপ। যেমন বর্তমানে -ই/-ও/-ইস্/-এ/-এন : বল্-ই, বল্-ও, বল্-ইস, বল্-এ, বল্-এন।

আর ক্রিয়াবিশেষ্য (Verbal Noun)-সহ বাংলা অসমাপিকা ক্রিয়াপদের চারটি রূপ, অর্থাৎ চার রকমের বিভক্তি যোগ হয় তাতে। ক্রিয়াবিশেষ্যে '-আ', ও '-আনো', পূর্বক্রিয়াতে (Past Active Participle-এ) 'এ' নিমিত্তার্থকে-'তে' এবং সাপেক্ষ সংযোজক (Conditional Conjunctive)-এ 'লে'। যেমন, করা, করে, করতে, করলে ; বা দেখানো, দেখিয়ে, দেখাতে, দেখালে।

ক. ধাতুতে ঊর্ধ্ব-কমার প্রয়োগ

বাংলা ক্রিয়াপদের ধাতুর সঙ্গে বিভক্তিযোগের একটা বৈশিষ্ট্য আছে। এখানে উপর থেকে সংগঠনটা ধাতু + বিভক্তি + বিভক্তি + বিভক্তি বা $x+y+z+a$ গোছের বটে, কিন্তু আসলে বিষয়টা ঠিক এই পরপর উপাদান জুড়ে দেওয়ার চেয়ে একটু জটিল। এখানে উপর থেকে লক্ষ করি, ধাতুর সঙ্গে কোনো

কোনো বিভক্তি যোগ হলে ধাতুর চেহারাও একটু পালটে যাচ্ছে। অর্থাৎ উচ্চারণ বদলে যাচ্ছে তার। যেমন, 'করে' এই রূপে ধাতু হল 'কর্'-আর বিভক্তি-'এ'; কিন্তু 'করল' এই রূপে ধাতু উচ্চারণে হয়ে গেছে 'কোর্'। বাংলা ক্রিয়াপদে অধিকাংশ জায়গায় ধাতুর দুটো ধ্বনিগত চেহারা দাঁড়ায়। তা কেমন করে ঘটে জানতে হলে ভাষার ইতিহাসকে একটু টেনে আনতে হয়। ধাতুর এই পরিবর্তনের মধ্যে বাংলা ভাষার শব্দগুলির ঐতিহাসিক রূপান্তরের একটু সন্ধান নিতে হবে। আমরা ধরে নিচ্ছি এমন একটা সময় ছিল যখন ধাতুর এই ধরনের একাধিক রূপ খাড়া হয়নি। যে-সব ধাতুর মধ্যে অ-ধ্বনি আছে, সেগুলির সঙ্গে ই বা উ ধ্বনিবিশিষ্ট কোনো বিভক্তির যোগ হলেই স্বরসংগতির নিয়মে 'অ' 'ও' হয়ে যেত। ফলে 'কর্'-এর সঙ্গে অতীতের -ইল্, ঘটমানের-ইছ্ বা ভবিষ্যতের -ইব্ যুক্ত হলেই কর্ হয়ে দাঁড়াত কোর্, এবং তার পরে অন্যান্য বিভক্তিগুলিকে যোগ করা হত।

তাহলে অতীতবাচক -ইল্ -ইত্ বা ভবিষ্যৎবাচক -ইব্, কিংবা ই আছে এমন যে-কোনো বিভক্তির যোগ হলেই অ-ওয়ালা ধাতুর মধ্যে এইরকম পরিবর্তন হত:

ধাতু	অপরিবর্তিত	পরিবর্তিত
বল্	বল্-এ	বোল্-ছি, বোল্-ইস্, বোল্-ইল, বোল্-ইব বোল্-ইত

কালক্রমে অপিনিহিতির ফলে যে-সব ক্রিয়ার রূপ স্বরধ্বনিতে শেষ হয়েছে, সেগুলিতে ঐ 'ই' ধ্বনির [ছি chi, ইল-il, ইত্-it, ইব্-ib] একটি যমজ ভাই আগের ব্যঞ্জনের, বা আগের ব্যঞ্জনের সংখ্যা দুটি হলে, ব্যঞ্জনদুটির সামনে এসে বসে। কখনো 'ই' নিজেই ডিঙিয়ে চলে আসে, পুরানো জায়গা সম্পূর্ণ ছেড়ে দিয়ে। ফলে

বোল্ছি	হয়	বোইল্ছি	[boilchi]
বোলিল	হয়	বোইল্লো	[boillo]
বোলিত	হয়	বোইল্তো	[boilto]
বোলিব	হয়	বোইল্বো	[boilbo]

এখানে বোলছি-র ক্ষেত্রে প্রথম প্রক্রিয়া ঘটছে, অর্থাৎ একটা যমজ 'ই' পাচ্ছি আগে, আর বাকিগুলির ক্ষেত্রে দ্বিতীয় প্রক্রিয়াটি ঘটছে—পুরনো 'ই'-ই টপকে সামনের দিকে চলে এসেছে।

কালক্রমে এই 'ই' খসে গেল শিষ্ট বাংলা ভাষার ঐ সব শব্দের শরীর

থেকে। সেই সঙ্গে খসে গেল ঐ সব জায়গার আরো একটা 'ই' যে মোটেই অপিনিহিত 'ই' ছিল না। সে যথাস্থানেই ছিল, কিন্তু আগের ই-র সঙ্গে অবস্থানগত সাদৃশ্যের দরুন তারও উপরে কালের খাঁড়া পড়ল। এই 'ই' ছিল 'হইল' [হোইলো], 'আইল' ['আইলো], 'সইল' [সোইলো] ইত্যাদি ক্রিয়ার রূপে। এই সমস্ত ক্ষেত্রেই ঐ যে 'ই' খসে গেল—তার খসে যাওয়ার স্মৃতিরক্ষার জন্য ঊর্ধ্বকমা দেওয়ার প্রচলন হল এক সময়। ফলে বানানে ক্রিয়াপদগুলির রূপ দাঁড়াল ব'লছি, ব'লল, ব'লত, ব'লব, হ'ল, হ'ত, র'ল ইত্যাদি। ঊর্ধ্বকমা ব্যবহারের দুরকম অর্থ দাঁড়িয়ে গেল—প্রথমত ঊর্ধ্বকমা লুপ্ত ই-এর স্মৃতি বহন করছে, দ্বিতীয়ত তা জানিয়ে দিচ্ছে যে আগের ব্যঞ্জনটি খানিকটা ও-কারান্ত—যদিও বানানে ও-কার ঠিক দেওয়া নেই। ঊর্ধ্বকমা তুলে দিলে বিদেশীদের বা যারা বাংলা শিষ্ট চলিত উচ্চারণ জানে না—অর্থাৎ উপভাষাভাষী বাঙালিদের ঠিক ঠিক উচ্চারণে অসুবিধা হতে পারে—এতদিন এই রকম যুক্তি দেওয়া হয়েছে।

আমরা জানি যে, কেবল 'হল' 'হলে' ও 'হত'-র ক্ষেত্রে উচ্চারণ ও অর্থ বিভ্রাটের সম্ভাবনা সামান্য আছে। কারণ 'হল' (hall) এবং 'হত' এই দুটি বিশেষ্য ও বিশেষণ শব্দ বাংলায় থেকে সমরূপতা সৃষ্টি করছে। 'বলে' [বলিয়া] এই রকম আরেকটি দ্ব্যর্থক ক্রিয়ারূপ। কিন্তু বাক্যের অবস্থান-প্রতিবেশ থেকে কি এই বিভ্রান্তির অপনোদন সম্ভব নয়? আমাদের ধারণা সম্ভব, কাজেই ক্রিয়াপদের ধাতু অংশে বা কোনো অংশেই ঊর্ধ্বকমার ব্যবহার আমরা সমর্থন করি না।

ঊর্ধ্বকমা বিষয়ক আলোচনাতেই আমরা লক্ষ করেছি, স্বরসংগতির তাগিদে ধাতুর অন্তর্গত যে স্বরধ্বনিটি থাকে তার পরিবর্তন ঘটে। সোজা কথায়, ধাতুর সঙ্গে ঠিক পরেই যে-বিভক্তি এসে জুড়ছে, তার মধ্যে-'ই' [i] বা -'উ' ধ্বনির যে-কোনো একটি থাকলে ধাতুর স্বরধ্বনিটি বদলে যাচ্ছে। এতে

অ্যা	হচ্ছে	'এ'	:	দেখে	কিন্তু	দেখছি	দেখুক,
অ	,,	ও	:	বলেন	,,	বোলছি	বোলুন,
এ	,,	ই	:	কেনে	,,	কিনলি	
ও	,,	উ	:	শোনে	,,	শুনছি	
আ	,,	এ	:	ডাকে	,,	ডেকে (=ডাকিয়া)	

শেষ তিনটি পরিবর্তন বানানেই ধরা পড়ছে, কাজেই সেগুলি নিয়ে কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু সবচেয়ে ব্যাপকভাবে প্রচলিত বানানে অ-এর 'ও' হওয়া আর অ্যা-এর 'এ' হওয়া ঠিক ধরা পড়ে না। তার কারণ এই যে ব্যঞ্জনপরবর্তী অ নিহিত স্বর (inherent vowel) হিসাবে বাংলায় লেখার

রেওয়াজ নেই, আমরা 'কঅলঅম' লিখি না। ফলে তার পরিবর্তন ধরারও কোনো স্পষ্ট প্রথা তৈরি হয়নি। আর 'অ্যা' অধিকাংশ ক্ষেত্রে 'এ' বা এ-কার দিয়েই লেখা হয়। ফলে আমরা ধরেই নিয়েছি এ/ে-র দুরকম উচ্চারণ আছে 'এ' ও 'অ্যা'। এতদিন যখন এ/ে দুরকমের ডিউটি করে এসেছে (ইংরাজি c বা g-এর মতো অনেকটা)—এখনই বা তারা পারবে না কেন? ফলে 'খেলা'-তে এ-কারের উচ্চারণ 'অ্যা', কিন্তু 'খেলি'-তে তার উচ্চারণ [এ], —এ আমাদের তেমন অস্বাভাবিক লাগে না।

যাঁরা বর্ণমালার বর্ণ ও উচ্চারণের ধ্বনির এক-এক প্রতিসম্বন্ধে (one-one correspondence-এ) বিশ্বাসী, যাঁরা বলেন ধ্বনিপিছু একটি করে অক্ষর চাই, অর্থাৎ প্রত্যেকটি ধ্বনির আলাদা আলাদা চিহ্ন চাই—তাঁরা এই জন্যই 'অ' ও 'এ'-র এই দ্ব্যর্থকতা [অ = অ/ও], [এ = এ/অ্যা] বর্জন করতে চান, বলেন যে ধাতুগুলির স্বরধ্বনির পরিবর্তন হলে বানানেও তা লিখে পরিষ্কার দেখিয়ে দিতে হবে। ফলে 'অ' ও 'অ্যা' যুক্ত ধাতুর দুটি চেহারা ধাতুরূপে এই রকম দাঁড়াবে :

	বল্‌-ও	কিন্তু	বোল্‌-ইস	
	বল্‌-এ		বোল্‌-ছি	
	বল্‌-এন		বোল্‌-ল	
			বোল্‌-উন	
এবং	দ্যাখ্‌-ও[৮]	কিন্তু	দেখ্‌-ইস	
			দেখ্‌-ছি	
	দ্যাখ্‌-এ		দেখ্‌-উন	
	দ্যাখ্‌-এন		দেখ্‌-উক	ইত্যাদি

এ পক্ষের একটা বড়ো যুক্তি এই যে, বাংলার অধিকাংশ ধাতুর এই দুটি রূপই বানানে আছে। যেমন শোন্‌-শুন্‌, শেখ্‌-শিখ, হাস্‌-হেস্‌ ইত্যাদি। কোনো কোনো ব্যতিক্রমী ধাতুর দুয়ের বেশি রূপও আছে, যেমন 'দেওয়া-নেওয়া'র ক্ষেত্রে দা-(দাও), দ্যা-দে-(দেবে) দি-(দিন), না-নে্, নি্। বলা বাহুল্য, এখানেও 'দে' 'নে' আসলে উচ্চারণগতভাবে কখনো দে- (দেবে,নেবে), কখনো 'দ্যা-ন্যা' (দেয়-নেয়)। অনেকেরই হয়তো মনে আছে যে, লেখকদের মধ্যে শুভো ঠাকুর তাঁর উপন্যাসে বা সম্পাদিত 'সুন্দরম্' পত্রিকায় অ ও অ্যা যুক্ত ধাতুর হাই স্টেমের বানান লিখতে ওকার ও অ্যা-কার (্যা) ব্যবহার করতেন।

শৃঙ্খলার যুক্তিতে এই প্রস্তাবে সায় দিতে লোভ হয়। আপত্তি হতে পারে এই যুক্তিতে যে, অনেক ক্ষেত্রেই বানানে নতুন লাগানো চিহ্ন redundant বা অনাবশ্যক। বাঙালি যেখানে 'ও' এবং 'অ্যা' থাকছে সেখানে ঠিকই

উচ্চারণ করবে। বিদেশীরা দু-একবার ঠেকে যেতে পারে—কিন্তু বিদেশীদের দরকারের কথা ভেবে তো ভাষার বানানরীতি আমরা তৈরি করব না। দ্বিতীয়ত, বানান বদলে দিলে ধাতুর মৌলিক (underlying) রূপটি হয়তো আচ্ছন্ন হয়ে যাবে, তখন বোল, কোর-ই ব্যুৎপত্তিগত ভাবে প্রাথমিক ধাতু বলে গৃহীত হবে। তৃতীয়ত, লেখার মুদ্রণের সময় ও শ্রম বাড়বে, কারণ ব্যঞ্জনান্তিক 'অ' লিখতে না হওয়াতে আমরা খানিকটা সুবিধা পেয়ে আসছি। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে ধাতুর এই দ্বিবিধ রূপ দুরকম বানানে লিখলে অসুবিধার চেয়ে সুবিধার পাল্লাই ভারি হবে। বানানে সংগতি আসবে, তাতে ভাষার ধ্বনিতত্ত্বও খানিকটা ধরা পড়বে। ফলে স্বরসংগতির প্রভাবে ধাতুর পরিবর্তিত রূপের বানান পরিবর্তন [ও-কার এবং অ্যা-কার (=্যা) দিয়ে] মেনে নিতে আমাদের আপত্তি নেই। ঊর্ধ্বকমা মাঝখানে থাকছে না শেষে থাকছে, সেটাও প্রশ্ন নয়। ঊর্ধ্বকমার প্রয়োগই আমাদের কাছে অপ্রয়োজনীয় বলে মনে হয়।

বাংলা ক্রিয়াপদ বিষয়ে বিদেশী গবেষকরা[৯] প্রতিটি ধাতুর root বা base-এর) দুটি করে রূপ (stem) কল্পনা করেন—High stem এবং Low stem। 'হাই' ও 'লো' কথা দুটি স্বরধ্বনির আপেক্ষিক উচ্চতাকে নির্দেশ করছে। যে রূপে স্বরধ্বনিটি তুলনায় নিচু, সেটি লো স্টেম—যেমন কর্; আর যে রূপে ঐ স্বরধ্বনিটিই স্বরসংগতির টানে একটু উঠে যায় সেটি হাই স্টেম, যেমন কোর্-। ধাতুর উচ্চারণ-অনুসারে বানান নির্ধারণ করতে হলে তাহলে এই ধরনের কিছু বানান তৈরি হবে :

লো স্টেম	হাই স্টেম
বলেন	বোলছি
	বোলেছি
	বোলল
	বোলছিল
	বোলেছিল
	বোলত
	বোলব ইত্যাদি
দ্যাখো	দেখছে
	দেখেছে ইত্যাদি

এতে ক্ষতি সামান্যই। লাভের মধ্যে এই যে, প্রায় সমস্ত নিয়মিত ক্রিয়া-

পদ এই দুই স্টেমের দু-রকম বানানের প্যাটার্নের মধ্যে এসে যায়। তার ফলে অন্য ধরনের একটা সামঞ্জস্য তৈরি হয়। আগেই এ প্যাটার্ন আংশিক-ভাবে বাংলা বানানে গৃহীত হয়েছিল সেটা আমরা লক্ষ করেছি। সেখানে 'ও'-ওয়ালা ধাতুর হাই স্টেম হত উ দিয়ে, যেমন শো-(শোয়), কিন্তু শু-(শুই);

'এ'-ওয়ালা ধাতুর হাই স্টেম হত ই দিয়ে, যেমন শেখ্-(শেখে), কিন্তু শিখ্ (শিখছে);

স্বরসংগতি-জাত পরিবর্তনকে অ্যা এবং অ-র ক্ষেত্রেও মেনে নিয়ে বানান সংস্কারের ফলে তার সঙ্গে এও দাঁড়াবে যে,

'অ-ওয়ালা ধাতুর হাই স্টেম হচ্ছে 'ও'-কার দিয়ে,

যেমন, কর্ (করেন), কিন্তু কোর্ (কোরছেন);

লক্ষ করতে হবে 'হোক' বানানে এই নীতি এর মধ্যেই অনেকটা স্বীকৃতি পেয়েছে।

'অ্যা'-ওয়ালা ধাতুর হাই স্টেম হচ্ছে এ-কার দিয়ে, যেমন খ্যাল্ (খ্যালে), কিন্তু খেল্ (খেলবে)।

বাংলা বানানের বর্তমান অবস্থায় নিয়মের এই ক্ষেত্রবিস্তার নিঃসন্দেহে একটা এগিয়ে যাওয়ার পদক্ষেপ।

৪. হসন্ত ব্যবহার

বাংলা ক্রিয়াপদের ধাতুর অংশে কখনো-কখনো হসন্তের ব্যবহার চোখে পড়ে। বাংলা নাটকে এক সময় এটার খুবই প্রচলন ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের গৃহীত সংস্কারে সংগতভাবেই দু ধরনের হসন্ত ব্যবহারের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছিল। প্রথমত, ধাতুতে হসন্ত ব্যবহারের একটি ক্ষেত্র হল বর্তমান অনুজ্ঞার তুচ্ছার্থক মধ্যম পুরুষের রূপ, যা সাধারণভাবে মূল ধাতুর উচ্চারিত রূপটির সঙ্গে অভিন্ন, যেমন কর্, বল্, শোন্, দ্যাখ্ (দেখ্), ঢাক্, শেখ্, ইত্যাদি। হসন্ত ব্যবহারের দ্বিতীয় ক্ষেত্রটি হল ঘটমান বর্তমান (বল্‌ছি'), সাধারণ অতীত (বল্‌ল), ঘটমান ও নিত্যবৃত্ত অতীত ('বল্‌ছিল', 'বল্‌ত'), ভবিষ্যৎ ('বল্‌বে') এবং অসমাপিকার সাপেক্ষ সংযোজক ('বল্‌লে') এবং নিমিত্তার্থক ('বল্‌তে') ইত্যাদি রূপগুলি।

বাংলা ধাতুরূপগুলিকে নিজেদের মধ্যে তুলনা করলেই চোখে পড়ে যে, এই দুই হসন্তব্যবহারের মধ্যে গুরুত্বের পার্থক্য আছে। ধাতু বা বর্তমান অনুজ্ঞার তুচ্ছার্থক মধ্যম পুরুষ রূপে হসন্তের ব্যবহার খানিকটা বিরোধনির্দেশক বা contrastive। ওখানে হসন্ত না দিলে অন্য ক্রিয়ারূপের সঙ্গে তার উচ্চারণ-

গত বিভ্রান্তির সম্ভাবনা। যেমন 'বল' এই শব্দটি লিখিতরূপে বহুর্থক। উপযুক্ত প্রতিবেশ যদি না থাকে, তাহলে এটি কেউ 'বল্' পড়তে পারেন, কেউ 'বলো' পড়তে পারেন (এই পাঠটির সম্ভাবনাই বেশি), কেউ 'বোলো' পড়তে পারেন (এমন সম্ভাবনা কম)। বিশেষ করে কথাটি 'বলো' (বর্তমান অনুজ্ঞার সাধারণ মধ্যম পুরুষের রূপ)-এর থেকে আলাদা করার জন্য হসন্তটি আবশ্যক। বিশেষণস্থানীয় অনির্দেশক সর্বনাম 'কোনো' এবং 'কোন্'-এর ক্ষেত্রে খানিকটা এই ধরনের সমস্যা দেখা দেয়। 'কোন' লিখলে 'কোনো' এবং 'কোন্' দুইই পড়ার সম্ভাবনা থাকে—বানানে তাকে সুনির্দিষ্ট করে দেওয়াই ভালো ; কাজেই তুচ্ছার্থক মধ্যম পুরুষের বর্তমান অনুজ্ঞার ক্রিয়ারূপে আমরা হসন্তের ব্যবহার সমর্থন করি। বলা বাহুল্য, কেবল ব্যঞ্জনান্ত ধাতুর ক্ষেত্রেই এই হসন্তের দরকার হচ্ছে।

কিন্তু অন্য রূপগুলিতে হসন্ত দেওয়ার কোনো প্রয়োজন আছে বলে স্বীকার করি না। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের অবলম্বিত বানানে ঊর্ধ্ব-কমা[১০] ও হসন্তের ব্যবহার প্রচুর। তিনি ব'ল্‌ছি, ক'র্‌তে, লাগ্‌লেন লিখতে কোনো দ্বিধা করেন না। সম্ভবত ঊর্ধ্বকমা ও হসন্তের ব্যবহারে যথাযথ উচ্চারণ এবং শব্দটির ঐতিহাসিক বিবর্তন দুইই ধরে রাখা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু আমাদের ধারণা এই রীতি লেখক ও মুদ্রককে সহায়তা করে না, অর্থাৎ 'ইকনমি'র অনুকূল নয় ; দ্বিতীয়ত এই রীতি তেমন প্রয়োজনীয়ও নয়। ঊর্ধ্বকমা ও হসন্ত বাদ দিলে এই ক্রিয়াপদগুলির রূপগত দ্ব্যর্থকতা (ambiguity) তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা তত বেশি নয়। 'বলছি' 'বল্-অছি' পড়বার সম্ভাবনা কতটা ? 'বলবে'-কে 'বোল্-অবে' ? 'লাগলেন'-কে 'লাগ্ অলেন' ? 'উঠলেন'-কে যদি কেউ অবিশ্বাস্যভাবে 'উঠোলেন' পড়ে ফেলেন তাহলে প্রতিবেশ বা context থেকে ক্রিয়াটি ণিজন্ত না অ-ণিজন্ত খুব সহজেই ধরা যাবে, হসন্তের অতিরিক্ত সহায়তা দরকার হবে না। সুনীতিকুমার ঊর্ধ্বকমা ও হসন্ত দুইই ব্যবহার করেছেন। ঊর্ধ্বকমা'র প্রয়োজনীয়তা আমরা এর আগে অস্বীকার করেছি। বর্তমান অনুজ্ঞার বিশেষ রূপ ছাড়া অন্য জায়গায় হসন্তের ব্যবহারও পরিহার্য বলে মনে করি।

৫. বিভক্তির বানান

ক. -লো, -তো, -বো সমস্যা

সমাপিকা ক্রিয়ার বিভক্তিগুলিতে বানানের সমস্যা আসছে মাত্র এক জায়গায় : যেখানে পুরুষ-বিভক্তির অন্ত্য-'অ' বাংলা ধ্বনিতত্ত্বের একটি নিয়মে 'ও'-তে

পরিবর্তিত হচ্ছে, সেখানে উচ্চারণগত এই ও-কে নির্দেশ করার জন্য ওকার দিতে হবে কি হবে না—এই হল প্রশ্ন। অসমাপিকার ক্রিয়াবিশেষ্যের ক্ষেত্রেও একই সমস্যা দেখা দিচ্ছে : '-আন' বিভক্তি জুড়তে হয় সাধিত ধাতুতে এর বিশেষ্য রূপ তৈরি করতে হলে। তা স্বরান্ত, উচ্চারণে ও-এর মতো। তাতে ও-কার দেওয়া উচিত, না উচিত নয় ? সমাপিকা ও অসমাপিকার ক্ষেত্রে ও-কার দেওয়ার পক্ষে (বা বিপক্ষে) যুক্তি যে ঠিক একরকমের নয়—এ থেকেই বোঝা যায় "একটি যথাযথ মানদণ্ড" বাংলা বানানের ক্ষেত্রে তৈরি করা কত কঠিন। এবং এ পর্যন্ত যে-সব প্রাতিষ্ঠানিক বানান সংস্কারের সুপারিশ আমরা দেখেছি, তাতে যত সহজে '-আনো' বিভক্তির 'ন'-এ ওকার দেবার সুপারিশ করা হয়েছে, তত সহজে অতীত ও ভবিষ্যতের '-ল' ও '-ব' বিভক্তিগুচ্ছকে (-ল্+ও, -ব্+ও) ও-কার দেবার সুপারিশ হয়নি। এ সব ক্ষেত্রে ওকার দেবার প্রবণতা প্রায় সবটাই ব্যক্তিগত। এখনও বাংলা সংবাদপত্রে, বা 'রবীন্দ্র রচনাবলী'তে বা এই ধরনের আরো কয়েকটি মান-নির্ধারক পাঠ্যে, ক্রিয়াবিশেষ্য লেখা হয়-'নো' দিয়ে, কিন্তু অতীত ও ভবিষ্যতে 'লো', -'তো' '-বো'-কে গ্রহণ করা হয় না। এক্ষেত্রে কি একটি সার্বিক ও uniform নিয়ম তৈরি করা উচিত নয় ?

এক্ষেত্রে সমস্যাটা হল economy ও উচ্চারণ-শাসনের দ্বন্দ্ব। ইকনমি, বা আয়াস-সাশ্রয় দাবি করে, যেটুকু নেহাৎ না হলে নয় কেবল সেটুকু চিহ্নই ব্যবহার করতে হবে, তা বেশি করার দরকার নেই। হাতের লেখা ও মুদ্রণের ক্ষেত্রে এই দাবি বিশেষ দামি হয়ে ওঠে, পড়ার ক্ষেত্রে হয়তো ততটা হয়ে ওঠে না, কারণ লেখা ও ছাপার ইকনমির হিসাব এক, আর পড়ার ইকনমির হিসাব আর। অন্যদিকে উচ্চারণ-শাসন দাবি করে, নির্ভুল উচ্চারণের জন্য যে সব চিহ্ন দরকার তা অবশ্যই ব্যবহার করতে হবে। এই দুই দাবির টানাপোড়েনে পড়ে শেষ পর্যন্ত নির্ধারণ করতে হয়, কোন্ ক্ষেত্রে ওকার ব্যবহার না করলে কত বেশি homograph তৈরি হবে, একই ধরনের দেখতে শব্দ নিয়ে পাঠকের বিভ্রান্তি কত বাড়বে। '-ল' ও '-ব'-র ক্ষেত্রে দেখি এই বিভ্রান্তির সম্ভাবনা খুব বেশি নয়। কিছু দৃষ্টান্ত দেখা যাক—

ক্রিয়া নয়	ক্রিয়া
ফাটল [ফাটোল্]	ফাটল [ফাট্লো]
ভরত [ভরোত্]	ভরত [ভোর্তো]
পরব [পরোব্]	পরব [পোর্বো]

পরত [পরোত্]	পরত [পোর্তো]
সরল [শরোল্]	সরল [শোরলো]
মরত (=মর্ত্য) [-মরোত্]	মরত [মোর্তো]
খেল [খেল্]	খেল [খেলো]
পাব (=পর্ব) [পাব্]	পাব [পাবো]

এরকম সমরূপ শব্দজোড়ের সংখ্যা আর খুব বেশি হবে না। কিন্তু এ থেকেই বুঝতে পারি, ও-কারের পক্ষে যুক্তিটি খুব সবল নয়। বাক্যে ক্রিয়াপদ ও ক্রিয়া-ছাড়া অন্য পদকে চেনার মস্ত বড়ো উপায় বাক্যে তাদের স্থায়ী ও আপেক্ষিক অবস্থান। স্থায়ী অবস্থান বলতে বুঝি বাক্যে তাদের সাধারণ ও প্রত্যাশিত জায়গা—যেমন সাধারণভাবে বাংলা বাক্যের গঠন S-O-V, অর্থাৎ Subject-Object-Verb। তাতে ক্রিয়ার স্থান বাক্যের শেষে। বলার ভঙ্গিতে যদি অবস্থানের হেরফের ঘটে, ক্রিয়া শেষ জায়গা ছেড়ে বাক্যের অন্যত্র এসে যায় (যেমন "যাচ্ছ তুমি তাহলে ওখানে ?"-তে), তখন তার আপেক্ষিক অবস্থান অর্থাৎ আশেপাশে অন্য শব্দগুলির তুলনায় তার অবস্থান দেখে তাকে চেনা যায়। আমাদের বুদ্ধি এইভাবে শব্দকে scanning করে তাকে ধরে ফেলতে পারে।

সুতরাং সাধারণ অতীতকালের প্রথম পুরুষের -ল, নিত্যবৃত্ত অতীতের প্রথম পুরুষে -ত এবং সাধারণ ভবিষ্যতের উত্তম পুরুষের রূপে -ব—এই সব শেষ বিভক্তির উচ্চারণ ওকার দিয়ে লেখবার দরকার নেই। না দিলে যত সমরূপী শব্দের সৃষ্টি হবে, সেগুলিকে আলাদা করে চিনে নিতে তেমন অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। উচ্চারণেও ভুল হবে না তত।

খ. -ন / -নো

কিন্তু ক্রিয়াপদের দুই বা তার বেশি সিলেবলের ধাতুকে যখন ক্রিয়াবিশেষ্যে রূপান্তরিত করি[১১] তখন তার সঙ্গে -'আনো' বিভক্তি জুড়তে হয়। এই 'আনো'-কে কীভাবে লিখব? ও-কার দিয়ে, না ও-কার ছাড়া 'আন' হিসেবে? দ্বিতীয় বিকল্পটি যদি গ্রহণ করি তাহলে বাংলা সাধিত ধাতুগুলির ক্রিয়াবিশেষ্যের রূপ এইরকম দাঁড়াবে :

দেখান, শোনান, পাঠান, বাঁচান,
দাঁড়ান, ঘুমান, চালান, লেখান ইত্যাদি।

এ থেকে তো বোঝাই যাচ্ছে সমস্যাটা কোথায়। ক্রিয়াপদ আর বিশেষ্য যদি সমরূপী (homograph) শব্দ হয়, তাহলে বাক্যে তাদের স্থায়ী ও

আপেক্ষিক অবস্থান থেকে তাদের পদ-চরিত্র ধরে ফেলা তত কঠিন নয়। কিন্তু যদি ক্রিয়াপদেরই দুটি (বা তিনটি) রূপ সমরূপী হয়? তাহলে কাজটা অসাধ্য না হলেও আরেকটু কঠিন হয়ে ওঠে। কঠিন হয় আরো এইজন্য যে, শব্দগুলি সমরূপী, কিন্তু সমধ্বন্যাত্মক নয়, অর্থাৎ তাদের উচ্চারণ এক নয়—আগের দৃষ্টান্তগুলির মতোই। আর এও ঠিক যে, 'ক্রিয়াবিশেষ্য' আর পূর্ণক্রিয়ার অনুজ্ঞা রূপকেও আমরা বাক্যে তাদের দুরকম অবস্থান থেকে খানিকটা ধরতে পারি। কিন্তু অনেক সময় যেখানে বিশেষ্য, ক্রিয়াবিশেষ্য এবং অনুজ্ঞা—এই তিনরকম সমরূপের উদ্ভব হয়, তখন তো আরো একটু অসুবিধা ঘটে। যেমন নিচের কয়েকটি ক্ষেত্রে :

বিশেষ্য	ক্রিয়াবিশেষ্য	সম্ভ্রমাত্মক বর্তমান অনুজ্ঞা
চালান (মালের—)	চালান	চালান (আপনি—)
জানান (—দেওয়া)	জানান	জানান („ —)
ভাসান (দেবীর—)	ভাসান	ভাসান (নৌকা—)
হেলান (—দেওয়া)	হেলান	হেলান (ছবিটাকে ডানদিকে—)
চাপান (উতোর—)	চাপান	চাপান (ওজন—)
উজান (নদীর—)	উজান	
পাঠান (কাবুলি)	পাঠান	পাঠান (আপনি চিঠি —)
বাগান (ফুলের—)	বাগান	বাগান („ বইটা —)
বানান (কঠিন—)	বানান	বানান (আপনি খেলনা—)
হারান (নাম)	হারান	হারান („ „ —)

উপরে আমরা ত্রিমুখী সমরূপতা দেখছি। একটু খতিয়ে দেখলে বোঝা যাবে, এখানে আসলে চতুর্মুখী সমরূপতা ঘটছে। তার কারণ, সম্ভ্রমাত্মক পুরুষের বর্তমান-অনুজ্ঞাই শুধু নয়, ঐ পুরুষের নিত্য বর্তমানের রূপও-'আন্' বিভক্তিতে শেষ হয়, ফলে কী অনুরোধে, কী বর্ণনায়—দুক্ষেত্রেই আমরা একটি বিশেষ ক্ষেত্রে একই ক্রিয়ার রূপ ব্যবহার করি : আপনি গাড়ি চালান [বর্ণনা]; আপনি গাড়ি চালান [অনুরোধ]।

অবশ্য একথাও মানতে হবে যে, চতুর্মুখী সমরূপতার সৃষ্টি হলেও প্রতিবেশ বা context-এর সাহায্যে শব্দগুলির অভিপ্রেত অর্থ বাছাই করে ওঠা একেবারে অসম্ভব নয়। 'অনুজ্ঞা' ও বর্তমান অর্থকে আলাদা করা কঠিন নয়, আবার ক্রিয়াবিশেষ্যের থেকে ক্রিয়াকেও আলাদা করা যায়। কারণ ক্রিয়াবিশেষ্য ও সমাপিকা ক্রিয়ার প্রতিবেশ ভিন্ন। ক্রিয়াবিশেষ্য বাংলায়

মূলত বিশেষ্য ও বিশেষণ (participipial adjective) অর্থে ব্যবহৃত হয়। ফলে ক্রিয়ার কর্তা হিসাবে আমরা কর্তৃকারক পদ পাই, যেমন 'আপনি গাড়ি চালান', কিন্তু ক্রিয়াবিশেষ্যের কোনো উক্ত কর্তা থাকে না। বরং তার আগে সম্বন্ধ পদ 'আপনার গাড়ি চালান' বেশি প্রত্যাশিত। বিশেষণ হিসেবে যদি 'চালান'-কে ব্যবহার করি, তাহলে তার পরে একটি বিশেষ্যকে প্রত্যাশা করব—'আপনার চালান গাড়ি।' তাহলে

আপনি গাড়ি চালান
আপনার গাড়ি চালান
আপনার চালান গাড়ি

এই তিনটি প্রয়োগে আপাতদৃষ্টিতে কোনো বিভ্রান্তির সুযোগ নেই, তিনটিরই সংগঠন, ক্রম এবং পদসম্বন্ধ আলাদা-আলাদা। তা সত্ত্বেও একটু লক্ষ করলেই দেখব যে, এগুলিতে সংশয়ের সুযোগ কম নয়। যদি

আপনি গাড়ি চালান
আপনার গাড়ি চালান

এই দুটি বাক্য আলাদা করে আনি, বানান থেকে প্রথম নজরে একটি 'চালান'-কে ক্রিয়া এবং অন্যটিকে ক্রিয়াবিশেষ্য বলে ধরে নেওয়া তত সহজ নয়। আবার

আপনার গাড়ি চালান
আপনার চালান গাড়ি

এ দুটিতেও প্রথম চালানটিকে 'ক্রিয়া' বলে ধরে নেওয়া অস্বাভাবিক নয়। এ থেকে আমাদের সিদ্ধান্ত এই, ক্রিয়াবিশেষ্যের শেষ স্বরধ্বনিটিকে ও-কার দিয়ে লেখার যুক্তি অতীত ভবিষ্যতের '-ল' -'ত' ও 'ব' বিভক্তিতে ও-কার দিয়ে লেখার যুক্তির চেয়ে বেশি শক্তিশালী। -'আন'-এর ন-এ ওকার না দিলে উচ্চারণ ভুল হওয়ারও সম্ভাবনা খুব বেশি।

৬. অনুজ্ঞা, অতীত, ভবিষ্যৎ

একটু আগেই আমরা দেখলাম যে, বাংলা সাধিত সমাপিকা ক্রিয়ার সম্ভ্রমাত্মক পুরুষের বর্তমান অনুজ্ঞার রূপ আর (ঐ একই পুরুষের) নিত্য বর্তমানের রূপ এক। এক বানান এবং উচ্চারণ উভয় দিক থেকে, অর্থাৎ এরা একই সঙ্গে সমরূপ (homograph) এবং সমোচ্চারিত (homonym) শব্দ। এদের ক্ষেত্রে প্রতিবেশের উপর ভরসা করা ছাড়া উপায় নেই, কারণ এদের বানানকে আলাদা করার কোনো সহজ পথ পাওয়া মুশকিল।

ক. বল / বলো সমস্যা

বাংলা সমাপিকা ক্রিয়ায় এই রকম আরো দু-এক জায়গায় ব্যাকরণগত দিক থেকে দুটি ভিন্ন রূপ (morpheme) এক চেহারা ধরে। যেমন ভবিষ্যতে সাধারণ মধ্যম পুরুষ ও সাধারণ প্রথম পুরুষের অন্তিম রূপ রূপ এক—দুটিই 'এ' ; সে খাবে ; তুমি খাবে। ভাষাতত্ত্বে একে দুটি রূপ বা form-এর একরূপণ বা neutralization বলে। এক্ষেত্রেও বানান আলাদা করার প্রশ্ন ওঠে না। কিন্তু নিত্য বর্তমানকালে সাধারণ মধ্যম পুরুষের ক্রিয়ারূপ এবং বর্তমান অনুজ্ঞায় তার রূপও সম্পূর্ণত এক। যেমন

তুমি বই পড়। [উক্তি]
তুমি বই পড়। [অনুজ্ঞা]

এক্ষেত্রে সমাপিকা ক্রিয়ার দুটি রূপকে উচ্চারণ অবিঘ্নিত রেখেই বানানের দিক থেকে আলাদা করা যায়—বাংলা বর্ণমালায় সে-উপায় তৈরি আছে। তা হল : অনুজ্ঞার ক্রিয়াপদটির শেষ ব্যঞ্জনে ওকার দেওয়া, যার ফলে

তুমি বই পড়, এবং
তুমি বই পড়ো

নিজের থেকেই পৃথক হয়ে যাবে। এতে একটাই অসুবিধা যে, এই পদ্ধতি আংশিকতাদুষ্ট, সর্বাঙ্গীণ নয়। স্বরান্ত ধাতুগুলির শেষে উভয় ক্ষেত্রেই আমাদের ও লিখতে হয়—যাও-যাও, সও-সও, গাও-গাও ইত্যাদি। সেখানে বানানে কেবল ধাতুর শেষে ব্যঞ্জন থাকলেই ঐ তফাত তৈরি করা সম্ভব হবে, যেমন

বল : বলো ; শোন : শোনো
হাঁট : হাঁটো ; রাখ : রাখো।

আবার 'বল' 'হাঁট', 'শোন', 'রাখ' ইত্যাদির সঙ্গে যদি তুচ্ছার্থক মধ্যম পুরুষ বর্তমান অনুজ্ঞার 'বল' (বল্), 'হাঁট' (হাঁট্) ইত্যাদির সমরূপতা সৃষ্টি হয় তাহলে সেখানে হসন্ত ব্যবহার করতে হবে। অবশ্য সেখানে কর্তায় 'তুমি' থাকবে না, 'তুই'-ই থাকবে। কিন্তু যদি কর্তা উহ্য থাকে তাহলে হসন্ত দেওয়া আবশ্যিক করতে হবে।

খ. লাম / লুম, তাম/ তুম

'বললাম' লিখব, না 'বললুম' লিখব, 'যেতাম' হবে, না 'যেতুম' হবে—এটা আদৌ বানানের সমস্যা নয়, প্রয়োগের সমস্যা, কাজেই বানান-বিধানে এর

অন্তর্ভুক্তি অসংগত। চলিত মান্য বাংলার মধ্যে অতীত কালের উত্তম পুরুষের বিভক্তির তিনটি বিভিন্ন রূপ আছে—আম্, উম্ এবং এম্। তিনটিই গৃহীত ও স্বীকৃত, কোনটি অশুদ্ধ বা অশিষ্ট নয়। বাংলার তিনটি উপভাষা থেকে এই তিনটি পুরুষ-বিভক্তি মান্য চলিতে প্রবেশ করেছে এবং পাশাপাশি অবস্থান করছে। উম-এর ভৌগোলিক উৎস রাঢ় অঞ্চল। মধ্য বাংলার 'আম'-কে প্রত্যন্ত রাঢ় অঞ্চলে 'অম্' রূপে পাওয়া যায়, বাঁকুড়া, পুরুলিয়াতে 'বইলম' 'যেইতম' আমরা শুনি। এই 'অম' আদ্য শ্বাসাঘাতজনিত দুর্বলতায় 'ওম্' হয়ে 'উম্' হয়েছে। এতে অপিনিহিত 'ই-' ধ্বনির প্রভাবও নিশ্চয়ই ছিল, প্রাদেশিক 'নু' বিভক্তির সাদৃশ্যমূলক প্রভাবও থাকতে পারে। '-আম্' আগেকার সর্ববঙ্গীয় এবং এখনকার পূর্ববঙ্গীয় বিভক্তি, সেখান থেকেই মান্য চলিতে গৃহীত। -'এম' খুলনা ও মধ্যবঙ্গ অঞ্চলে (এই অঞ্চল রাজশাহী থেকে খুলনা পর্যন্ত লম্বভাবে বিস্তৃত) এখনও প্রচলিত, মধুসূদন রবীন্দ্রনাথ ও ঠাকুর-পরিবারের সূত্রে মান্য চলিত গদ্যে ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয়েছে। -'এম' যদিও অন্নদাশংকর প্রভৃতি কয়েকজন প্রথিতযশা লেখক ব্যবহার করে আসছেন তবু এ বিভক্তিটির প্রয়োগ এখন একটু affected বলে মনে হয়, ফলে এর ব্যবহার কম। -'আম' এবং '-উম'-এর প্রয়োগই বেশি। এখানে লেখকদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতাই স্বীকার্য, যিনি যেটি পছন্দ করেন তিনি সেটি ব্যবহার করতে পারেন ; বা বিভিন্ন রচনায় দুটিকেই পালা করে ব্যবহার করতে পারেন।

কেবল প্রার্থনা এই যে, কোনো একটি রচনায় একই ধরনের প্রতিবেশে দুটিকে তিনি মিশিয়ে ব্যবহার করবেন না। "প্রতিবেশ"-এর কথাটা বলে রাখছি এইজন্য যে, লেখক বর্ণনায় -'আম' ও সংলাপে -'উম' নিশ্চয়ই ব্যবহার করতে পারেন—সেক্ষেত্রে প্রতিবেশ ভিন্ন বলেই তা নিয়ে আপত্তি উঠবে না। কিন্তু শুধু বর্ণনায় একই সঙ্গে দুটির ব্যবহার অবাঞ্ছিত।

কাজেই লেখক -'উম' লিখবেন না -'আম' লিখবেন সেটা তাঁর রীতিগত নির্বাচনের (stylistic choice)-এর প্রশ্ন। এটা বানানের কোনো সমস্যা নয়। কারণ যে -'আম' উচ্চারণ করে তাকে তা কোন্ বানানে লিখতে হবে তা নিয়ে কোনো সমস্যায় পড়তে হয় না ; যে -'উম' উচ্চারণ করে তার ক্ষেত্রেও এ সমস্যা নেই। কাজেই ১৯৩৭-এর তৃতীয় সংস্করণের বানান সংস্কার সমিতির সুপারিশগুলির ১১ নম্বর নিয়মে "-লাম বিভক্তি স্থানে -লুম বা -লেম লেখা যাইতে পারে"—এ বিধানে খানিকটা গায়ে-পড়া উপদেশের সুর আসে। এর সঙ্গে বানান-সংস্কারের কোনো সম্পর্ক নেই।

গ. কর্ব্ব/কর্চ্ছে ইত্যাদি ; রেফ ও ব্যঞ্জনদ্বিত্ব

ঊনবিংশ শতাব্দীর কোনো কোনো লেখকের রীতিতে -র অন্তক ধাতুর (কর্, পর্- সর্- পার্-, হার্, ধার্- ইত্যাদি) সঙ্গে ব্যঞ্জনাদ্য বিভক্তি যোগ হলে ধাতুর ঐ র-কে রেফ-এ রূপান্তরিত করা, তারপর প্রচলিত বানান অনুসারে পরবর্তী ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব লক্ষ করা যায়। যেমন মধুসূদনে

কুলোর বাতাস দিয়ে বিদায় কর্ত্তুম

এ সভা কখনোই এবলিশ কর্ত্তে পারবো না

ইত্যাদি। মধুসূদনে মূলত 'কর্-' ধাতুর রূপেই এই 'রেফ' ও যুগ্মব্যঞ্জনের, বিশেষত ত্ত-এর ব্যবহার বেশি দেখি। গিরিশচন্দ্রে 'র্ব্ব' (কর্ব্বেন, পার্ব্বে, মার্ব্বো, র্ত্ত, (ধর্ত্তে), ইত্যাদি লক্ষ করি। এই প্রবণতা দ্বিজেন্দ্রলালে খুব বেশি, তিনি 'কর্চ্ছ', 'পার্চ্ছ'-ও লেখেন। যাই হোক, রেফের পর ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব বা যুগ্মতা এখন আর আবশ্যিক নয়। ক্রিয়াপদের এই বানান যে পরবর্তীকালে পরিত্যক্ত হয়েছে তা সংগতই হয়েছে।

আর র্-এর জায়গায় রেফ ব্যবহারেরও কোনো যুক্তি নেই। ক্রিয়ারূপে নাটকের সংলাপেই রেফ-ব্যবহারের প্রবণতা বেশি লক্ষ করি। কিন্তু কথ্য-ভাষাশ্রিত গদ্যরচনায় অন্যত্রও তা পাওয়া যায়। সম্ভবত দ্রুত লেখার বা লিখিয়ে নেওয়ার জন্য যুক্তব্যঞ্জনের ব্যবহার নাটক ইত্যাদিতে বেশি হয়েছে। কিন্তু ক্রিয়াপদে র্-এর জায়গায় 'রেফ' ব্যবহার বর্জনীয়।

ঘ. কচ্চ্যি, বল্লেম, কল্লাম ইত্যাদি

'রেফ' না থাকলেও ঊনবিংশ শতাব্দীর বানানে ক্রিয়ারূপে একাধিক যুগ্ম-ব্যঞ্জনের ব্যবহার দেখি। এই যুগ্মব্যঞ্জনগুলির মধ্যে দুটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ করি। প্রথমত কতকগুলি যুগ্মব্যঞ্জন কেবল পারম্পর্য বোঝায়। অর্থাৎ দুটি ব্যঞ্জন পরপর এসেছে, তাদের পাশাপাশি না লিখে যুক্তভাবে লেখা হয়েছে। যেমন বল্-লেম > বল্লেম, তুল্-লুম > তুল্লুম, খুল্-লি > খুল্লি ইত্যাদি। আরেক ধরনের যুগ্মাক্ষর সমীভবন-জাত, মূলত র্ + চ বা র্ + ল থেকে হয়েছে যথাক্রমে 'চ্চ' বা 'ল্ল'। গিরিশচন্দ্রে 'কচ্চি' (করছি), কল্লে (করলে), পাল্লেম না (পারলেম না) ইত্যাদি প্রয়োগ পাই। মধুসূদনে 'কচ্চ্যি' ব্যবহারও দেখেছি, সেখানে অনাদ্য য-ফলার স্বাভাবিক যে উচ্চারণ, অর্থাৎ পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব— তারই ইঙ্গিত আছে সন্দেহ নেই। মধুসূদনে ক্রিয়াপদে য-ফলার ব্যবহার দু-ধরনের। প্রথমত তাঁর একটি য-ফলা অপিনিহিতি-সূচক, অর্থাৎ 'কইরে' বোঝাতে তিনি 'কর‍্যে'

লেখেন, 'বইলে, বোঝাতে 'বল্যে' লেখেন। দীনবন্ধুও এরকম বানান লিখেছেন। দ্বিতীয়ত দ্বিত্ব বোঝানোর জন্যও মধুসূদন (বা তাঁর শ্রুতলেখক পণ্ডিতেরা) য-ফলা ব্যবহার করেছেন, যেমন, 'যাচ্যে' (যাচ্চে) 'কল্যে' (করলে > কল্লে), 'কত্যে' (করতে>কত্তে)। এই সব বানান-রীতি এখন বর্জিত হয়েছে। প্রাক্-সুনির্ধারণ (Pre-standardization) যুগের এই সব বানানের পিছনে ভাষাতাত্ত্বিক যুক্তি থাকলেও এখন তা বিভ্রান্তিরই সৃষ্টি করে।

এখন ক্রিয়াপদের বানান যে যুক্তব্যঞ্জন পরিহার করে স্বচ্ছ ও পাশ্বর্ক্রমিক (linear) হয়েছে তাতে বানান স্ট্যাণ্ডার্ডাইজেশনেরই সুরাহা হয়েছে। র-এর জায়গায় রেফ ব্যবহার বর্জন করে 'র্'-কে বজায় রাখা ; র্ + ল্ এর সমীভূত রূপ 'ল্ল' (কল্লাম—করলাম, ধল্লে—ধরলে) না লিখে 'র' ও 'ল' পাশাপাশি লেখা ; 'র + চ্' কে 'চ্চ' (করচি—কচ্চি) না লিখে পরিষ্কার 'রচ' রেখে দেওয়াতে ব্যক্তিগত উৎকেন্দ্রিকতার সুযোগ যেমন কমেছে তেমনই বানান-সুনির্ণয়ের বৈজ্ঞানিক ভিত্তিও তৈরি হয়েছে।

ঙ. -চ্ছ

পাঠকেরা নিশ্চয়ই খেয়াল করেছেন, ক্রিয়ার সমাপিকা রূপগুলির একটি মাত্র জায়গায় একটি যুক্তব্যঞ্জন (আসলে যুগ্মব্যঞ্জন)-কে বিতাড়িত করা সম্ভব হয়নি। ধাতুর ঘটমান রূপে ব্যঞ্জনান্ত হলে 'ছ্' বিভক্তি এবং ধাতুটি স্বরান্ত হলে 'চ্ছ্' বিভক্তি যুক্ত হয়, পরে তার সঙ্গে অন্যান্য বিভক্তি এসে জুড়ে যায়। যেমন খাচ্ছি, যাচ্ছিলাম, হচ্ছে, নিচ্ছিল ইত্যাদি।

প্রশ্ন হল, ক্রিয়াপদের বানানের মূল প্রবণতার সঙ্গে তাল রেখে এই চ্ছ-কেও আমরা ভেঙে 'চছ' করে দেব কি না—'যুগান্তর' দৈনিকের মুদ্রণে মাঝে মাঝে যেমন দেখা গেছে—যাচ্ছে, হচ্ছিল ইত্যাদি রূপ ? তা অবশ্যই মুদ্রণ- বিভ্রাটের ফলে ঘটেছে মনে হয়, কোনো সচেতন পরিকল্পনার লক্ষণ তাতে দেখিনি। কিন্তু এটা কি করা যায়—যেখানে ক্রিয়াপদে অন্যত্র সব জায়গায় যুক্তব্যঞ্জন আমরা পরিহার করছি ?

আমাদের উত্তর, এ করা উচিত নয়, লিনিয়ারিটির অজুহাতেও নয়। তার কারণ ঘটমান 'বিভক্তি 'চ্ছ' 'ছ'-এরই একটি রূপভেদ (allomorph) মাত্র, কেবল স্বরান্ত ধাতুর সঙ্গেই তা 'চ্ছ' রূপ পায়। এর ঐতিহাসিক কারণ আছে, কিন্তু তার আলোচনা এখানে প্রাসঙ্গিক নয়। এখন তাকে যদি আমরা ভেঙে 'খাচছে' 'যাচছি' ইত্যাদি লিখি (হসন্ত আমরা ব্যবহার করব না) তাহলে অসুবিধা এই হবে যে, ক্রমে ধাতুর চেহারাটা সম্বন্ধেই আমাদের

বিভ্রম জন্মাবে, মনে হবে, ধাতুটি যা- নয় 'যাচ্ -', খা-নয় 'খাচ্ -'। বিদেশী-দের পক্ষেই এই অসুবিধাটা সবচেয়ে বেশি হবে নিঃসন্দেহে, কিন্তু বাঙালিদের কাছেও কম বিড়ম্বনাজনক হবে না। বাঙালি শিশু যখন 'বলছি', 'দেখছে', নাচছে' ইত্যাদির সঙ্গে 'হচছে', 'পাচছে', 'ধুচছে' ইত্যাদি পাবে তখন তার স্বাভাবিক প্রবণতাই হবে ছে-র আগে বিভক্তির একটি ছেদ বসানোর। তখন 'যাচছে' (যাচ্ + ছে) আর 'যাচ্ছে'-র মধ্যেও সংশয় তৈরি হবে। সে সম্ভাবনা এড়াতে হলে ক্রিয়াপদে ওই নিঃসঙ্গ যুক্তাক্ষর 'চ্ছ'-কে রেখে দেওয়া ছাড়া উপায় নেই।

৬. বিদেশী শব্দের প্রতিবর্ণীকরণ

১

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৩৫-৩৬ সালের বানান সংস্কার উপলক্ষ্যে গঠিত সমিতি বানানসংস্কারে বিদেশী শব্দের বাংলা প্রতিবর্ণীকরণেরও কিছু নীতি নির্ধারণ করেছিলেন[১]। এইসব নীতি বাংলা গদ্যরচনায় এক শতাব্দীর কিছু বেশি সময় ধরে বিদেশী শব্দের লিপ্যন্তরের যে-সমস্ত অভ্যাস প্রচলিত ছিল সেগুলিকে প্রতিফলিত করেছে এবং একসূত্রে সংহত ও সুবিন্যস্ত করেছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা নাম বা পদবীর ইংরেজি লিপ্যন্তরের ক্ষেত্রেও কিছু নীতিনিয়ম গ্রহণ করেছে—সেগুলি আমরা সার্টিফিকেটে লেখা নামধাম থেকে বুঝতে পারি। বোর্ডেরও (মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক) নিশ্চয়ই এ ধরনের নীতি কিছু আছে, যার লক্ষ একরূপতা বা ইউনিফরমিটি। বিশ্ববিদ্যালয় ও বোর্ডের লিপ্যন্তরণনীতি সম্ভবত হুবহু একরকম নয়, কোথাও কোথাও দুয়ে বৈসাদৃশ্য লক্ষ করেছি। এ দুয়ের সমতা সাধন প্রয়োজন। কিন্তু এখানে আমাদের মূল আলোচ্য হল বিদেশী শব্দের বাংলা লিপ্যন্তরের সমস্যা।

যে-সব ভাষা ভারতীয় উৎসের নানা বর্ণমালায় লিখিত হয়, সেগুলি থেকে ধার-করা শব্দ বাংলাভাষায় লিখতে কোনো বড় অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। দক্ষিণ ভারতের কয়েকটি লিপিতে অল্প সরলতা ঘটলেও সাধারণভাবে ভারতীয় বর্ণমালাগুলির ছাঁচ মূলত এক। ফলে মারাঠি গুজরাটি বা গুরমুখি বর্ণমালায় লেখা শব্দ বাংলায় লেখা খুব কঠিন নয়। তবে মলয়ালি দন্তমূলীয় 'ট' বা মারাঠি বা ওড়িয়া 'ণ' এর উচ্চারণ বাংলায় করা যাবে না, তার 'ট' (মূর্ধন্য) এবং দন্ত্য ন উচ্চারণ হবে যথাক্রমে, কিংবা মারাঠি মূর্ধন্য ল বাংলায় লেখা যাবে না, তার উচ্চারণও করা যাবে না—এই ধরনের নানা অসম্পূর্ণতা মেনে নিতেই হবে। কোনও স্বাভাবিক বর্ণমালাই নিজস্ব ভাষার ধ্বনির অতিরিক্ত অন্য ভাষার সব ধ্বনি লেখার পক্ষে যথেষ্ট সমৃদ্ধ নয়। ইংরেজি গ্রিক রুশ আরবি কোনো বর্ণমালাই এ ধরনের সম্পূর্ণতা দাবি করতে পারে না। কিন্তু ভারতীয় ভাষায় শব্দ বাংলায় লেখার ক্ষেত্রে অসুবিধার চেয়ে সুবিধার

পরিমাণ তুলনায় বেশি, তার কারণ, ভাষাগত সন্নিধান বা convergence-এর জন্য ভারতীয় ভাষার ধ্বনিগুলির ছাঁচ অনেকটা একরকম হয়ে গড়ে উঠেছে—বিশেষত প্রধান প্রধান ভারতীয় ভাষার। ফলে ভারতীয় ভাষার শব্দের ক্ষেত্রে আমাদের মূল ভাষার বানানটি বজায় রেখে লিপিচিহ্নের বদলে লিপিচিহ্ন বসিয়ে গেলেই বেশির ভাগ ক্ষেত্রে কাজ চলে যায়। তাতেও অবশ্য কিছু সমস্যা ঘটে, শব্দটির চালু বাংলা উচ্চারণ অনুযায়ী বানান হবে, না মূল ভাষার উচ্চারণ অনুযায়ী বানান হবে[২] —এই নিয়ে সংশয় বা তর্কের অবকাশ তৈরি হয়। তার আলোচনা আমরা পরে করছি।

কিন্তু বিদেশী বর্ণমালার মধ্যে বিদেশী ভাষার ধ্বনিসম্ভার যে-ভাবে প্রতিফলিত, সেই ধ্বনিসম্ভারে আমাদের ভাষায় অনুপস্থিত ধ্বনির সংখ্যা অনেক বেশি।

আর বিদেশী বর্ণমালার সঙ্গে বাংলা বর্ণমালার মূল ধাঁচটির তফাত থাকায় লিপিচিহ্নের বদলে লিপিচিহ্নটি বসিয়ে এখানে প্রতিবর্ণীকরণের সুবিধা নেই, কারণ বিদেশী বর্ণমালায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এক-একটি চিহ্ন এক-একটি ধ্বনির প্রতিনিধিত্ব করে, বাংলায় তা করে না। বাংলায় একটি ব্যঞ্জন আলাদাভাবে সেই ব্যঞ্জন ও তার সঙ্গে লগ্ন 'অ' ধ্বনি বোঝায়। বাংলায় 'সমর' এর বানানে তিনটি মাত্র ব্যঞ্জনচিহ্নই ব্যবহৃত, কিন্তু ইংরেজি বা ইঙ্গ-রোমক বর্ণমালায় এটি লিখতে গেলে প্রথম দুই ব্যঞ্জন 'সম'-র ক্ষেত্রে লিখতে হবে Sa-ma, অর্থাৎ দুবার একটি ব্যঞ্জনচিহ্ন ও একটি স্বরচিহ্নের যুগ্ম ইউনিট।

অন্যদিকে বাংলার স্বরবর্ণের 'কার' চিহ্ন জাতীয় Secondary symbol-গুলি বিদেশী বর্ণমালায় নেই। তাই বিদেশী শব্দের প্রতিবর্ণীকরণের ক্ষেত্রে প্রতিটি বিদেশী বর্ণের বাংলা প্রতিরূপ স্থির করে তারপর আমাদের অগ্রসর হতে হয়। দেবনাগরী থেকে আমরা আ কার দীর্ঘ ঈকার হুবহু বাংলায় লিপ্যনুবাদ করে নিতে পারি, কিন্তু ইঙ্গরোমক থেকে (বা আরবি বর্ণমালা থেকে) বাংলা লিখতে হলে আরেকটু বিস্তৃত সিদ্ধান্ত নেবার দরকার পড়ে—সে বর্ণমালার লিখিত রূপকে বাংলা বর্ণমালার ধর্ম অনুযায়ী একটু বদলে নিতে হয়।

যেমন ইঙ্গ-রোমকের বা সাধারণ রোমক বর্ণমালার শব্দের গোড়াকার স্বরবর্ণটিকে বাংলায় আস্ত স্বরবর্ণ (primary symbol) দিয়ে, কিন্তু শব্দের মধ্যবর্তী ব্যঞ্জনানুসারী স্বরবর্ণকে বাংলা 'কার' চিহ্ন দিয়ে, বা বিদেশী শব্দের পার্শ্ববর্তী ব্যঞ্জনগুচ্ছকে কোথায় যুক্তব্যঞ্জন দিয়ে কোথায় পৃথক রেখে লিখতে হবে—এই ধরনের কয়েকটি মৌলিক নীতি আবশ্যিকভাবে ঠিক করে নিতে হয়।

২

প্রতিবর্ণীকরণের সমস্যাটি প্রবল হয় বিশেষ করে নতুন-আসা বিদেশী শব্দের বেলায়। বাংলা ভাষায় বিদেশী শব্দ অনেক আগে থেকেই আসতে শুরু করেছে। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যে সেই পঞ্চদশ শতাব্দীতেই যে চারটি ফারসি শব্দ ঢুকে পড়েছিল তা সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় আমাদের দেখিয়েছেন[৩]। কিন্তু এইসব আরবি-ফারসি শব্দগুলি আমাদের ভাষার পুরানো ঋণ, এগুলির বেশির ভাগ ক্রমশ মুখে উচ্চারিত হতে হতে সাধারণ বাঙালির দৈনন্দিন ভাষার মধ্যে ওতপ্রোতভাবে মিশে গেছে, ফলে এগুলি বাংলা শব্দই হয়ে দাঁড়িয়েছে। এগুলি লেখারও দীর্ঘ রীতি তৈরি হয়ে গেছে। এই রীতির পুনর্বিবেচনা-বিষয়ক প্রশ্ন যে না উঠেছে তা নয়, কিন্তু সে প্রশ্ন উঠেছে মূলত মৌলিক উচ্চারণের প্রতি আমাদের নবজাগ্রত আগ্রহ ও নিষ্ঠা থেকে। এরমধ্যে শিক্ষিতের অহংকার বা জাতীয়তা বা ধর্মীয়তার একটু ঝোঁকও আছে। যা আমরা 'মাশুল' হিসেবে এতকাল লিখে এসেছি, তা যদি এখন মূলের উচ্চারণের কথা খেয়াল করে 'মাসুল' লিখতে হয়, এবং বাংলা হয়ে যাওয়া শব্দকে হঠাৎ অচেনা বিদেশী করে দেওয়া হয়, তাতে অনেক প্রশ্ন উঠে পড়ে[৪]। ইংরেজির ক্ষেত্রেও এমন ঘটছে। যে 'মাষ্টার' বানানটি সাধারণ বাংলা উচ্চারণের মোটামুটি যথাযথ প্রতিফলন ছিল, তার জায়গায় শিক্ষিতের সচেতন উচ্চারণের প্রতিনিধি হিসেবে 'মাস্টার' বানানটি চালু হয়েছে, এবং বোঝানো হচ্ছে যে, এই 'স' ইংরেজি [s] এর মতো ; বাংলা শ বা ষ এর মতো নয়। ফলত দাঁড়িয়েছে যে, 'মাষ্টার' ও 'মাস্টার' এখন দুটি শব্দ বাংলায়, একটি নয়।

৩

গৃহীত পুরানো উচ্চারণ এবং হালে খেয়াল-করা নতুন উচ্চারণ—এ দুইই যে শুধু প্রতিবর্ণীকরণে দ্বিধা সৃষ্টি করেছে তাই নয়। এই দ্বিধার আরও ক্ষেত্র আছে। বিদেশী শব্দ, বিশেষত অধিকাংশত ইয়োরোপীয় ভাষার শব্দ, এতকাল আমরা কেবল ইংরেজি ভাষার মধ্য দিয়ে পেয়েছি। আগে আরবি বা তুর্কি শব্দ আমরা যেমন লাভ করেছিলাম ফারসির সূত্রে। অন্যান্য বিদেশী ভাষার সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ সম্পর্ক কম ছিল, ফলে ইংরেজির চালু উচ্চারণটিকেই আমরা বাংলায় সাধ্যমতো প্রতিফলিত করার চেষ্টা

করেছি। তখন আমরা ইংরেজি গুরুর পাঠশালার ছাত্র ছিলাম, তার কথাই বেদবাক্য জ্ঞান করেছি। ফলে গত শতাব্দী থেকে নাটকে ভালো অভিনয় দেখে আমরা অজস্রবার 'এনকোর!' 'এনকোর!' বলে চেঁচিয়েছি কিন্তু ভুলেও জানতাম না যে, ও শব্দটা ইংরেজ নিয়েছে ফরাসি ভাষা থেকে এবং ওটার মূল উচ্চারণ 'আঁকোর' বা ওরই কাছাকাছি। 'লাতিন' ইংরেজের মুখে 'ল্যাটিন' হয়েছে, ওই ভাষার 'ভিনি, ভিদি, ভিকি (এই 'ভ' ঠিক বাংলা 'ভ' নয় ইংরেজি v-এর মতো) কথাটি ইংরেজের মুখে 'ভিনি, ভিডি, ভিসি' হয়েছে, 'কিকেরো' হয়েছে 'সিসেরো', 'লঙ্গিনুস' 'লনজাইনাস'। আমরা এসব বিনা বাক্যব্যয়ে মেনে নিয়েছি। কারণ তখন এইসব অন্যান্য ভাষার সঙ্গে বিশেষজ্ঞ ছাড়া অন্যদের সাক্ষাৎ সম্পর্ক কম ছিল, মূল ভাষায় শব্দগুলির উচ্চারণ কী তা-ই আমরা অনেকে জানতাম না।

কিন্তু এর মধ্যে দিনকাল বদলেছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এই শতাব্দীর গোড়ায় তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তা ছাড়া অন্যান্য ভাষাশিক্ষারও সুযোগ প্রচুর বেড়েছে। ফলে শিক্ষিত ভারতীয়দের মধ্যে অনেকেই এখন ফরাসি জার্মান রুশ স্প্যানিশ গ্রিক লাতিন চীনা জাপানি ইত্যাদি ভাষা জানেন, অপেক্ষাকৃত কম প্রতিপত্তিশালী চেক পোলিশ হাঙ্গেরীয় সুইডিশও কেউ কেউ শিখে নিয়েছেন। আর এখন ভাষাশিক্ষার যে পদ্ধতি, তাতে লিখিত টেক্সট, শব্দ-তালিকার লিখিত রূপ মুখস্থ এবং গ্রামার-ট্রানস্লেশন পদ্ধতি প্রায় বর্জিত হয়েছে। এখন বহু জায়গায় ডিরেক্ট মেথডে ভাষাটি শুনিয়ে এবং বলতে বাধ্য করে তা শেখানো হচ্ছে। এতে ওসব ভাষার শব্দের মূল উচ্চারণও আমাদের অধিগত হচ্ছে। ফলে আমরা জানতে পারছি যে, চেকোস্লোভাকিয়ার রাজধানী 'Prague' ইংরেজিতে ও রোমক বানানে এভাবে লেখা হলেও, এবং ইংরেজিতে 'প্রাগ' উচ্চারিত হলেও, তার মৌলিক উচ্চারণ 'প্রাহা'। সুতরাং নতুন দ্বিধা জাগছে, প্রাগ লিখব না প্রাহা লিখব? 'রেস্টুরেণ্ট' 'রেষ্টাউরেণ্ট' লিখব না 'রেস্তোরাঁ' লিখব?

এই সমস্যা বিশেষ করে জটিল হয়ে পড়ে খবরের কাগজের কাজকর্মে, সাংবাদিকদের খবর লেখার সময়। আমাদের সাংবাদিকরা কেউ কেউ ভাষার ব্যাপারে নিপুণ, কিন্তু সকলেই এমন কিছু ভাষাবিজ্ঞানী নন, সেরকম প্রত্যাশাও করা যায় না। দৈনিক অজস্র বিদেশী খবর তাঁদের বাংলাভাষায় পরিবেষণ করতে হয়, অসংখ্য বিদেশী নামের বাংলা রূপান্তর করে নিতে হয়। তাঁরা বাংলা ও ইংরেজি নিশ্চয়ই ভাল জানেন, কিন্তু বিদেশী নাম তো শুধু ইংরেজি ভাষার নাম নয়—তার মধ্যে আসছে আফ্রিকার নানা ভাষার নাম, ফিলিপিন্স-এর নাম, ভিয়েতনামের নাম, চীনা নাম এবং সেই সঙ্গে ফরাসি জার্মান নাম। তাঁদের পক্ষে এইসব নামগুলির মৌলিক উচ্চারণ

জানা সম্ভব নয়। ফলে অনেকেই বাধ্য হয়ে যে-কাজ করেন তা এই—ইংরেজি বানানের চেহারা অনুসরণ করে বাংলায় একটা উচ্চারণ অনুমান করেন তাঁরা, তারপর সেই অনুযায়ী একটা বাংলা বানান তৈরি করেন। বানান ধরে এই যে উচ্চারণ—যার নাম spelling pronunciation—তাই অধিকাংশ সাংবাদিক-সুলভ প্রতিবর্ণীকরণের উৎস ; ফলে পোলাণ্ডের শ্রমিক নেতার নাম 'ওয়ালেসা' লিখেই তাঁরা খুশি ছিলেন। কিংবা ফরাসি প্রেসিডেণ্টের নাম 'মিটেরণ্ড্'। তারপরে কেউ কেউ বললেন যে ওটা উচ্চারণে যথাক্রমে 'ভ্যালেন্সা' এবং 'মিতের' হবে। সুতরাং কোথাও কোথাও তার বানান সংশোধন করা হল। এইভাবে মার্কিন প্রেসিডেণ্টের নামের 'রেগন' 'রেগান' 'রিগান' ইত্যাদি নানারকম বানান দেখা যায়। সেদিন একটি বাংলা কাগজে মার্কিন দেশের অ্যারিজোনা রাজ্যের একটি শহরের নাম দেখছিলাম 'টুকসান'। এটি ইংরেজি **Tucson** শব্দের বঙ্গীয় রূপ। যিনি বাংলায় শব্দটি লিখেছেন তাঁর পক্ষে জানা সম্ভব নয় যে, ওটির স্থানীয় (অর্থাৎ ওদেশের) উচ্চারণ 'টুসন' বা 'টুসান'। মার্কিন দেশ ও অন্যত্র হয়ত এমন দুটি শহর আছে যাদের নামের বানান হুবহু এক। কিন্তু তাদের উচ্চারণও এক হবে এমন কোনো কথা নেই। যেমন মার্কিন দেশেও আছে Cairo নামের অজস্র ছোট শহর। কিন্তু সেখানকার উচ্চারণ 'কেরো' (খেরো), কিন্তু মিশরে এবং বিলিতি ইংরেজিতে তার উচ্চারণ 'কায়রো' (খায়রো)।

ব্রিটিশ এবং মার্কিন ইংরেজির এই তফাত ছাড়াও, এই দুই উপভাষার প্রত্যেকের নিজের মধ্যেই বানান ও উচ্চারণের নানা অসংগতি আছে এবং কোনো ইংরেজিতেই বানান নিজের উচ্চারণের প্রতি যে বিশ্বস্ত নয় সেকথা সকলেরই জানা। ব্রিটিশ ইংরেজিতেও যে-শহরের বানান **Cirenchester** তাঁর স্থানীয় উচ্চারণ যে 'সিসিস্টার' তা না জানলে বিভ্রান্তি ঘটে। কাজেই বানানবদ্ধ উচ্চারণ বা spelling pronunciation অনুযায়ী বাংলা লিপ্যন্তর করতে গেলে প্রায়ই নানা অদ্ভুত নামের দেখা পাওয়া যায়। সাংবাদিকদের অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে উচ্চারণ এবং লিপ্যন্তর বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হয় বলে তাঁদের ভ্রমপ্রমাদ ঘটা অস্বাভাবিক নয়। তবু তো এখন বি. বি. সি. বা অন্যান্য বিদেশী রেডিয়োর খবর থেকে নানা বিদেশী নামের অন্তত ইংরেজি উচ্চারণ জানা সম্ভব। কিন্তু গত শতাব্দীতে আমাদের ইংরেজি শিক্ষার প্রথম যুগে যেহেতু লেখা (বা ছাপা) বই থেকে আমরা ইংরেজি শিখেছি, সেহেতু উচ্চারণের কয়েকটি মূল নির্দেশ জানা সত্ত্বেও বহু ক্ষেত্রেই বিসদৃশতা ঘটছে। পরশুরামের "রাতারাতি" গল্পে 'কেফ্' 'রেণ্ডেজভোশ' 'রেষ্টাউরেণ্ট' ইত্যাদিতে ফরাসি উচ্চারণের বিপর্যয় শুধু

নয়, গত শতাব্দীতে ইংরেজি উচ্চারণের ক্ষেত্রেও এমন দুর্দৈব প্রচুর লক্ষ করা গেছে।

দেখাই যাচ্ছে যে, ইংরেজি বা ইংরেজি অক্ষরে অন্য ভাষার শব্দের spelling pronunciation সেসব শব্দের যথার্থ মৌলিক উচ্চারণকে প্রতিফলিত করে না। ফলে ওই বানান দেখে তার বাংলা প্রতিরূপ নির্ণয় করা ঝুঁকির কাজ। সম্ভব হলে হাতের কাছে একটি উচ্চারণ অভিধান নিয়ে বসা ভালো[৫]।

তাহলে কি আমরা অন্য ভাষার মূল একটি উচ্চারণ ধরে নিয়ে তার বাংলা লিপ্যন্তর করবার চেষ্টা করব? তাহলে লাতিন এবং গ্রিক অজস্র শব্দের চেহারা বাংলায় প্রচুর পালটে যাবে—সেই সম্ভাবনার জন্য আমরা প্রস্তুত কিনা সেটা ভেবে দেখতে হবে। এর ফলে বাংলা ভাষায় একই নাম বা শব্দের দুটি করে চেহারা, এক ধরনের doublet, তৈরি হবে। একটি প্রচলিত ইংরেজি উচ্চারণের লিপ্যন্তর, আরেকটি মূল ভাষার উচ্চারণের লিপ্যন্তর। এর কয়েকটি দৃষ্টান্ত তোলা যাক।

ইংরেজি বানান	ইংরেজি উচ্চারণ	মূল উচ্চারণ	
Cicero	সিসেরো	কিকেরো	(লাতিন)
Circe	স্যরসি	কির্কে	,,
Horace	হোরেস	হোরাকে	,,
Longinus	লঞ্জাইনাস	লঙ্গিনুস/নস	,,
Tacitus	ট্যাসিটাস	তাকিতুস/তস	,,
Virgil	ভার্জিল	ভির্গিল	,,
Apollo	অ্যাপোলো	আপোল্লো (ন.)	(গ্রিক)
Aphrodite	অ্যাফ্রোডাইটি	আফ্রোদিতে	,,
Achilles	অ্যাখিলিস	আখিল্লেস	,,
Aristotle	অ্যারিস্টট্‌ল	আরিস্তোতেল	,,
Dionysus	ডায়োনিসাস	দিয়োনুসুস/সস	,,
Plato	প্লেটো	প্লাতো (ন.)	,,
Socrates	সক্রেটিস	সোক্রাতেস	,,
Oedipous	ইডিপাস	অয়দিপৌস	,,
Alcestis	অ্যালসেস্টিস	আলকেস্তিস	,,
Aeschylus	ইসস্কাইলাস	আয়স্খুলস্ ইত্যাদি।	,,

বেশ কয়েক-শ শব্দে এই ব্যাপারটা ঘটবে, অর্থাৎ এদের পাশাপাশি দুটি করে সমান্তরাল চেহারা দাঁড়াবে। এই সমস্যার কোনো সহজ সমাধান নেই। যদি শব্দগুলি লাতিন বা গ্রিক থেকে সোজাসুজি বাংলায় আসত তাহলে তার পরিষ্কার বাংলা চেহারা দাঁড়াত, লিপ্যন্তরও সেই অনুযায়ী নির্বাচিত হত। কিন্তু এগুলি সবই এসেছে ইংরেজির মধ্য দিয়ে, ইংরেজি উচ্চারণে। সেগুলিই আমরা আগে শিখে নিয়েছি। এখন মূলের উচ্চারণ অনুমান করে আমরা যদি সেগুলির চেহারা বদলাই তাতে বিভ্রান্তি ঘটার সম্ভাবনা কম নয়। শুধু গ্রিক-লাতিন কেন, অন্যান্য ইয়োরোপীয় ভাষার শব্দের ক্ষেত্রেও এই একই সংকট তৈরি হবে। বঙ্কিমচন্দ্র দিব্যি 'মেদিচি' লিখেছিলেন, কিন্তু এখন আমরা ইংরেজি বানান ধরে কথাটি উচ্চারণ করি 'মেডিসি' (Medici)। যা ছিল 'চেঞ্চি' (Cenci) ইটালিয়ানে তা আমরা অনেকে ইংরেজি নিয়মে বলি 'সেনসি', ইতালীয় 'জোত্তো'-কে বলি জিয়োত্তো (Giotto)। তা আমরা এখন শুধরে নেব কি ? ফরাসি Garage, envelop, ensemble ইত্যাদি শব্দকে এখন ইংরেজরাই 'গারাজ', 'আঁভলপ', 'আঁসেম্বল্' উচ্চারণ করছে। ইংরেজের দেখাদেখি আমরাও কি তাহলে 'গ্যারেজ' 'এনভেলপ' 'এনসেম্বল' 'এনকোর' লেখা ছেড়ে দেব ? তা কি এতই সহজ ?

ইংরেজি বা ইউরোপীয় ধ্বনির দীর্ঘস্বর নিয়ে একটু সমস্যা আছে। বাংলায় দীর্ঘস্বরের উচ্চারণ নেই, ফলে সাধারণভাবে আমরা street, school tool, people, tree, theme, three ইত্যাদি (ইংরেজি) শব্দের অন্তর্গত দীর্ঘ ঈ বা ঊ ধ্বনিকে বাংলায় হ্রস্ব উচ্চারণ করি। লেখাতেও কি আমরা হ্রস্ব ই / হ্রস্ব উ-কার দিয়ে লিখব ? এখানে মূলানুগত্যের সঙ্গে বাঙালির স্বাভাবিক উচ্চারণের যে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয় তাতে কেউ এ পক্ষে কেউ ও পক্ষে, কেউ-বা দু-পক্ষেই যোগ দেন। আমাদের মতে (আমাদের অভ্যাস যে-সাক্ষ্যই দিক না কেন), বাংলায় লেখার স্বাভাবিক প্রবণতা হ্রস্ব স্বরচিহ্নের দিকে। ফলে এগুলি হ্রস্ব চিহ্ন দিয়ে স্ট্রিট, পিপ্‌ল ইত্যাদি লেখাই ভালো। স্কুল, টুল, ট্রি, থ্রি সাধারণভাবে হ্রস্ব চিহ্ন দিয়েই লেখা হয়েছে, এখন মূল উচ্চারণ দেখিয়ে শিক্ষিতের মৃদু অহমিকা প্রকাশের জন্য স্কুল, টুল (ঠুল ?) ট্রী, থ্রী লেখার কোনো প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। যদি ধ্বনিগত দিক থেকে কোথাও হ্রস্ব-দীর্ঘস্বরের তফাত দেখাতে হয় তাহলে দীর্ঘ স্বর-চিহ্ন দিলেই হবে। বাংলায় সে উপায় আছে এখনও, দীর্ঘ চিহ্ন সম্পূর্ণ বিতাড়িত হলে তখন অন্য কথা ভাবা যাবে।

এখানেই মনে হয়, একটি সর্বজনমান্য আকাদেমি গোছের কিছু থাকলে তার কাছে ফতোয়া চাওয়া যেত। আকাদেমিই বলে দিত, আজ থেকে এই শব্দগুলি ভাষা থেকে বাতিল হল, তার বদলে নতুন বানানে শব্দগুলির অন্য

চেহারা হল ; এখন থেকে সবাই নতুন বানানে শব্দগুলি লিখবেন। নরওয়েতে যেমন হয়। এক ধাক্কায় রাতারাতি হয়ত সবাই নতুন বানান লিখত না, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়, মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক বোর্ড, সরকার, সংবাদপত্র ও প্রকাশকেরা আগ্রহী হয়ে এ বানান গ্রহণ করলে কালক্রমে সকলেই নতুন প্রতিবর্ণীকরণ গ্রহণে সম্মত হত। কিন্তু এরকম কোনো আকাদেমি পশ্চিম বাংলায় তৈরি হলেও তার কতটা গ্রাহ্যতা জন্মাত তাতে সন্দেহ আছে। তার সুপারিশের ক্ষমতা হয়ত স্বীকার করে নিত সবাই, কিন্তু বানান enforce করে চাপিয়ে দেওয়া তার পক্ষে সম্ভব হত কি ? বামপন্থী সরকার আকাদেমি করলে অবামপন্থী সংবাদপত্র, রাজনৈতিক দল বা প্রকাশক তার বিধান অস্বীকার বা অগ্রাহ্য করবে, নেহাৎ রাজনৈতিক কারণেই করবে —এই লেখকের এমন সংশয় আছে। সুতরাং আকাদেমি বিশেষ কার্যকর হত না[৬]। আর আরেকটা কারণ—বাংলাদেশ নামে পৃথক স্বাধীন রাষ্ট্রে যে বিপুল-সংখ্যক মানুষ বাংলা ভাষা লেখেন, তাঁরা কি মেনে নিতেন এসব প্রস্তাব ?

ধরা যাক, সবাই মেনে নিলেন প্রস্তাবগুলি। মূল উচ্চারণ অনুযায়ী নতুন প্রতিবর্ণীকরণের নীতি গৃহীত হয়ে গেল। তখনও কিছু সমস্যা থেকে যাবেই। আমাদের এ পর্যন্ত মুদ্রিত সাহিত্যে যে পুরানো প্রতিবর্ণীকরণ রয়ে গেল, তার কী ব্যবস্থা হবে ? রবীন্দ্রনাথ যেখানে 'অ্যাপোলো' লিখেছেন সেখানটায় পরের সংস্করণে আমরা কি আপোল্লো (ন্) করে দেব ? ক্লাসিকের গায়ে ওরকম বিকৃতি সাধনের অধিকার কি আমাদের আছে ? তার চেয়ে মনে হয় এই আপোশরফা করে নেওয়া ভাল যে, আগে যাই লেখা হয়ে থাকুক, এখন আমরা মূল উচ্চারণ অনুসরণ করে লিপ্যন্তর করব, আর ইংরেজের মুখে ঝাল খাব না। কোনো একটা তারিখ চিহ্নিত করে সেই বানান পরিবর্তন শুরু করা যেতে পারে। কিছুদিন পাশাপাশি দুটি শব্দই ব্যবহার করতে হবে 'আপোল্লো (অ্যাপোলো)' এই সমীকরণ দেখিয়ে, তারপর আমাদের লেখা থেকে 'অ্যাপোলো' রূপটিকে বিদায় দিলেই হবে। এই ধাপে ধাপে বদলও অবশ্য কল্পনা করা যত সহজ, কার্যকর করা ততই কঠিন।

৪

বাংলাভাষায় ইতিহাসের দিক থেকেও একটা সমস্যা তৈরি হয়েছে প্রতিবর্ণী-করণের। অনেকেই লক্ষ করেছেন যে, আমরা একই শব্দের একরকম বাংলা রূপ ব্যবহার করছি না, আগে একধরনের বানান লিখেছি তো এখন আরেক ধরনের বানান লিখছি। উনবিংশ শতাব্দীতে যে কথাটা 'কালিজ' বা 'কালেজ' লেখা হত, এখন আমরা সেটা লিখি 'কলেজ'। যা ছিল 'হৌস'

'গৌন' তা এখন আমাদের হাতে হাউস / হাউজ (house), গাউন (gown)। আগে লিখতাম 'কপ্', ক্লব, বস, সর' এখন লিখি 'কাপ' (cup), 'ক্লাব' (club), 'বাস' (bus), 'সার' (sir)। আগে লিখতাম 'পর্মকিন' 'ডর্বি' এখন লিখি 'পার্মাকিন' 'ডার্বি'। এই রকম আরো কিছু শব্দের উদাহরণ :

বিদেশী / ইংরেজি শব্দ	আগেকার বাংলা রূপ	এখনকার রূপ
Town	টৌন	টাউন
Council	কৌন্সিল	কাউন্সিল
Virgil	বর্জিল	ভার্জিল
Forum	ফোরুম	ফোরাম
Lecture	লেকচর	লেকচার
Campbell	কাম্বেল	ক্যাম্বেল
Parliament	পার্লিমেণ্ট	পার্লামেণ্ট
Alexander	আলেকজণ্ডর	আলেকজাণ্ডার
Herbert	হর্বর্ট	হার্বার্ট
Hume	হ্যুম	হিউম
Kant	কান্ত	কাণ্ট
Miranda	মিরন্দা	মিরাণ্ডা
Governor	গবর্ণর	গভর্নর
Samson	সামসন	স্যামসন
Educated	এজুকেটেড	এডুকেটেড

এই তালিকাটি বাড়িয়ে লাভ নেই। হয়তো বাঙালির মুখের ভাষার উচ্চারণে পরিবর্তন ঘটেছে ; হয়ত কোথাও spelling pronunciation, কোথাও মৌলিক উচ্চারণের টানাপোড়েনে আজকের এই আকৃতি তৈরি হয়েছে শব্দগুলির। কিন্তু এর ফলে উনবিংশ শতাব্দীর বা পুরানো প্রতিবর্ণীকরণের রীতিনীতির সঙ্গে আমাদের বর্তমান রীতিনীতির পার্থক্য তৈরি হয়েছে, ফলে আমাদের অভিধানে (অর্থাৎ সম্ভাব্য লিখিত ভাষার অভিধানে) একই বিদেশী শব্দের দুরকম (বা তিনরকম) চেহারা তৈরি হয়েছে—শুধু আমাদের বানান-অভ্যাসের বিবর্তনের জন্য।

কিন্তু এ সমস্যা যে আমাদের জ্ঞানলাভ বা শিক্ষার ক্ষেত্রে কোনো বড় প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করেনি, তার কারণ হল—এরকম পরিবর্তনের জন্য অনেক ক্ষেত্রেই আমরা তৈরি থাকি। অলংকারের ডিজাইন বদলায়, জামাকাপড়ের চেহারা বদলায়। শিল্প সাহিত্য সবই বদলায় এবং ভাষাও বদলায়। এই

সার্বিক পরিবর্তনের অংগ হিসাবেই আমরা প্রতিবর্ণীকরণের এই পরিবর্তনকেও মেনে নিয়েছি।

এর মধ্যেই হয়ত বানান-বিধাতাদের প্রতি ইংগিত নিহিত আছে। যদি তাঁরা সাহস করে পরিবর্তিত বানান সুপারিশ করতে পারেন এবং তা অধিকাংশকে দিয়ে গ্রহণ করাতে পারেন তাহলে প্রাচীন বানান তার প্রাচীনত্ব রক্ষা করে আগের বইপত্রগুলিতে অক্ষয় হয়ে থাকলেও নতুন বানান নতুন লেখাপত্রে চালু হয়ে যেতে পারে। এ বানান হবে মূলের উচ্চারণের যথাসম্ভব অনুগামী।

কিন্তু তাতে আবার অন্য একধরনের সংকট দেখা দেবে। ইংরেজি শব্দ আর বাংলা শব্দে তখন মিল থাকবে না। ইংরেজি পড়া বাঙালি ছাত্র প্রতি ক্ষেত্রেই সিসেরো আর কিকেরো (বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন 'কিকিরো') ধরনের পার্থক্য নিয়ে একটু ধাঁধায় পড়বে। তবে যদি ধরে নিই ভাষাটা বাংলা এবং আমার এই ভাষাটায় একটা ন্যায্য বানান রীতি গড়ে তোলার স্বাধীনতা আছে, তাহলে অন্য কোনো ভাষার মুখে তাকিয়ে সে স্বাধীনতা কি আমরা সংকুচিত করব? অন্য ভাষার ওই পরশাসন কি আমরা মেনে নেব?

তার পরেও আর একটা প্রশ্ন থেকে যাবে। প্রতিবর্ণীকরণের নতুন নিয়ম ও প্রস্তাবিত নতুন বানান সকলকে দিয়ে গ্রহণ করানো সম্ভব হবে তো? মনে রাখতে হবে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৩৬ সালের সুপারিশ এখনও অধিকাংশ বাঙালির অজ্ঞাত। খবরের কাগজে, ছাপার বইয়ে ব্যাপকভাবে প্রচলন সত্ত্বেও অধিকাংশ বাঙালি পুরানো বানান লিখে চলেছে, তা আমরা অন্যত্র দেখিয়েছি। কাজেই নতুন লিপ্যন্তর নীতিও এমন শম্বুক প্রগতি লাভ করবে কিনা সেটা আরেকটা প্রশ্ন।

৫

অর্থাৎ সমস্যার কেন্দ্রে গিয়ে পৌঁছোলে আমরা লক্ষ করি—মূলত তিনটি বিকল্পের টানাপোড়েনে আমাদের প্রতিবর্ণীকরণ নীতি আন্দোলিত হয়েছে। ইংরেজির (যেখানে ইংরেজি মূল ভাষা নয়) উচ্চারণের বাংলা রূপ দেব? মূল ভাষার উচ্চারণের বাংলা রূপ দেব (ইংরেজি যদি মূল ভাষা হয় তার ক্ষেত্রেও একই প্রশ্ন)? নাকি বাংলার স্বাভাবিক উচ্চারণ যেসব ক্ষেত্রে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করছে সেখানে সেই স্বাভাবিক উচ্চারণকে গ্রহণ করব? এসব প্রশ্ন গুরুত্ব পায় তখনই যখন দেখি উত্তর ভারতের বানান-পদ্ধতির অনুবাদ করে আমজাদ খাঁকে অমজদ বা অমজাদ খাঁ লেখা হচ্ছে। এই নীতি ব্যাপকভাবে গ্রহণ করলে আকবর 'অকবর' হবেন, আজগুবি হবে

'আজগৈবি' আঞ্জুমান হবে 'অঞ্জুমন', আকছার হবে 'অকসর', ওস্তাদ হবে 'উস্তাদ' বাহাদুর হবে 'বহাদুর'।

আমাদের সিদ্ধান্ত এই যে, বাংলা ভাষার উচ্চারণের স্বাভাবিক প্রবণতাকে স্বীকার করে প্রতিবর্ণীকরণ যথাক্রমে মূলের উচ্চারণ অনুযায়ীই করা উচিত। ইংরেজি ভাষার মধ্যস্থতা আমরা এতদিন স্বীকার করে নিয়েছি, ইংরেজি অবশ্যই ব্যাপকভাবে ব্যবহার করব আমরা। কিন্তু বানানে তার শাসন এখন অতটা স্বীকার করার দরকার নেই। বানান-সংস্কার সমিতির প্রতিবর্ণীকরণের দিকেও নীতিনির্ধারণ করে দেওয়া উচিত, মূলত বাঙালির উচ্চারণের স্বভাব, বাংলা ভাষার ধ্বনিতত্ত্ব ও মূল উচ্চারণের দিকে দৃষ্টি রেখে।

৬

বাংলায় প্রতিবর্ণীকরণের একটি লিপিগত সমস্যাও আছে। এ সমস্যা যথার্থ ধ্বনি প্রতিফলনের অসামর্থ্য, কিংবা ইংরেজি ও মূল ভাষার উচ্চারণের পার্থক্যজনিত দুটি সমস্যা থেকে একটু আলাদা। প্রশ্ন হল, ইংরেজি বা ইয়োরোপীয় শব্দ আমরা যখন লিপ্যন্তর করব, তখন তাদের পাশাপাশি ব্যঞ্জন লেখার জন্য আমরা যুক্তব্যঞ্জন ব্যবহার করব, না আলাদা আলাদা করে লিখব ব্যঞ্জনদুটিকে? 'অক্টোবর' লিখব, না 'অকটোবর'? 'লর্ড' লিখব না 'লর্‌ড'? 'লণ্ডন' লিখব, না 'লনডন'? বছর কুড়ি আগে আনন্দবাজার পত্রিকাতে মূলত বিদেশী শব্দের যুক্তব্যঞ্জন ভাঙা শুরু হয়, এবং সে প্রসঙ্গে অমিতাভ চৌধুরী ও সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের বিতর্কের স্মৃতি নিশ্চয়ই অনেকের মনে জেগে আছে।

এখানে মনে রাখতে হবে, যাঁরা যুক্তব্যঞ্জন ভাঙার পক্ষপাতী, তাঁরা তৎসম শব্দের যুক্তব্যঞ্জনে হাত দেননি, ফলে যুক্তব্যঞ্জনকে লিপি থেকে উচ্ছেদ করার সামগ্রিক লক্ষ্য তাঁদের ছিল না। তাঁরা কেবল বিদেশী বা বহিরাগত শব্দেই যুক্তব্যঞ্জন বর্জন করতে চেয়েছিলেন।

কিন্তু সেখানেও সমস্ত যুক্তব্যঞ্জন উৎখাত করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয়-নি। প্রথমত, শব্দের আদ্য অর্থাৎ গোড়াকার যুক্তব্যঞ্জন তাঁরা ভাঙতে পারেননি, 'স্টার' কে 'স্‌টার' লেখা তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। দ্বিতীয়ত, শব্দের মধ্যিখানেও বা শেষে 'স্ট'-কে ভাঙা সম্ভব হয়নি। 'আগস্ট' বা অগাস্ট-এর রূপ 'আগস্‌ট' করা কঠিন হয়েছে। অর্থাৎ তাঁদের পদ্ধতির মধ্যে 'স্ট' একটি ব্যাঘাত সৃষ্টি করেছে ওই সরলীকরণে।

শব্দের গোড়ায় যে-কোনো যুক্তব্যঞ্জনই ভাঙা দুষ্কর। র-ফলা, ল-ফলা,

দন্ত্য-স'র সঙ্গে কোনো ব্যঞ্জন—এগুলি অটল বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে ওই অবস্থানে, ওগুলিকে ভাঙলে বাংলা লিপির চরিত্র অনেকটাই বিঘ্নিত হয়। ফলে 'প্‌রাইভেট' 'ফ্‌লাওয়ার', 'স্‌টেনগান' 'স্‌কুটার'—এ ধরনের প্রতিবর্ণীকরণ অদূর ভবিষ্যতে হবে বলে মনে হয় না। গোড়ায় তিনটি ব্যঞ্জনের যুক্তব্যঞ্জন থাকলেও—যেখানে তৃতীয় ব্যঞ্জনটি 'র্‌' হওয়ার কথা—'র-ফলা' তুলে দেওয়া দুঃসাধ্য হবে। 'স্ট্রাইক'-কে 'স্‌ট্‌রাইক' করার কথা এখনই কেউ ভাবছেন কি না জানি না।

র-ফলাকে নিয়ে শব্দের মাঝখানেও সমস্যা আছে। যেমন সমস্যা আছে রেফ-কে নিয়ে। 'শর্ট' 'কোর্ট'-কে অনেকে 'শর্‌ট' 'কোর্‌ট' করেছেন, 'মার্টিন' 'মার্কিন' 'মারটিন' 'মারকিন' হয়েছে, কিন্তু যদি হয় বার্ট্রাম ? বা বার্ট্রান্ড ? তখন কি লেখা যাবে 'বারটরাম' বা 'বারটরানড' ? পর্টুগাল পরটুগাল হয়েছে, কিন্তু পোর্ট্রেট কি সহজেই হবে 'পোরটরেট' ? 'লন্ডন' 'লনডন' হতে পারল, কিন্তু 'সাউন্ড' খুব সহজে 'সাউনড' হতে পেরেছে কি ? এখানে মনে হয় সিলেবলে দুটি ব্যঞ্জনের অবস্থান এ সম্বন্ধে সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করে। সেটি একটু বুঝিয়ে বলি।

সাধারণভাবে সিলেবলের তিনটি অংশ —অনসেট, পীক, আর কোডা। পীক (peak) হল ভিতরের অংশ, মূলত স্বরধ্বনি, যা না থাকলে সিলেবল সিলেবলই হয় না। অনসেট আর কোডা হল দুপ্রান্তের দুই অংশ, এ দুটি অংশ সাধারণভাবে ব্যঞ্জন বা ব্যঞ্জন জাতীয় ধ্বনি দিয়ে তৈরি হয়। C যদি ব্যঞ্জন আর V যদি স্বর হয় তাহলে CVC সংগঠনের প্রথম C হল অনসেট, V হল পীক এবং শেষ C হবে কোডা।

অনসেট বা কোডাতে একাধিক ব্যঞ্জন থাকতে পারে। অনসেট অংশে 'প্রাণ'-এ আছে দুটি ব্যঞ্জন, 'স্ত্রী'-তে একই জায়গায় আছে তিনটি ব্যঞ্জন। 'অ্যাক্‌ট'-এ আবার কোডাতে দুটি ব্যঞ্জন আছে। অন্যদিকে 'আব্রাহাম'-এর 'ব্র' কিন্তু একটি সিলেবলের অন্‌সেট বা কোডার অন্তর্গত নয়, তার 'ব্‌' এক সিলেবলের কোডা, 'র্‌' তার পরের সিলেবলের অনসেট। দুটি সিলেবলে ভাগ ভাগ হয়ে অবস্থান করছে ব্‌ আর র্‌—তাই কি এদের ভাগ করে লেখা সহজ ? যে জন্য 'লন্ডন'-কে 'লনডন' করা সহজ—'হাউন্ড'-কে 'হাউনড' করার চেয়ে সহজ ?

জানি না, যাঁরা যুক্তব্যঞ্জন ভাঙার কথা ভেবেছিলেন তাঁরা এসব কথা বিবেচনা করেছিলেন কি না। কিন্তু যে-সব কাগজে যুক্তব্যঞ্জন ভাঙার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল সেগুলিতেই যখন 'বাল্‌ব'-এর জায়গায় 'বাল্ব'-এর মতো কুশ্রী বানান দেখা যায়, তখন একটু পীড়িত বোধ করি। বাঙালির লেখার সঙ্গে তার উচ্চারণের যে-সম্পর্ক তৈরি হয়েছে তাতে ব-ফলা

সাধারণভাবে এবং ন্ব, ল্ব, বিশেষভাবে, আগের ব্যঞ্জনটির দ্বিত্ব বোঝায়। 'মন্বাদি' এ জন্য 'মন্নাদি', 'বিল্ব' 'বিল্ল'। সে জায়গায় 'বাল্ব' দেখলে 'বাল্ল' পড়ার প্রাথমিক ঝোঁক সংবরণ করা খুব সহজসাধ্য নয়। ওটিতে প্রথাগত 'বাল্‌ব' লিখলে ক্ষতি কী ?

৭ নীতিনিয়ম

এর আগে আমরা বাংলায় বিদেশী শব্দের প্রতিবর্ণীকরণ প্রসঙ্গে যে তিনটি প্রশ্ন তুলেছি। সেগুলি এই : এক, আমরা কি বিদেশী শব্দের ইংরেজির মধ্যস্থতায় পাওয়া উচ্চারণ মেনে নেব ? দুই, আমরা কি বিদেশী শব্দের মূল উচ্চারণ জেনে বাংলায় তা লেখার চেষ্টা করব ? এবং তিন, বাংলা ভাষার স্বাভাবিক উচ্চরাণ ও ধ্বনিতত্ত্ব মেনে নিয়ে মূল উচ্চারণ ও বাংলা প্রতিবর্ণীকরণে একটা আপোশরফা তৈরি করব ? এই লেখকের আসক্তি তৃতীয় বিকল্পের দিকে, এবং সেই অনুযায়ীই আমরা এ-প্রবন্ধে প্রতিবর্ণীকরণের কয়েকটি মূল নীতি নির্দেশ করতে চাই। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রবর্তিত বাংলা বানানের নিয়মের[৭] ১৩ থেকে ২২ পর্যন্ত সূত্রগুলিকে ভিত্তি করে আমাদের আলোচনা অগ্রসর হবে। এই সূত্রগুলি সংক্ষেপ এই :

১৩. বিবৃত অ (cut-এর u)—মূল শব্দে যদি বিবৃত অ থাকে তবে বাংলা বানানের প্রথম অক্ষরে আ-কার এবং মধ্য অক্ষরে অ-কার বিধেয়, যেমন 'ক্লাব, বাস, বাল্‌ব, সার', কিন্তু 'রেডিয়ম, সার্কস, ফোকস, ফসফরস, হিরোডটস'[৮]।

১৪. বক্র আ (বা বিকৃত এ। cat এর a)—মূল শব্দে বক্র আ থাকলে বাংলায় আদিতে অ্যা এবং মধ্যে ্যা বিধেয়। যেমন 'অ্যাসিড, হ্যাট'।

১৫. ঈ, ঊ —মূল শব্দের উচ্চারণে দীর্ঘ ঈ বা দীর্ঘ ঊ থাকলে বাংলা বানানে ঈ ঊ বিধেয়, যেমন 'সীল (seal), ঈস্ট (east), ঊস্টার (Worcester), স্পূল (spool)'।

১৬. f, v

f ও v স্থানে যথাক্রমে ফ ভ বিধেয়, 'ফুট (foot) ভোট (vote)'। যদি মূল শব্দে v-এর উচ্চারণ f-তুল্য হয়, তবে বাংলা বানানে ফ হবে, যথা 'ফন' (von)।

১৭. w

w স্থানে প্রচলিত রীতি অনুসারে উ বা ও বিধেয়, যেমন উইলসন (Wilson), উড (wood), ওয়ে (way)।

১৮. য়

নবাগত বিদেশী শব্দে অনর্থক য় প্রয়োগ বর্জনীয়। 'মেয়র, চেয়ার, রেডিয়ম, সোয়েটর' প্রভৃতি বানান চলতে পারে, কারণ য় লিখলেও উচ্চারণ বিকৃত হয় না। কিন্তু উ-কার বা ও-কারের পর অকারণে য়, য়া, য়ো লেখা অনুচিত। 'এডোয়ার্ড', ওয়ার-বন্ড' না লিখে 'এডওআর্ড', ওঅর-বন্ড' লেখা উচিত। 'হার্ড-ওয়ার (hardware)' বানানে দোষ নেই।

১৯. s, sh

(এখানে ১০-সংখ্যক নিয়ম দেখতে বলা হয়েছে। ১০-সংখ্যক নিয়ম হল—) বিদেশী শব্দের মূল উচ্চারণ অনুসারে s স্থানে স, sh স্থানে শ হবে, যথা 'আসল, ক্লাস, খাস, জিনিস, পুলিস, পেনসিল, মসলা, মাসুল, সবুজ, সাদা, সিমেন্ট ; খুশি, চশমা, তক্তাপোশ, পশম,·· শার্ট, শেক্‌স্পিয়র। তবে ব্যতিক্রম হবে এসব ক্ষেত্রে—'ইস্তাহার (ইশ্‌তিহার), গোমস্তা (গুমাশ্‌তাহ), ভিস্তি (বিহিশ্‌তী), খ্রীষ্ট (Christ)'।

বিদেশী s ধ্বনির জন্য বাংলায় ছ অক্ষর বর্জনীয়। তবে প্রচলিত উচ্চারণের ছ বানানে প্রতিফলিত হয়ে থাকলে তা বদলাবার দরকার নেই—যেমন 'কেচ্ছা, ছয়লাপ, তছনছ, পছন্দ'।

২০. st

নবাগত বিদেশী শব্দে st স্থানে নতুন সংযুক্ত বর্ণ স্ট বিধেয়, যথা 'স্টোভ (stove)'।

২১. z স্থানে জ বা জ. বিধেয়[১]।

২২. হস্‌-চিহ্ন—(এখানেও ৪-সংখ্যক নিয়ম দেখতে বলা হয়েছে। সে নিয়ম এই—) প্রয়োজনক্ষেত্রে বিভ্রান্তি এড়ানোর জন্য হস্‌-চিহ্ন দিতে হবে, যেমন 'শাহ্‌, তখ্‌ত, জেম্‌স্‌ বন্ড্‌'। কিন্তু সুপ্রচলিত শব্দে না দিলে চলবে, যথা—'আর্ট', কর্ক', গভর্নমেন্ট, স্পঞ্জ'। "কেবল ভুলের সম্ভাবনা থাকিলে হস্‌-চিহ্ন বিধেয়।"

এই নিয়মগুলি দেখে বোঝা যায়, সমিতি মূল উচ্চারণের নীতিটিকেই প্রধানত গ্রহণ করেছেন, বলছেন যে, বাংলা বানানে মূল ভাষার উচ্চারণের প্রতিফলন ঘটাতে হবে। এ-নীতি আমাদের কাছে অসংগত মনে হয় না, বরং একে আমরা শর্তসাপেক্ষে সমর্থন করতে চাই।

কিন্তু যেখানে এ-নিয়মের তালিকাটির ভয়াবহ অসম্পূর্ণতা তা এই—এখানে বলা নেই ইংরেজি উচ্চারণকে মূল উচ্চারণ বলে গ্রহণ করব আমরা, না ইংরেজি উচ্চারণকে সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে মূল ভাষায়,—লাতিনে, গ্রিকে,

ইতালীয়তে, পোলিশে, রুশে, তাগালগে বা হিব্রুতে—যে-উচ্চারণ আছে সেটাই আমরা আমাদের বানানে গ্রহণ করব। অর্থাৎ এঁদের মূল উচ্চারণ কতদূর পর্যন্ত ব্যাপ্ত আমরা জানি না। এঁদের প্রায় সমস্ত উদাহরণ ইংরেজি থেকে, একমাত্র 'ফন্' (von) ছাড়া।

দ্বিতীয়ত, মূলের উপর জোর দিতে গিয়ে এই সমিতি কোথাও-কোথাও একটু বাড়াবাড়িও করেছেন। অর্থাৎ বাংলা উচ্চারণের স্বাভাবিক প্রবণতাকে অগ্রাহ্য করেছেন। ১৩-সংখ্যক নিয়মে শব্দের অনাদ্য (non-initial) সিলেবলে বিবৃত অ-কার বজায় রাখার বিধান দিয়ে এঁরা 'রেডিয়ম' 'ফসফরস' 'হিরোডটস' ইত্যাদি বানান নির্ধারণ করেছেন। এই বানানে দুদিক থেকে আমাদের আপত্তি আছে। প্রথমত এই বানান বাঙালির উচ্চারণে মূল ভাষার উচ্চারণকে হুবহু প্রতিবিম্বিত করবে এমন আশা করা সম্ভব নয়। বরং বাঙালি যা উচ্চারণ করবে (সংবৃত অ, বা ও), তার সঙ্গে মূলের বিবৃত অ-এর পার্থক্য কম নয়। দ্বিতীয়ত, এই জায়গায় বাঙালি স্বাভাবিকভাবেই আ উচ্চারণ করে। সাধারণ বাঙালি স্বর্গত অহীন্দ্র চৌধুরীর মতো করে জনশ্রুতিখ্যাত 'ফোকা—স!' না বলুক, সে দ্বিতীয় অক্ষরে আ উচ্চারণ করে। সেটি উপেক্ষা করার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না, কারণ আগের বানান এবং এই বানান—কোনোটিতেই মূলের উচ্চারণ হুবহু প্রতিফলিত হচ্ছে না। কিন্তু আ-কার দেওয়া বানানের পক্ষে যুক্তি এই যে, বাঙালির মুখের স্বাভাবিক ও অভ্যস্ত প্রবণতার সঙ্গে এই বানানের একটি সাম্য তৈরি হয়, ফলে বানানটি তার কলমে সহজে এসে পড়ে। একথা যে কতদূর সত্য তার প্রমাণ পাই বাঙালির বানান-ব্যবহারে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সুপারিশ-করা 'সার্কস (circus), ফোকস (focus), রেডিয়ম ফসফরস' ইত্যাদির বদলে 'সার্কাস ফোকাস রেডিয়াম ফসফরাস' আমরা এত প্রচুর পরিমাণে বেশি পাই যে, ওই নিয়ম পঞ্চাশ বৎসর ধরে অরণ্যে রোদনের মহিমা লাভ করেছে মাত্র।

মাত্র দু-একটি ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের ওই সমিতি বাংলা উচ্চারণের মাহাত্ম্য স্বীকার করেছেন বানানে, সেটি ১৯ নম্বর সূত্রের ভিস্তি, গোমস্তা ইত্যাদি শব্দের বানানে। মনে রাখতে হবে এগুলি ঠিক নবাগত বিদেশী শব্দ নয়, আর খ্রীষ্টও মোটামুটি বাংলা শব্দ।

৮

এই তালিকা অসম্পূর্ণ ও অংশত অসংগত, কাজেই প্রতিবর্ণীকরণের বিস্তৃত নতুন বিধান-রচনার প্রয়োজন আছে। এই বিধান যেসব ভাষার

শব্দ বাংলায় প্রতিবর্ণীকৃত হবে তার প্রত্যেকটির ধ্বনি-সম্ভার বিষয়ে সম্যক ধারণার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠবে—এমন প্রত্যাশা করা যেতে পারে, কিন্তু আমাদের ভাষাজ্ঞানের বর্তমান অবস্থায় তা খানিকটা অলীক হবে। বরং সাধারণভাবে কিছু নিয়ম করা যায়, বিশেষত যেসব ভাষার শব্দ বাংলায় আমাদের প্রায়ই লিপ্যন্তর করে ব্যবহার করতে হয় সেগুলি সম্বন্ধে। এক্ষেত্রে প্রতিটি ধ্বনি বা ধ্বনিগুচ্ছ ধরে ধরে বাংলায় তার প্রতিবর্ণ নির্ধারণ করে দেওয়া উচিত। কিন্তু যদি কোনো ধ্বনির উচ্চারণ বাংলায় না থাকে এবং বাঙালির জিহ্বায় তা দুরুচ্চার্য হয়, তবে তাকে সরল করে নেওয়াই উচিত। ফরাসি u বর্ণটিতে যে ধ্বনি বোঝায় তার উচ্চারণে ঠোঁট দুটি উ বলার মতো ছুঁচলো রেখে 'ই' বলতে হয়। তারজন্য জিভের আগা সামনের দিকে এগিয়ে আসে এবং খানিকটা উপরে উঠে থাকে। উচ্চারণের এই কশরৎ চালাতে বাঙালিকে বাধ্য করার কোনো যুক্তি নেই, ফলে বাংলায় ফরাসি sur 'উপরে' কথাটির রূপ 'সুর' লেখাই যথেষ্ট—যেমন 'সুর-রিয়া-লিজম', তেমনি ফরাসি বা জার্মান সম্মুখবর্তী 'ও' ধ্বনিকে বাংলায় 'ওয়ে' লেখাই সংগত। Fröbel 'ফ্রোয়েবেল' হলে ক্ষতি নেই, Müller 'মুয়েলার' দিব্যি হতে পারে। গত শতাব্দীতে মূলর (মোক্ষমূলর) লেখা হত, এখন আমরা ম্যাক্সমূলার লিখি। ইংরেজিতেও এরকম ভেঙে লেখা নিয়মসংগত রূপে গৃহীত হচ্ছে।

এখানে প্রচলিত বাংলা বর্ণমালার একটা সুবিধার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করি। আমাদের উচ্চারিত ধ্বনিসম্ভারের যথাযথ প্রতিফলন নয় এই বর্ণ-মালা, সেকথা প্রায় সর্বস্বীকৃত। সেইজন্য কেউ-কেউ এ-থেকে অবান্তর বর্ণ ও বর্ণের বিকল্প চিহ্নগুলিকে বর্জন করার প্রস্তাব করেছেন—তার ইতিহাস বেশ দীর্ঘ। এইসব প্রস্তাব মানলে বাংলা বর্ণমালা থেকে ঈ—ী, ঊ—ূ, ঋ—ৃ, ঐ—ৈ, ঔ—ৌ ; ঞ, ণ, য, ষ, স, ং, ৎ ইত্যাদি বাদ দিতে হয়। কোনো কোনো দিক থেকে এঁদের দাবি যুক্তিহীন নয়। কিন্তু একটি ভাষার নিজস্ব ধ্বনির জন্য ছিমছাম, অবান্তর চিহ্নবর্জিত বর্ণমালা যতই কাম্য হোক, প্রতিবর্ণীকরণের বেলায় অতিরিক্ত চিহ্নই বেশি কাজে লাগে। বাংলা বর্ণমালার ক্ষেত্রেও কিছু চিহ্ন আছে যা প্রতিবর্ণীকরণে অপরিহার্য, যেমন দীর্ঘস্বরের চিহ্ন। আবার কিছু অভাবও আছে। যাই হোক, এবার আমরা ধ্বনি ধরে ধরে তার বাংলা প্রতিরূপ প্রস্তাব করব। এ খুবই প্রাথমিক প্রয়াস, এবং একার অধিকারে বিদেশী ধ্বনির সঙ্গে বাংলা ধ্বনির সমস্ত সম্পর্ক (correspondence) স্থাপন করা সম্ভবও নয়। তবু নেহাৎ প্রাথমিক আভাস হিসাবেই আমরা ওই প্রতিরূপতা এখানে খাড়া করছি।

স্বরবর্ণের প্রতিবর্ণীকরণ

১. হ্রস্ব অ বা কেন্দ্রীয় অ [ə]। ভারতীয় ভাষার হলে অ বা শুধু ব্যঞ্জন (+ ɸ) দিয়ে লেখা চলবে। যেমন হিন্দি থেকে ঘর, ধর্‌না। কিন্তু বাংলায় স্বাভাবিক উচ্চারণে যদি আ এসে যায় সেখানে তা বজায় রাখতে হবে যেমন আকবর, আমজাদ, আশরফি। আরবি 'আলিফ' চিহ্নের প্রতিবর্ণ নতুন শব্দের বেলায় অ দিয়ে করা যেতে পারে, কিন্তু পুরানো শব্দে যেখানে আ এসে গেছে, যেমন (ফারসি) 'বাবা' 'নানা'—সেখানে আ-কারই থাকবে। ইংরেজি Peter-এর দ্বিতীয় অক্ষরে ওই হ্রস্ব অ আছে, কিন্তু বাংলায় তাকে আ-কার দিয়ে 'পিটার'ই লিখতে হবে। ইংরেজি about-এর 'a' হ্রস্ব অ হলেও বাংলা উচ্চারণ মেনে তার বর্ণরূপ দাঁড়াবে 'অ্যা'।

২. a যেখানে আ ধ্বনি বোঝায়, তা সর্বত্রই আ বা আ-কার দিয়ে লিখতে বাংলায় কোনো অসুবিধে নেই। ফরাসি, রুশ, জার্মান, স্প্যানিশ, ইতালীয়, লাতিন, গ্রিক a-র এই উচ্চারণই ধরতে হবে। ইংরেজি u যেখানে ওই বিবৃত অ বোঝায়, সেখানে শব্দের প্রথমে হোক, মধ্যে হোক (বা শেষে হোক)—তাকে আ বা আ-কার দিয়ে লেখাই সংগত। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের সুপারিশ-করা সার্কস, ফোকস, রেডিয়ম আমরা সমর্থন করি না। আবার যেখানে a এ জাতীয় ধ্বনি, যেমন take, mate-এ সেখানে এ লেখাই যথেষ্ট Kate-কে 'কেইট্' লেখার দরকার নেই।

৩. ইংরেজি o-কে ও লেখাই বাঞ্ছনীয়, মূলের ঔ উচ্চারণ ধরে go-কে 'গৌ' association-কে 'অ্যাসৌসিয়েশন' লেখার দরকার নেই।

৪. 'অ্যা' বা এইজাতীয় ধ্বনি (ইংরেজি man-এর a, কিংবা ফারসি bete-এর প্রথম e) বাংলায় শব্দের প্রথমে অ্যা এবং পরে ব্যঞ্জনান্তে ্যা দিয়ে লিখতে হবে।

৫. ফরাসি জার্মান রুশ ইত্যাদি ভাষার জটিল[১০] স্বরধ্বনিগুলিকে বিশ্লিষ্ট করে বা সরল করে লেখা যেতে পারে। ফরাসি u বা জার্মান উমলাউটপ্রাপ্ত u-কে 'ue' করে বাংলায় 'উয়ে' লিখতে আপত্তির কিছু নেই। য-ফলা হ্রস্ব উ-কার দিয়েও লেখা যেতে পারে। সরলভবে উ-দিয়ে লিখলেও ক্ষতি নেই—তবে একটা নির্দিষ্ট বিকল্পই গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়। জার্মান লেখক (হাইনরিশ)

Böll-এর পদবী অংশ 'বোল', 'বোয়েল' বা 'ব্যোল'-এর যে-কোনো একভাবে লেখা যেতে পারে।

৬. দীর্ঘ স্বরধ্বনিতে বাংলায় কেবল ঈ আর ঊ-র চিহ্ন আছে। সাধারণের জন্য লেখা চালু বানানে এগুলি রাখা যেতেও পারে, নাও যেতে পারে। আমাদের মতে ইংরেজি ইত্যাদি ভাষার দীর্ঘ-স্বর[১১] বাংলায় বানানে প্রতিফলিত করার কোনো প্রয়োজন নেই —কারণ বাঙালির উচ্চারণে street স্ট্রীট নয়, স্ট্রিট ; seat সীট নয়, সিট। আর দীর্ঘ স্বরচিহ্ন দিলে মূলের ধ্বনিগত রূপটিও বিশ্বস্তভাবে ফুটে ওঠে না, কারণ মূলে spool-এর উচ্চারণ স্পূল নয়, [spuwl]।

কিন্তু লাতিন ও গ্রিক ভাষায় পরিষ্কার দীর্ঘ ঈ দীর্ঘ ঊ ইত্যাদি আছে, এমনকি গ্রিক ভাষায় দীর্ঘ এ বা ও-ও আছে। সেক্ষেত্রে কী হবে ?

আমাদের মতে যেখানে মূল উচ্চারণ নির্দেশ করা নিতান্তই দরকার—যেমন ভাষাতত্ত্ববিষয়ক আলোচনায়—কেবল সেখানেই দীর্ঘ স্বরচিহ্ন ব্যবহার করা যেতে পারে। সেখানে দীর্ঘ এ বোঝাতে 'এ—' বা েে এবং দীর্ঘ ও বোঝাতে [ও—] বা [ো—] চিহ্ন প্রয়োগ হতে পারে। কিন্তু এ কেবল বিশেষ-বিশেষ ক্ষেত্রে। অন্যত্র হ্রস্ব চিহ্ন ব্যবহারই বিধেয়।

৭. নানা ভাষার যুগ্মস্বরধ্বনি, যেমন লাতিনের æ (আয়্, আই্), œ (অয়, ওয়) ইত্যাদিকে নতুন শব্দে উচ্চারণ অনুযায়ী আনা যেতে পারে। কিন্তু প্রচলিত ও পরিচিত শব্দের ক্ষেত্রে কিছু ছাড় দিতেই হবে। ইস্থেটিক্স-এর প্রথম স্বরযুগ্মক মার্কিন ইংরেজিতে বর্জিত হয়েছে, তেমনি অ্যামিবা-র দ্বিতীয় স্বরযুগ্মক উচ্চারণে জাগিয়ে তোলা এখন নিরর্থক।

কোনো-কোনো ভাষায় পাশাপাশি দুটি বা তিনটি স্বরধ্বনি উচ্চারণে মূলত এক স্বরধ্বনি, যেমন ফরাসি ou হলো 'উ', au, eau হলো 'ও'।

জার্মান ei = আই যেমন zeit = ট্সাইট্। Weimer = ভাইমার। কিন্তু ie = ই। গ্রিক y মূলে দীর্ঘ 'ঊ জাতীয় ধ্বনি ছিল, এ ভাষায় শব্দের শেষ অক্ষরের u, অ দিয়ে লিখলে ক্ষতি নেই। Lyceum-এর মূল উচ্চারণ ছিল 'লূকেয়ম'-জাতীয়। কিন্তু খুব পরিচিত শব্দগুলির মৌলিক উচ্চারণ খুঁড়ে বার না করাই ভালো।

ব্যঞ্জনবর্ণ

৮. আরবি 'খে' বা 'গায়েন'-এর ধ্বনি বাংলায় খ বা গ দিয়েই প্রকাশ করতে হবে। জার্মান ch যেখানে উষ্ম x, অর্থাৎ গলা খাঁকারি দেওয়া খ-এর মতো, সেখানে খ লেখা যাবে; আবার যেখানে ই, এ ইত্যাদি সম্মুখ স্বরের প্রতিবেশে, শ-এর মতো—সেখানে শ্ লিখলেই চলবে। Brecht সাধারণত ব্রেশ্‌ট। স্প্যানিশ ইতালীয়তে আবার ch সাধারণভাবে খ-এর মতো। এ দুটি ভাষায় c শুদ্ধ চ, অধিকাংশ ক্ষেত্রে।

৯. ফরাসি বা ইতালীয় -gn- বোঝাতে ঞ ব্যবহার করা যেতে পারে, কিন্তু সেক্ষেত্রে এর তালব্য অনুনাসিক উচ্চারণ স্পষ্ট করে শিখে করতে হবে, কারণ বাংলায় সে উচ্চারণ নেই। Champangne 'শ্যাম্পেন' লেখা যেতে পারে, কিন্তু lasagna 'লাসানিয়া' বা 'লাসাঞা' লেখা চলে।

১০. ইংরেজি, জার্মান, সুইডিশ ইত্যাদির দন্তমূলীয় (alveolar) t, d-র ক্ষেত্রে বাংলা ট, ড-ই কাম্য, কিন্তু ফরাসি, ইতালীয়, স্প্যানিশ, পর্তুগীজ, রুশ, লাতিন, গ্রিক t, d-র ক্ষেত্রে ত, দ লেখাই বাঞ্ছনীয়। জাপানের রাজধানীর নাম প্রচলনকে স্বীকৃতি জানিয়ে 'টোকিও' লিখতে পারি, কিন্তু 'কিয়োতো', 'হানেদা' ইত্যাদি লেখাই উচিত।

১১. ইংরেজি f ও v-র বদলে বাংলা ফ ও ভ লেখার বিধান দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সেই সঙ্গে একথাও বলে দেওয়া উচিত যে, বাংলা ফ ও ভ-র ইংরেজি রূপ যেন f ও v না লেখা হয়, বরং ph ও bh লেখা উচিত। 'প্রফুল্ল Praphulla না লিখে কেন Prafulla লেখা হয় এবং Shobha না লিখে Shova, তা দুর্বোধ্য।

১২. S-এর জায়গায় স, sh-এর জায়গায় তালব্য শ বিধেয়। Z এবং Z (ফরাসি) বাংলায় বোঝানোর একমাত্র বর্ণ জ, কিন্তু এই বর্ণে ওই ধ্বনি দুটির উচ্চারণ আদৌ আসে না। জ-এর নিচে এক ফুটকি এবং দু ফুটকি দিয়ে যথাক্রমে এ ধ্বনি দুটি বোঝানো যেতে পারে। দেবনাগরীতে লেখায় তাই করা হয়। তবে তামিল বা মলয়ালম zh-এর বেলায় 'ড়' লেখা যেতে পারে। কেউ কেউ মূর্ধন্য ষ লেখেন, যেমন তাকাষি শিবশংকর পিল্লে। জার্মান ও

ইতালীয় Z সাধারণভাবে ট্স/ৎস দিয়ে লেখা উচিত, যেমন Nazi, নাট্সি, নাৎসি ; ইতালীয় pizza হবে পিৎজা।

১৩. ফরাসি আলজিভের (uvular) r 'র' দিয়েই লিখতে হবে। কেউ কেউ Rimbaud-কে লিখেছেন হ্র্যাবো, কিন্তু 'হ্র' ব্যবহার প্রয়োজন নেই।

১৪. v বর্ণটিতে ভ দিয়ে লেখা চালু হয়ে গেছে, এর এখন আর কোনো প্রতিবিধান নেই। কিন্তু গত শতাব্দীতে 'ব' দিয়ে লেখা খুবই ব্যাপক ছিলো, যেমন 'নবেল', 'বিক্টোরিয়া', 'সিবিল কোর্ট'। একটি কথা তো আমদের দৈনন্দিন ব্যবহারেই ঢুকে গেছে—বার্নিশ। পর্তুগিজ viola থেকে 'বেহালা'-কে এই শ্রেণীতে ধরব কিনা জানি না।

যাই হোক, এখন সাধাররণভাবে v-এর-জায়গায় ভ লেখাই চালু হয়ে গেছে। যেমন ভয়েল, ভলাণ্টিয়ায়, ভাইস, ভাউচার, ভিজিট, ভিটামিন, ভিপি, নভেল, লেভেল, হেভেন, টিভি। জার্মান w-র বদলেও এই ভ লেখা উচিত, যেমন 'ভাইমার' (Weimer) 'ভের্টের' (Werther)। এরজন্য 'হ্ব' লেখার রীতি কৃত্রিম বলে মনে হয়। ইংরেজি w স্হানে এখন আর ব লেখার দরকার নেই গত শতাব্দীর মতো, বরং উ, ও লিখলেই হবে।

১৫. স্প্যানিশ x-কে হ দিয়ে বোঝান যেতে পারে। কিন্তু পুরানো মেক্সিকো-কে 'মেহিকো' করার দরকার নেই। 'ডন কুইকজোট'-কে আজকাল অবশ্য কেউ কেউ মূল উচ্চারণ মেনে 'দোন কিহোতে / কিখোতে' লিখছেন। স্প্যানিশ j=হ, z কোথাও কোথাও থ্। Jimanez=হিমানেথ্।

যুক্তব্যঞ্জনবর্ণ

১৬. বিদেশী শব্দের উচ্চারিত যুক্তব্যঞ্জন সম্বন্ধে সাধারণ নিয়ম হওয়া উচিত এই যে, শব্দের প্রথমে যুক্তব্যঞ্জন অব্যাহত রাখা উচিত, শব্দের মাঝখানে তাকে ভাঙা যেতে পারে। কিন্তু শব্দের মাঝখানে র-ফলাযুক্ত যুক্তব্যঞ্জন বজায় রাখা দরকার হতে পারে—যেমন 'প্রোগ্রাম'-কে 'প্রোগরাম' করা অসুবিধাজনক হতে পারে। বা 'বার্ট্রাম'-কে 'বারটরাম'। st-ও স্ট হিসাবে সর্বত্র বজায় রাখাই ভালো, কী শব্দের শুরুতে, কী ভিতরে। তবে মাষ্টার, ইষ্টিশন, ইষ্টিমার ইত্যাদি শব্দ উচ্চারণে বাংলা হয়ে দাঁড়িয়েছে, যেমন

হয়েছে ইশকুল—সেখানে 'স্ট' 'স্ক' লেখার কোনো প্রয়োজন নেই। যুক্তব্যঞ্জন সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য মোটামুটি এই: যুক্তব্যঞ্জন লিখতে সুবিধা, আর এখন লাইনো, মনো বা ফটোটাইপে মুদ্রণেও তা কোনো বাধার সৃষ্টি করে না। কেবল টাইপরাইটারই যুক্তব্যঞ্জনকে সামাল দিতে পারে না। কাজেই বিদেশী শব্দের বানানে যুক্তব্যঞ্জন ভাঙার কোনো প্রবল যুক্তি নেই।

মোট কথা, বাংলা উচ্চারণের শর্ত বজায় রেখে বিদেশী শব্দের মূল উচ্চারণ ও প্রতিবর্ণীকরণে স্বীকার করা উচিত। এতে ব্যতিক্রম হিসাবে গণ্য করা যায় কেবল অতিপরিচিত ও বহুল-ব্যবহৃত শব্দগুলিতে—যেমন 'সিজার'। একে 'কায়জার' বা ওই ধরনের কিছু চেহারা দেবার দরকার নেই।

৭. বাংলা শব্দের ইংরেজি প্রতিবর্ণীকরণ

১

আগের অধ্যায়ে আমরা ইংরেজি বা বিদেশী শব্দের বাংলা লিপ্যন্তরের প্রসঙ্গ আলোচনা করেছি। সেখানে দেখিয়েছি যে, যে-সমস্ত বিদেশী ভাষার ধ্বনি হুবহু বাংলা ভাষায় নেই, সেগুলিকে বাংলায় নিকটতম ধ্বনি দিয়ে মুখে প্রকাশ করা যেমন স্বাভাবিক, তেমনই সেই বাংলা ধ্বনির নিজস্ব বর্ণরূপ দিয়ে লেখাও স্বাভাবিক। অযথা নোখ্‌তা বা ডায়াক্রিটিক চিহ্ন দিয়ে সাধারণের নিত্য ব্যবহার্য লেখাকে ভারাক্রান্ত করা ঠিক নয়। যিনি বিদেশী ভাষার অতিশয় শুদ্ধ উচ্চারণ চাইবেন তাঁকে সেই ভাষার অভিধান দেখতে হবে। ভাষাজিজ্ঞাসুর প্রয়োজন আর সাধারণের নিত্যনৈমিত্তিক প্রয়োজন এক নয়।

দ্বিতীয়ত, বিদেশী ভাষার মূল উচ্চারণ যথাসম্ভব বাংলায় উপরের শর্ত মেনে গ্রহণ করাই ভালো। ইংরেজির মধ্য দিয়ে আসা অতি প্রচলিত উচ্চারণগুলি বজায় রাখা চলে—যেমন 'নেপোলিয়ন'কে 'নাপোলিয়ঁ' করার এই মুহূর্তে প্রয়োজন নেই। কিন্তু নতুন শব্দ গ্রহণের সময় বাংলা উচ্চারণে একটা কাছাকাছি প্রতিধ্বনি খাড়া করে তার ধ্বনিসংগত বানান লেখাই ভালো।

বিদেশী শব্দের বাংলা রূপের কথা ছেড়ে আমরা যখন বাংলা শব্দের বিদেশী রূপের কথা ভাবি, তখন তার ইংরেজি রূপের কথাই আমাদের আগে মনে হয়। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, অন্যান্য লিপিতে বাংলা শব্দের প্রতিবর্ণীকরণের কোনো সমস্যা নেই। নিশ্চয়ই আছে। আরবি লিপিতে যখন বাংলা লিখতে যাই তখন তার সমস্যা এক রকম, রুশ বা গ্রিক লিপিতে যখন বাংলা লিখতে যাই, তখন তার সমস্যা আরেক রকম। প্রতিটি লিপির ক্ষেত্রে আলাদা-আলাদা-ভাবে সমস্যার সমাধান করতে হবে, এবং সেসব লিপির অক্ষর এবং বাংলা উচ্চারণের ধ্বনির মধ্যে একটা অন্যোন্যতার সম্পর্ক (correspondence) স্থাপন করতে হবে। এই সম্পর্ক স্থাপন যে সহজ নয় তা আমরা প্রতি ক্ষেত্রেই লক্ষ করব। এর একটাই কারণ, প্রতিটি ভাষায়

এমন কিছু ধ্বনি থাকে যা সাধারণভাবে সেই ভাষার নিজস্ব, তা অন্য ভাষায় থাকে না। যদি বা তার কাছাকাছি ধ্বনি অন্য ভাষার থাকে, অন্য ভাষার লিপিতে এই সব ধ্বনির লিপিরূপ আনা সহজ হয় না। ফলে সাধারণ ব্যবহারে খানিকটা সরলীকরণ করতেই হয়।

আমাদের এখানে ঐতিহাসিক কারণে ইংরেজি ব্যবহার বেশি, ফলে বাংলা শব্দের ইংরেজি প্রতিবর্ণীকরণের বিষয়েই আমরা প্রধানভাবে আলোচনা করব। আরবি কি অন্যান্য লিপিতে প্রতিবর্ণীকরণ বিষয়ে এই মুহূর্তে ততটা মনোযোগ দেব না।

২

বাংলা শব্দের ইংরেজি প্রতিবর্ণীকরণে এ পর্যন্ত যে রীতি মেনে আসা হয়েছে, তাতে একটি বিচিত্র ব্যাপার লক্ষ করি যে, একটিমাত্র বর্ণ বা প্রতীককে কখনো কখনো দুটি বা তারও বেশি ধ্বনির বাহন করা হয়েছে, যেমন a এই স্বরচিহ্নটি ইংরেজি প্রতিবর্ণীকরণে কখনো বাংলা 'অ' কখনো বাংলা 'ও' আবার কখনো বাংলা 'আ'। যেমন Rachana—এই নামটিতে। এর উচ্চারণ 'রচোনা'। তাই প্রথম 'a'-র উচ্চারণ পাচ্ছি অ, দ্বিতীয় a সংবৃত অ বা ও ধরনের, এবং তৃতীয় a পরিষ্কার আ। তাত্ত্বিক ভাবে, অর্থাৎ one sound, one symbol নীতি অনুযায়ী এটা একটু অসংগত হলেও, এরকম বানানেই আমরা অভ্যস্ত এবং আমরা ইংরেজিতে আমাদের নামের বানান পড়তে তত অসুবিধা বোধ করি না, ব্যাপারটায় অভ্যস্ত বলেই। বস্তুতপক্ষে আমরা যখন ওই বানান লিখি বা ব্যবহার করি, তখন আমাদের ওই তত্ত্বগত সংশয় মাথায় থাকে না। দীর্ঘদিনের অভ্যাসবশত আমরা তা সহজেই সঠিক উচ্চারণে পড়ি বা ব্যবহার করি। আমরা ওই তিনটি a-র তিনরকম উচ্চারণ বিষয়ে প্রশ্নও তুলি না। ধরে নিই, শব্দে তাদের অবস্থানগত তারতম্যে এরকম হতেই পারে।

এও ধরে নিই যে, আমাদের নাম যখন বিদেশীরা পড়ে তারাও, বাংলায় ওই তিনটে স্বরধ্বনি স্বরচরিত্রের দিক থেকে তিনরকম হওয়া সত্ত্বেও, সেটা পড়তে অসুবিধা বোধ করবে না, একছত্র বাংলা না জানলেও না। এরকম ধরে নেয় অতিশয় সরলমনা লোকে—এবং আসলে বিষয়টা ঠিক এই চেহারা নেয় না। বিদেশীরা হয় উচ্চারণ ভুল করে, না হয় ব্যবহার করতে করতে তারা কিছু সাধারণ নিয়ম আবিষ্কার করার চেষ্টা করে। যেমন তারা ভেবে নেয় যে, ভারতীয় শব্দের ইংরেজি রূপের শেষে 'a' থাকলে তা সব ক্ষেত্রেই 'আ' হবে এবং শব্দটি স্ত্রীলিঙ্গ হবে। এরকম একটি-দুটি কৌতুককর ঘটনা

এই লেখকের নজরে এসেছে। যেমন অনিন্দ্য নামটির 'Anindya' এই বানান দেখে, শেষের a ধ্বনিটিকে আ অর্থাৎ স্ত্রীলিঙ্গের প্রত্যয় ভেবে নিয়ে অনেক বিদেশী নামটিকে স্ত্রীলোকের নাম ধরে নিয়ে তার আগে Miss বা Ms. বসিয়ে চিঠি লিখেছেন। আমাদের প্রতিবর্ণীকরণের ক্ষেত্রে যদি বর্ণে বর্ণে নিখুঁত সম্পর্ক তৈরি করা সম্ভব হত ইংরেজি ও বাংলার মধ্যে, তাহলে বিদেশীদের এই বিভ্রান্তি ঘটত না।

কিন্তু বিদেশীরা ঠিক পড়ছে না ভুল পড়ছে, সেটা বড়ো বিবেচনা নয়। যে-সব সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে বিদেশীরা বাংলা শব্দের ইংরেজি (বা Anglo-Roman, ইঙ্গ-রোমক) রূপ পড়ে ভুল উচ্চারণ বা সেহেতু কখনো ভুল অর্থবোধ করতে পারে, সে-সব ক্ষেত্রে তারা সংশোধনও করে নিতে পারে। আসল কথা হল বাংলা শব্দের প্রতিবর্ণীকরণের যে-অভ্যাস ও রীতি তৈরি করেছি তার মধ্যে কোনো সামগ্রিক সংগতি আছে কিনা, তার কোনো সুনির্দিষ্ট অবিকল্প (ইউনিফর্ম) পদ্ধতি গড়ে উঠেছে কিনা।

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের 'ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ' (১৯৩৯) থেকে শুরু করে প্রায় সমস্ত বাংলা ব্যাকরণেই প্রতিবর্ণীকরণের কিছু আলোচনা আছে, কিন্তু সে মূলত বাংলায় ইংরেজি বা বিদেশী শব্দের প্রতিবর্ণীকরণ। বাংলা শব্দের ইংরেজি প্রতিবর্ণীকরণ সম্বন্ধে আলোচনা অল্প ও বিচ্ছিন্নভাবে হয়েছে। তার মূল নীতিটি যদি আমরা লক্ষ করি তাহলে বুঝব যে, তা মূলত উইলিয়াম জোন্স প্রভৃতির দ্বারা প্রবর্তিত[১] সংস্কৃত শব্দের ইঙ্গ-রোমক প্রতিবর্ণীকরণের দ্বারা প্রভাবিত। তাতে অ আ দুটি ধ্বনির ক্ষেত্রেই 'a'-এর ব্যবহার আছে, যদিও উইলিয়াম জোন্স ইত্যাদির পদ্ধতিতে, সংস্কৃতের লিপ্যন্তরে, আ বোঝাতে a-র মাথায় একটি ছোট 'বার' (bar) বা টানা দাগ বসানো হয়ে থাকে। এই বাড়তি নোখ্‌তা সাধারণ ব্যবহারে অনর্থক জটিলতা তৈরি করে বলেই তা বর্জিত হয়েছে। কিন্তু এই প্রতিবর্ণীকরণ মূলত বর্ণমালা-প্রভাবিত, উচ্চারণ-নিয়ন্ত্রিত নয়। অর্থাৎ বাংলা বর্ণমালায় সংস্কৃত বর্ণমালার অনুসরণেই আ-কে অ-এর দীর্ঘ রূপ, (এবং বিপরীতক্রমে অ-কে আ-এর হ্রস্ব রূপ) বলে গণ্য করা হয়, ফলে মূলত একই স্বরবর্ণ চিহ্ন দিয়ে এ দুটির প্রতিবর্ণীকরণ করা হয়। কিন্তু মুখের উচ্চারণে, অর্থাৎ মান্য চলিত সহ সমস্ত বাংলা উপভাষার উচ্চারণে অ ও আ-এর, কোনো গুণগত সম্পর্ক নেই—দুটি সম্পূর্ণ পৃথক স্বরধ্বনি। আ নিম্ন কেন্দ্রীয় স্বরধ্বনি—অর্থাৎ এর উচ্চারণে জিভ মুখের মেঝেতে তলায় শুয়ে থাকে, সেজন্য এই স্বরধ্বনি [+ নিম্ন], এবং এর উচ্চারণ-কালে জিভ সামনে এগোয় না, পিছনেও পিছোয় না, ফলে এটি [—সম্মুখ, —পশ্চাৎ], অর্থাৎ কেন্দ্রীয়। অন্য দিকে অ হল [+নিম্ন, +পশ্চাৎ]

স্বরধ্বনি, যদিও আ-এর বেলায় জিভ যতখানি নিচে থাকে অ উচ্চারণের বেলায় ঠিক ততটা নিচে নামে না। এ ছাড়া দুয়ের মধ্যে আরো তফাত আছে। আ বলার সময় মুখ যতটা হাঁ হয়ে যায় (এই স্বরধ্বনিটি বলার সময়েই মুখব্যাদান সবচেয়ে বেশি হয়), অ বলার সময় ততটা প্রশস্ত হয় না, আর সেই সঙ্গে অ বলতে গেলে ঠোঁট দুটিও গোলাকৃতি ধারণ করে। ফলে দুই-এর মধ্যে তফাত বিস্তর।

৩

প্রচলিত প্রতিবর্ণীকরণের এই আংশিক আলোচনায় আমাদের লক্ষ্য এই যে,—এই প্রতিবর্ণীকরণ যে বর্ণমালা-অনুগামী, উচ্চারণ-অনুগামী নয়—তাই দেখানো এবং উচ্চারণের মাত্রাটির গুরুত্বের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করা। এই প্রসঙ্গে ভাষাবিজ্ঞানের দিক থেকে লিপ্যনুসরণ বা transcription-এর যে-সব পদ্ধতি গড়ে উঠেছে সে বিষয়ে একটু বিবেচনা করা যেতে পারে। ভাষাবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে একাধিক বর্ণমালা উদ্ভাবিত হয়েছে, যে-বর্ণমালার প্রতীকগুলি ব্যবহার করে যে-কোনো ভাষার যে-কোনো ধ্বনির লিখিত রূপ দেওয়া যেতে পারে। এই বর্ণমালাগুলির মধ্যে যেটি প্রাচীনতর এবং এখনও সবচেয়ে ব্যাপক ভাবে ব্যবহৃত—সেই International Phonetic Association Script বা IPA Script (১৮৮২ নাগাদ প্রবর্তিত) ব্যবহার ভাষাবিজ্ঞানীর পক্ষে যতটা সহজ, সাধারণের পক্ষে ততটা সহজ নয়। এর কারণ, প্রথমত সে-বর্ণমালার প্রতীকগুলি রোমক গ্রিক ইত্যাদি বর্ণমালা মিশিয়ে তৈরি হলেও তাতে অদ্ভুত-দর্শন ও দুর্লেখ্য কিছু কিছু প্রতীক আছে, যেমন tS, ʁ। দ্বিতীয়ত, হাতের লেখায় এগুলি লেখা যদি বা অসম্ভব না হয় (দ্রুত বা টানা লেখায় এগুলি স্বচ্ছন্দে আসে না), ছাপাখানায় এগুলি সংগ্রহ করা কঠিন, অন্যদিকে টাইপরাইটারে এগুলির কী (key) পাওয়া সহজ নয়। ফলে নিত্যব্যবহার্যতার দিক থেকে IPA প্রতীকগুলি বাংলা শব্দের প্রতিবর্ণীকরণের কাজে লাগানোর সম্ভাবনা সুদূরপরাহত।

মার্কিন দেশের ভাষাতাত্ত্বিক মহলে ভারতীয় ভাষার প্রতিবর্ণীকরণের আরেকটি পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়েছে[২]। এটি মূলত সহজলভ্য ইঙ্গ-রোমক টাইপগুলিকে, এবং সেগুলির ছোটো বড় দু ধরনের অক্ষরকেই—অর্থাৎ আপার কেস ও লোয়ার কেস, (ক্যাপিট্যাল ও স্মল)-এর—দুটি পর্যায়কেই ব্যবহার করে। এই অক্ষরগুলি চালু ইংরেজি বা ইঙ্গ-রোমক অক্ষর, এগুলি পেতে কোনো অসুবিধা নেই। এই প্রতিবর্ণীকরণের মূল বর্ণ-বর্ণ বা বর্ণ-ধ্বনি প্রতিসম্পর্কগুলি এই রকম :

স্বরবর্ণ

অ = O	রতন	rOton
আ = a	রাম	ram
এ = e	রেবা	reba
ও = o	বোন	bon
ই = i	দিন	din
উ = u	দুধ	dudh
অ্যা = A	এক	Ak

ব্যঞ্জনবর্ণ

ক k	খ kh	গ g	ঘ gh	ঙ M
চ c	ছ ch	জ j	ঝ jh	
ট T	ঠ Th	ড D	ঢ Dh	
ত t	থ th	দ d	ধ dh	ন n
প p	ফ ph	ব b	ভ bh	ম m
য j	র r	ল l	শ S	
হ h	ড় R	ঢ় Rh		

আনুনাসিক স্বরধ্বনি : স্বরধ্বনি = V (vowel) + N

অর্থাৎ আঁ = aN, অ্যাঁ = AN

এই বর্ণপদ্ধতির বিচার করলে বাংলা শব্দের প্রতিবর্ণীকরণের ক্ষেত্রে এর অসুবিধাগুলি খুব সহজেই চোখে পড়ে। বড় অক্ষরের ব্যবহার যে সমস্যার সৃষ্টি করবে তা এই—নামের বা বাক্যের প্রথম বর্ণটি ইংরেজিতে বড় বা ক্যাপিটাল রাখতেই হবে। সেক্ষেত্রে তার মধ্যে একটি দ্ব্যর্থকতা সৃষ্টি হবে—সেটি ধ্বনিপ্রতীক হিসাবে বড় অক্ষর, না শব্দে বা বাক্যে প্রথম অক্ষর হিসাবে বড় অক্ষর—তা বোঝা দুষ্কর হবে।

সুতরাং বাংলা শব্দের প্রতিবর্ণীকরণের অবলম্বন হিসাবে এ আদর্শ বর্ণমালা নয়, যদিও মুদ্রণে এবং টাইপরাইটারে এ বর্ণমালা ব্যবহারে কোনো অসুবিধা নেই। হাতের লেখায় অবশ্য ছোট-বড় অক্ষরের তফাত সব সময় স্পষ্ট রক্ষা করা যায় না।

কিন্তু এই বর্ণলিপি তৈরি হয়েছে মূলত মুখের উচ্চারণ ধরবার জন্য, লিখিত ভাষায় প্রতিবর্ণনের জন্য নয়। ফলে লিখিত ভাষার রূপে যার বানান 'আত্মা', তা এই ভাষাতাত্ত্বিক বর্ণমালায় atta বা বড় জোর attaN

কিংবা aNtta লেখা হবে, কিন্তু প্রচলিত সংস্কৃতানুসারী প্রতিবর্ণীকরণ হবে atma। এর কারণ আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। প্রচলিত লিপ্যন্তর মূলত বাংলা লিখিত রূপের প্রতিবর্ণন মাত্র, তার মৌখিক রূপের প্রতিবর্ণন নয়। আর মার্কিন ভাষাবিজ্ঞানীদের ওই পদ্ধতি শব্দের উচ্চারিত রূপের প্রতিবর্ণন করে।

৪

প্রশ্ন হল, আমাদের লক্ষ্য কী হবে? আমরা কি ভাষার লিখিত রূপের প্রতিবর্ণন করব, না তার মৌখিক রূপটিকেই লিখব ইংরেজি-রোমকে? এই প্রশ্নের উত্তরের উপরই নির্ভর করবে আমাদের লিপ্যন্তর পদ্ধতি।

বাংলা ভাষার বানান-পদ্ধতির দিকে আর একবার দৃষ্টিপাত করা যাক। আমাদের বানানে, বিশেষত তৎসম শব্দের বানানে—এমন অনেক স্বর ও ব্যঞ্জনচিহ্ন আমরা লিখি যার বাংলা উচ্চারণ নেই, অনেক যুক্তব্যঞ্জনের উচ্চারণও আমাদের মুখে অন্যরকম দাঁড়ায়। কিন্তু প্রচলিত প্রতিবর্ণীকরণে এর একটি বিচিত্র প্রতিফলন লক্ষ্য করি। সেখানে একক স্বর ও ব্যঞ্জনে সংস্কৃত বর্ণমালার আদলটি অনুকরণ করা হয় না। অর্থাৎ দীর্ঘ স্বরের দীর্ঘ চিহ্ন থাকে না, ঋ ও র-কে পৃথক করা হয় না; ন ণ-এর মধ্যে তফাত করা হয় না। এক নজরে প্রচলিত প্রতিবর্ণীকরণের ছকটি দেখে নিই :

স্বরবর্ণ :	অ, আ	= a	আই, ঐ	= ai
	ই, ঈ	= i	ও	= o
	উ, ঊ	= u	আউ, ঔ	= au
	ঋ	= ri		
	এ	= e		

ব্যঞ্জনবর্ণ ;	ক k	খ kh	গ g	ঘ gh	ঙ n/ ng
	চ ch	ছ chh	জ j	ঝ jh	ঞ n
	ট t	ঠ th	ড d	ঢ dh	ণ n
	ত t	থ th	দ d	ধ dh	ন n
	প p	ফ ph	ব b	ভ bh	ম m
	য y	র r	ল l	শ sh	ষ s / sh
	স s	হ h	ড় r	ঢ় rh	
	ং ng	ঃ h	ঁ	Vn *	

* V=Vowel

যুক্তব্যঞ্জন

বানান	প্রতিবর্ণীকরণ	উচ্চারণ
ক্ম	km	ক্ক
ক্ব	kw	ক্ক
ক্য	ky	ক্ক
ত্র	tr	ttr (শব্দের মধ্যে)
		ইত্যাদি।

অর্থাৎ প্রচলিত প্রতিবর্ণীকরণে একক ব্যঞ্জনের ক্ষেত্রে বানানের বশ্যতাই স্বীকার করা হয়েছে। এই অসঙ্গতির প্রতি কেবল অভ্যাসের অনুরোধেই উদাসীন থেকেছি আমরা।

এ থেকে এও স্পষ্ট হয় যে, আমাদের নাম, বিশেষত বাঙালি হিন্দুর নাম, যেহেতু অধিকাংশত তৎসম শব্দের, সেগুলির প্রতিবর্ণীকরণে আমরা একটু রক্ষণশীলতাই বেশি পছন্দ করি, কারণ মূলে নামকরণের দিক থেকেই আমরা রক্ষণশীল ও ঐতিহ্যপন্থী। নামকরণের রক্ষণশীলতা নামের বানানের প্রতিবর্ণীকরণেও চলে আসে। কেউ কেউ উচ্চারণ মেনে 'অমিয়'কে Omio লিখেছেন বটে, কিন্তু 'Amiya' বানানটিই বেশি জনপ্রিয়।

বলা বাহুল্য, উচ্চারণের দিক থেকে দেখতে গেলে এই গৃহীত ও স্বীকৃত প্রতিবর্ণীকরণ পদ্ধতিরও নানা ত্রুটি আছে। a দিয়ে অ, আ দুটি ধ্বনির ইঙ্গিত, t th d dh দিয়ে যথাক্রমে একই সঙ্গে ট-ত, ঠ-থ, ড-দ এবং ঢ-ধ বোঝানো, r দিয়ে র-ড় দুটিকেই বোঝানো—এতে বিদেশীদের যথার্থ উচ্চারণ বোধে সমস্যা হয়, যদিও আমরা যারা ইংরেজি পড়তে পারি তাদের এ সমস্যা হয় না, কারণ শব্দটি মূলে আমাদের চেনা। দ্বিতীয়ত এর অনেকগুলি অক্ষর ডাইগ্রাফ বা দ্বিবর্ণ ব্যবহার করে। অর্থাৎ বাংলায় যেখানে একটিমাত্র বর্ণ খ, বা থ লিখছি, সেখানে ইঙ্গ-রোমকে একটা বাড়তি h দিয়ে kh (k+h) বা th লিখতে হয়, অর্থাৎ দুটো করে প্রতীকচিহ্ন বসাতে হয়, যদিও মূল লক্ষ্য একটিমাত্র ধ্বনি। ছ-এর ক্ষেত্রে chh লিখলে তা trigraph হয়ে দাঁড়ায়—একটি ধ্বনির তিনটি প্রতীক। কিন্তু সমস্যার কারণ হল ইংরেজি-ভাষার অনেক ধ্বনি যেমন বাংলায় লেখার সুবিধা নেই, তেমনই বাংলা ভাষার অনেক ধ্বনিও ইংরেজি ভাষায় অনুপস্থিত। ফলে হয় একটি প্রতীক দিয়ে দুটি ধ্বনিকে চেনানো হয়, যেমন t দিয়ে ট ও ত উভয়কে—অর্থাৎ বাংলা ধ্বনিকে underdistinguish করা হয় ; আর নয়তো উচ্চারণের বিশেষ মাত্রা বোঝানোর জন্য অতিরিক্ত বর্ণ যোজনা করা হয়। যেমন h লাগিয়ে

মহাপ্রাণতা বোঝানোর পদ্ধতি। h অবশ্য কেবল মহাপ্রাণতা বোঝায় না—s-এর সঙ্গে বসলে তা তালব্য-ধর্মও বোঝায়, অর্থাৎ শুধু s যেখানে দন্ত্য-স, sh সেখানে তালব্য-শ।

৫

বর্তমান পদ্ধতির এই সমস্ত ত্রুটি সংশোধনের কোনো সহজ উপায় নেই। আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বাংলা ও ভারতীয় ভাষার রোমক লিপিতে প্রতিবর্ণনের জন্য একটি সর্বাঙ্গীণ বর্ণমালা তৈরি করেছিলেন—নানা কারণে সেটি বর্তমান লেখকের কাছে সন্তোষজনক মনে হয়নি[৩]। ব্যঞ্জনের লিপ্যন্তরণে আমাদের মতে মূল সমস্যা হল ট-বর্গ ও ত-বর্গকে পৃথক রাখা অর্থাৎ বাংলা উচ্চারণের প্রতিটি পার্থক্যকে প্রতিবর্ণীকরণে স্পষ্ট করা।

কিন্তু মনে রাখতে হবে, পুরো ভাষা অন্য লিপিতে লেখা এক কথা, আর উপলক্ষ্যবিশেষে তার কয়েকটি শব্দ বা নামের প্রতিবর্ণীকরণ আরেক কথা। আমাদের প্রতিবর্ণীকরণের দরকার হয় কোথায় কোথায়? বোর্ড বা বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্টিফিকেটে নাম লেখার সময়, সরকারি-বেসরকারি দরখাস্তে নাম-ঠিকানা ইত্যাদি লেখার সময়—এবং এ দুটি ক্ষেত্রেই সবচেয়ে বেশি করে। অবশ্য ইংরেজি খবরের কাগজপত্রে দেশী নাম ইত্যাদি লেখাতেও প্রতিবর্ণীকরণের ব্যাপক ব্যবহার হয়। ব্যবহার হয় টেলিফোন ডিরেক্টরি, রেলওয়ে টাইম টেবুল—ও এই ধরনের নানা ক্ষেত্রে। আশা করা যায় যে দূর ভবিষ্যতে এসব জায়গাতেও ভারতীয় লিপির ব্যবহার শুরু হবে। উত্তর ভারতে সরকারি বোর্ডের সার্টিফিকেটে দেবনাগরীর ব্যবহার অনেকদিন আরম্ভ হয়েছে, পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র বাংলাদেশে যেমন এসব সার্টিফিকেট লেখা হচ্ছে বাংলা লিপিতেই। অর্থাৎ প্রতিবর্ণীকরণের এই সব ক্ষেত্রও ক্রমশ সংকুচিত হয়ে আসছে।

এসব তথ্য শুধু এই ইঙ্গিত করার জন্য যে, প্রতিবর্ণীকরণের দখলে ভাষার অতি ক্ষুদ্র এক অংশ। প্রতিবর্ণিত নাম ইত্যাদি যাঁরা পড়েন, বিদেশী ভাষার যাঁরা সাধারণ পাঠক, তাঁরা ভাষাশিক্ষার্থী নন, ভাষার অত খুঁটিনাটি নিয়ে তাঁরা মাথা ঘামান না, এবং একবার পড়ার পর বেশিরভাগ নামই মনেও রাখেন না। সুতরাং প্রতিবর্ণীকরণে ভাষাবিজ্ঞানের সূক্ষ্ম খুঁটিনাটি না থাকলেও চলে, এবং অতিরিক্ত ডায়াক্রিটিক দিয়ে তা ভারাকান্ত করার দরকার নেই।

কিন্তু আমাদের বাঙালিদের যেটা বড় সমস্যা তা হল প্রতিবর্ণীকরণের যা-কিছু নীতিনিয়ম তৈরি হয়েছে তাই আমরা জানি না। তর্থাৎ এটাও

বানানের নতুন নিয়ম কী হয়েছে তা না জানার মতো ব্যাপার। প্রতিবর্ণী-করণ অবশ্য সর্বাংশে বানানের মতো নয়, কারণ বানান যে অর্থে 'ভুল' হতে পারে, প্রতিবর্ণীকরণ সে অর্থে ভুল হতে পারে না। আর বানান ভাষার সমগ্র অংশের লিপিরূপের সঙ্গে জড়িত, প্রতিবর্ণীকরণ ভাষার একটি ক্ষুদ্র অংশকেই মাত্র প্রভাবিত করে। প্রতিবর্ণীকরণের অধিকার অধিকাংশত এবং কার্যত নাম বা proper noun-এর ক্ষেত্রে। তবু প্রতিবর্ণীকরণের নিয়মগুলি জানতেই হবে। এ নিয়মগুলি সুনীতিকুমারের 'ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণে' যা দেওয়া আছে তা সংগত; আমরা মূলত তারই অনুসরণে লিপ্যন্তরের কয়েকটি প্রতিসম্পর্ক নির্দেশ করছি :

বাংলা বর্ণ	ইঙ্গ-রোমক বর্ণ
অ আ	a
ই ঈ	i
উ ঊ	u
ঋ	ri (wri নয়)
এ	e
ঐ	ai
ও	o
ঔ	au

এটুকু অনুধাবন করলেই বুঝতে পারি, বাঙালি পদবী 'দে' লিখতে হবে De, লেখা চলবে না Dey বা Day। সুনীতিকুমারের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে আরো বলতে পারি, বাংলায় যেখানে 'ও' ধ্বনি অ-এরই ধ্বনিগত রূপান্তর, সেখানে ও-এর প্রতিরূপ o হওয়া কাম্য নয়। যেমন Pramatha লেখা উচিত, Promotho নয়। Prabodh হবে, Probodh নয়। তিনি কয়েকটি তদ্ভব শব্দে যেমন ননীগোপাল (Nonigopal), পাঁচকড়ি (Panchkori), মতিলাল (Motilal)-এ o অনুমোদন করেছেন। আমাদের মতে এরও প্রয়োজন নেই। অ ধ্বনির জন্য u লেখাও অনুচিত, মল্লিক Mullick হওয়া অবিধেয়।

অবশ্য সুনীতিকুমারের সময় আমাদের নামের প্রতিবর্ণীকরণের ক্ষেত্রে যে-সব উদ্ভট উদ্ভট কাণ্ড চলেছে, যেমন উমেশকে Woomesh বা কালী-চরণকে Collychurn লেখা—তা আজকাল কমে এসেছে, নামের প্রতিবর্ণী-করণ অনেকটা স্ট্যাণ্ডাডাইজ্‌ড হয়েছে। এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় ও বোর্ডের অনেকটা কৃতিত্ব আছে, যদিও দুয়ের ক্ষেত্রে নাম ও পদবীর প্রতিবর্ণীকরণে হুবহু সাম্য নেই। যাই হোক, এখন গৌরাঙ্গ Gauranga-ই হবে, Gourango নয়। শৈবাল Shaibal, Soibal নয়।

৬

ব্যঞ্জনবর্ণের ক্ষেত্রে প্রতিসম্পর্কগুলি এইরকম :

ক k (ck নয় Mullick-এ যেমন) খ kh গ g ঘ gh ঙ n বা ng চ ch ছ chh জ j ঝ jh ঞ n ট t ঠ th ড d ঢ dh ণ n ত t থ th দ d ধ dh ন n প p ফ ph ব b ভ bh ম m য j য-ফলা ও য় y র r ল l ব-ফলা w শ sh স s হ h, ং n, ক্ষ ksh, জ্ঞ jn।

আমরা সুনীতিকুমারের কিছু কিছু ডায়াক্রিটিক চিহ্ন বাদ দিয়েছি, কখনো সেগুলির প্রয়োজন নেই বলে, যেমন Ranjan-এ ঞ-র জায়গায় n-এর মাথায় বক্ররেখা বা 'টিলডা' চিহ্ন বসানোর প্রয়োজন নেই; আবার কিছু বাদ দিয়েছি কখনো সেগুলি ব্যবহারে সহজলভ্য নয় বলে,—যেমন মূর্ধন্য ধ্বনির ক্ষেত্রে t th n ইত্যাদির নিচে ফুটকি দেওয়া বর্ণচিহ্ন।

কিন্তু আমরা মনে করি, প্রয়োজনক্ষেত্রে বাংলাভাষার যথার্থ উচ্চারণটি যদি বিদেশী বা বিভাষী পাঠককে বুঝিয়েদে ওয়ার দরকার হয়, আমাদের প্রতিবর্ণমালার মধ্যে তার ব্যবস্থা থাকা উচিত। ফলে আমরা এরই সঙ্গে, কেবলমাত্র আবশ্যিক ক্ষেত্রে, উচ্চারণ নির্দেশের জন্য ব্যবহার্য কয়েকটি বাড়তি নির্দেশ যোগ করছি।

১. দীর্ঘস্বর=হ্রস্বস্বর-প্রতিবর্ণের দ্বিত্ব। অর্থাৎ ই i, কিন্তু ঈ ii; আ=aa।

২. ঐ ঔ প্রয়োজনবোধে oi, ou (অবশ্য ফরাসি বা রুশীয়রা ou-কে 'উ' পড়তে পারে)।

৩. ঙ-কে ng দিয়ে Ranga Bau রাঙা বউ লিখলে এর গ-ধ্বনিহীন ঙ রূপটি স্পষ্ট হয় না। সেজন্য হাতে ও টাইপরাইটারে n চিহ্নটির পেট কেটে, এবং ছাপার অক্ষরে M চিহ্ন দিয়ে তা লেখা চলে। যেহেতু কোনো বাংলা শব্দ ঙ দিয়ে শুরু হয় না, আদি ম-এর চিহ্নের সঙ্গে মুদ্রণে এর বিভ্রম ঘটার কোনো কারণ নেই।

৪. চ-কে c দিয়ে লিখলে ছ ch দিয়েই লেখা চলে chh-এর মতো ত্রিবর্ণ বা trigraph লেখার দরকার হয় না। সংস্কৃত ভাষার প্রতিবর্ণীকরণে যেখানে c দিয়েই চ বোঝানো হয় সেখানে বাংলায় ch লেখার দরকার কী। চন্দ্র স্বচ্ছন্দে Candra লেখা চলে।

৫. মূর্ধন্য ধ্বনি ট ঠ ড ঢ-এর জন্য তলায় ফুটকি বসানো t ইত্যাদি

সুপ্রাপ্য নয়। সেজন্য প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে পাশে ফুটকি বসিয়ে মূর্ধন্য উচ্চারণ নির্দেশ করা চলে। যেমন t., t.h, d., d.h।

৬. পদের আদিস্থ য-কে বিকল্পে সুনীতিকুমার y দিয়ে লেখার অনুমতি দিয়েছেন, যেমন যোগেশ Yogesh, কিন্তু এখন আমরা তা অনাবশ্যক মনে করি। J দিয়েই তা লেখা যেতে পারে—Jogesh, Jatindra, Jajati। ভট্টাচার্য Bhattacharja লেখা উচিত, -ya বা -yya লেখার প্রয়োজন নেই।

৭. বাংলায় অনুস্বার যেহেতু ঙ-রই বিকল্প উচ্চারণ, তা ঙ-র প্রতিবর্ণেই লেখা উচিত, ng হিসাবে। সেখানে g-এর উচ্চারণ উহ্য থাকবে।

৭

কিন্তু প্রতিবর্ণীকরণে বিভ্রান্তির ইতিহাস কম দীর্ঘ নয়। সুনীতিকুমারের পুনঃপুন নিষেধ সত্ত্বেও আমরা যে দুটি স্খলন সবচেয়ে বেশি করে লক্ষ করি, তা হল, ফ = f এবং ভ = v—বর্ণের এই দুটি প্রতিসম্পর্ক স্থাপন। আসলে হওয়া উচিত ফ = ph এবং ভ = bh। ফলে প্রফুল্ল হবে Praphulla (Prafulla নয়), ফাল্গুনী হবে Phalguni (Falguni নয়)। মুসলমান নামের ক্ষেত্রে অবশ্য F হবে, কারণ সেখানে মূলেই উষ্মধ্বনি ফ. ছিল, স্পষ্ট মহাপ্রাণ ফ ছিল না। ফলে ফিরোজ Firoz, কিন্তু ফুলমতী Phulmati (mati-কে মাটি যাতে না পড়া হয়, সেজন্য moti করা যেতে পারে)। তেমনই শোভা হবে Shobha, Sova নয়, শৌভনিক হওয়া উচিত ছিল Shaubhanik, (Sauvanik না), বিভাব হওয়া উচিত Bibhab, Bivab নয়।

উচ্চারণ অনুযায়ী প্রতিবর্ণীকরণ তখনই সম্ভব, যখন আমাদের মূল বানানও উচ্চারণ-অনুগ হবে[৪]। তার আগে উচ্চারণ ও বানানরীতির সঙ্গে আপোশরফা করেই প্রতিবর্ণীকরণ করতে হবে।

৮. 'শুদ্ধ' বানান-প্রচলন : কয়েকটি বাধা

বানান-সংস্কার না হয় হয়ে গেল। সরকার হোক, বিশ্ববিদ্যালয় হোক, খবরের কাগজ হোক, কিংবা সকলে মিলে হোক—একটা বানান-নীতি গ্রহণ করা হল, যেমন হয়েছে ১৯৩৬ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন বানানের ক্ষেত্রে। এমন-কী, ধরা যাক, প্রতিবেশী স্বাধীন রাষ্ট্র বাংলাদেশের সচেতন বুদ্ধিজীবীরাও আমাদের বানান-সংক্রান্ত সমস্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন, কিংবা তাঁদের সঙ্গে যৌথ আলোচনাতেই আমরা বানান-সংস্কারের কিছু সর্বমান্য সিদ্ধান্তে পৌঁছোলাম। এবার কি সকলে নতুন বানান লিখতে শুরু করবেন? একেবারেই না। বানান-সংস্কারের অর্থ এই নয় যে, পরদিন থেকেই বাংলাভাষায় লিখতে-পড়তে সমর্থ এমন সকলেই পুরনো বানান সম্পূর্ণ বর্জন করে নতুন বানান লিখতে শুরু করে দেবেন। তা হয় না, সংস্কৃতির জগতে এমন রাতারাতি বিপ্লব সম্ভব নয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'নতুন' বানানের ক্ষেত্রে লক্ষ করি—আজ প্রায় পঞ্চাশ বছর হতে চলল, তবু সে বানান 'নতুন' অর্থাৎ প্রায় অপরিচিত থেকে গেল। মুষ্টিমেয় কিছু বাংলা চর্চাকারী শিক্ষক, সামান্য কয়েকজন সাংবাদিক, লেখক, বা প্রুফ-সংশোধক সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে এই সংস্কারের খবর রাখেন, সাধ্যমতো 'নতুন' বানান লেখার চেষ্টা করেন; কিন্তু শতকরা আটানব্বই জন খবরই রাখেন না কী সংস্কার হল। তাঁরা পুরানো, অভ্যস্ত বানানই লেখেন, ছাপেন। কিংবা কখনো কখনো নতুন-পুরানো মিশিয়ে ফেলেন, সেও সম্পূর্ণ অচেতনভাবে—দুটোকেই 'স্বাভাবিক' বানান ভেবে। এঁরা সচেতনভাবে নতুন বানান শেখেননি, তা প্রতি ক্ষেত্রেই ধরা পড়ে।

এ থেকে বোঝা যায়, নতুন বানানরীতির স্বীকার ও গ্রহণ যতটা গুরুত্বপূর্ণ, তার প্রচলন, বিস্তার এবং সকলকে সে বানান শিখিয়ে তা মানতে আগ্রহী করে তোলা তার চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। প্রথম কাজটা কিন্তু তুলনায় সহজ, দ্বিতীয় দায়িত্বটা অনেক কঠিন। পণ্ডিতে পণ্ডিতে বিশেষজ্ঞে বিশেষজ্ঞে সহজাত মতভেদ-প্রবণতার কথা ছেড়ে দিলেও, এবং এং মধ্যে অপণ্ডিত ও অবিশেষজ্ঞদের উৎসাহ যতটা বিভ্রান্তি ও হট্টগোল তৈরি করতে

পারে তা হিসাবে ধরে নিলেও, সিদ্ধান্ত যেখানে নিচ্ছে পাঁচ থেকে দশ জনের একটা কমিটি, সেখানে একাগ্র এবং সর্বসম্মত একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছানো, কষ্টকর হলেও, অসম্ভব নয়। কিন্তু লিখন-সমর্থ আবালবৃদ্ধ-বনিতাকে দিয়ে সেই সিদ্ধান্তের প্রত্যেকটি সূত্র স্বীকার ও পালন করানো, সে প্রায় অসম্ভব কাজ। অন্তত এই অর্ধশতাব্দী সময়ের মধ্যে আমরা সে কাজ করে উঠতে পারলাম না তো। আরো অর্ধশতাব্দী এরকম প্রায় নিষ্ফলা গেলেও অবাক হবার কিছু নেই। কারণ এ পর্যন্ত অভিজ্ঞতা বলে, সংস্কারে আমরা যত উৎসাহী, সম্প্রসারে ততটা নই। সহজ কাজটা আমরা হট্টগোল করে করি, কঠিন কাজটার বেলায় নিঃশব্দ থাকি।

প্রায় নিষ্ফলা বলেছি এই কারণে যে, আপাতদৃষ্টিতে নতুন বানান অনেকেই গ্রহণ করেছেন, কেউ-কেউ তারও কিছু সংস্কার সাধন করেছেন পরে, নিজের নিজের ধারণা অনুযায়ী। বাংলাভাষার বহুলপ্রচলিত দৈনিক ও সাময়িক পত্রিকাগুলি সাধ্যমতো নতুন বানানই অনুসরণ করার চেষ্টা করে, অন্ততপক্ষে লেখক বা প্রুফ-সংশোধকের ব্যক্তিগত অভিরুচি বা অজ্ঞতা যেখানে বাধা হয়ে না দাঁড়ায়। অধিকাংশ বাংলা বই সাধ্যমতো, আগের ওই সব বাধা সত্ত্বেও, নতুন বানানেই ছাপানোর চেষ্টা হয়। তা সত্ত্বেও একটা বৃহৎ এলাকায় নতুন বানান প্রবেশাধিকার পায়নি, তা আমাদের আলোচনা থেকেই স্পষ্ট হবে। এই এলাকাটা বৃহৎ ও গুরুত্বপূর্ণ, যদিও তা সব সময় আমাদের নজরের সামনে থাকে না। সেই এলাকায় নতুন বানানের স্বীকৃতি ও বশ্যতা কীভাবে প্রতিষ্ঠা করা যায় সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতেই এ আলোচনার অবতারণা।

২ প্রতিবাদী-পক্ষ

কিন্তু এ আলোচনা থেকে প্রথমেই বাদ দিতে হবে তাঁদের প্রসঙ্গ, যাঁরা নতুন বানানের প্রতিবাদী পক্ষ, তার সম্পূর্ণ বা আংশিক সমালোচক, কিংবা পরে নিজেরা যার আংশিক সংস্কারক। যেমন দেবপ্রসাদ ঘোষ। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন বানানের সুপারিশগুলির অধিকাংশই গ্রহণ করেননি, রেফের পরে দ্বিত্ব বর্জন, সংস্কৃত মূর্ধন্য ণ-কে তদ্ভব বা অর্ধতৎসম শব্দে দন্ত্য ন হিসাবে লেখা ইত্যাদিতে তাঁর ঘোরতর আপত্তি। 'বানান' কথাটিকেই তিনি 'বাণান' লেখেন, 'কান' লেখেন 'কাণ', কারণ এ কথা দুটি সংস্কৃত 'বর্ণন' 'কর্ণ' থেকে এসেছে।[১] অন্যদিকে শ্রীমণীন্দ্রকুমার ঘোষ রেফের পর দ্বিত্ব বর্জনে সম্মত হয়েও 'সূর্য্য' লেখার পক্ষপাতী,

কারণ তিনি মনে করেন, য-ফলা পূর্ববর্তী অন্তঃস্থ য-এর 'জ' উচ্চারণের সহায়ক, না হলে 'সূর্য' কথাটি 'সুরিয়' পড়া হতে পারে।[২] অনাদ্য (অর্থাৎ non-initial, যা শব্দের গোড়ায় বসছে না) 'য' তো আমাদের বানানে প্রায়ই 'য়' হয়ে যায়, যেমন 'যাম' [জাম], কিন্তু আযাম [আয়াম]। কিংবা সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। তিনি ভাষার ধ্বনি পরিবর্তনের সূত্র ধরিয়ে দেবার জন্য ঊর্ধ্বকমা দিয়ে 'ক'রে', 'ব'লতে' ইত্যাদি লেখার পক্ষপাতী।[৩] এঁদের প্রত্যেকের বক্তব্যে এঁদের ধারণামতো যুক্তি আছে। আমরা সে-সব যুক্তির কোনোটাই গ্রহণযোগ্য মনে করি না, কিন্তু এটা স্বীকার করি যে, এঁরা সজ্ঞানে, সচেতনভাবে, নিজেদের জ্ঞানবিশ্বাস মতো একটা যুক্তির ভিত্তি তৈরি করে তবে একটা বানান লিখছেন। তাঁদের সে অধিকার আছে।[৪] তাঁরা যে-যে-ক্ষেত্রে আপত্তি করেছেন তার মধ্যে যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন বানান-সিদ্ধান্তের কিছু কিছু অসম্পূর্ণতা এবং দুর্বলতাও ধরা পড়েছে তাও স্বীকার করা দরকার। এই অসম্পূর্ণতা এবং দুর্বলতা বিষয়ে আমরা এর আগে আলোচনা করেছি।[৫] তার মধ্যে প্রধান হল অতিরিক্ত বিকল্পের ব্যবস্থা। আমেরিকা ও অন্যান্য ইংরেজিভাষী দেশের ইংরেজি বানানে কিছু কিছু ক্ষেত্রে দুটি করে বিকল্প তৈরি হায়ছে, যেমন color-colour, labeled-labelled ইত্যাদি। কিন্তু সে হয়েছে ভিন্ন আঞ্চলিক উৎস থেকে, দ্বিতীয়ত তা সংখ্যায় এতই সামান্য[৬] যে, এ নিয়ে লোকে বিশেষ মাথাও ঘামায় না। কিন্তু বাংলায় একই অঞ্চলে নানা মুনির নানা মত হওয়ায় বিষয়টা আরো জটিল হয়েছে সন্দেহ নেই। শ্রীমণীন্দ্রকুমার ঘোষই দেখিয়েছেন যে, "করছি" এই বাংলা ক্রিয়ারূপটির বানান "ডজন-তিনেক" পরিমাণ লক্ষ করা গেছে। এর কোনোটাই নীতির দিক থেকে 'ভুল' বানান, তা বোধ হয় বলা যাবে না।[৭] এর সবগুলিই যে 'প্রতিবাদী' বানান তা নয়। কিন্তু এ থেকেই বোঝা যায়, বাংলায় বানান সংস্কারের সর্বসম্মত (অর্থাৎ বিশেষজ্ঞ-কমিটির সদস্যদের মধ্যে সর্বসম্মত) প্রস্তাব-গ্রহণই যথেষ্ট নয়, দরকার সকলকে দিয়ে একটিমাত্র বা গৃহীত বানান গ্রহণ ও অভ্যাস করানো। প্রতিবাদী আর ক জন? বেশির ভাগ সাক্ষর মানুষ অনবধান বা অসচেতনতার জন্যই প্রাচীন ও বর্জিত বানান লেখেন। মূলত তাঁদের নিয়েই এই আলোচনা। 'ভুল' বানান লেখার প্রসঙ্গ থেকে 'বর্জিত' বানান লেখার বিষয়টিকে আমরা এখানে আলাদা করে নিচ্ছি। যদিও একথা স্মরণ করিয়ে দিই যে, বানান 'সংশোধন' আর 'নতুন বানান 'গ্রহণ'-এর প্রোগ্রাম খুব আলাদা নয়। দ্বিতীয়টির চেষ্টা বলিষ্ঠ ও সার্বিকভাবে শুরু করলে, প্রথমটি আপনা থেকেই সিদ্ধ হবে।

৩ প্রাচীন ও বর্জিত বানানের এলাকা

প্রাচীন ও বর্জিত বানান কোথায় কোথায় বেশি লক্ষ করি? খুব উপস্থিত ধারণামতো তার একটা তালিকা করা যেতে পারে :

ক. দোকানের সাইনবোর্ড, প্রচারপত্র, পোস্টার ইত্যাদিতে

খ. কিছু পত্র-পত্রিকায়

গ. শিশুপাঠ্য নানা বইয়ে

ঘ. স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের অভ্যাসে

একটি বিশেষ চিন্তা থেকে এই চারটি ক্ষেত্রকে সাজানো হয়েছে। সেটি শিশুর (বা বয়স্কের) বানান-শিক্ষার সঙ্গে সম্পর্কিত। আমরা ধরে নিচ্ছি যে, আমাদের প্রাথমিক বানান শিক্ষা আদ্যত অভিধান থেকে হয় না। হয় উপরের চারটি প্রত্যক্ষ উৎস থেকে। বলা বাহুল্য গুরুত্বের বিবেচনায় ঐ চারটি উৎস এক শ্রেণীর নয়। আমাদের হিসাবে শিশুর বানান-শিক্ষায় প্রথমে স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং পাঠ্য বইয়ের ভূমিকা সবচেয়ে বেশি। ফলে এইখানে তাকে যদি ভ্রান্ত বা বর্জিত বানান অভ্যস্ত করানো হয় তাহলে সেই বানান সে দীর্ঘদিন, হয়তো-বা আজীবন, বহন করে। বাংলা অভিধানের পিছনকার বাংলা বানানের নতুন নিয়মাবলি পড়ে সে বানান স্থির করে না। বড় জোর পরে সংশয়স্থলে সে অভিধানের পৃষ্ঠা উলটে বানানটি দেখে নেয় মাত্র। পত্রপত্রিকার বানানও তাকে প্রভাবিত করে, এমন-কী সাইনবোর্ড, প্রচারপত্র ইত্যাদিরও তার বানান শেখার (বা ভুলে যাওয়ার) ব্যাপারে কিছুটা দান আছে। অনেক শিক্ষকই নিশ্চয়ই মনে রেখেছেন, কী করে কয়েক বছর আগে একটি বাংলা ছায়াচিত্রের পোস্টারে ব্রজবুলী এই ভুল বানানে 'ব্রজবুলি' কথাটি উৎকীর্ণ থাকায়—ছেলেমেয়েদের পরীক্ষার খাতায় 'ব্রজবুলী' লেখার পরিমাণ কী সাংঘাতিক ভাবে বেড়ে গিয়েছিল। দোকানের সাইনবোর্ড ইত্যাদিতে, যাত্রার বিজ্ঞাপনে, দেয়ালে সাঁটা নানা প্রচারপত্র ও পোস্টারে ভুল বানানের সঙ্গে বর্জিত বানানের সংখ্যাধিক্য চোখে না পড়েই পারে না। খুব কম 'দশকর্মা' ভাণ্ডারেই শুধু 'ম' পাই, প্রায় সর্বত্রই 'র্ম্ম'। 'র্য' প্রায় সর্বত্রই 'র্য্য'। ভুল বানানের মধ্যে 'অঞ্জলী', 'গীতাঞ্জলী' 'দুর্গা' (পুজো উপলক্ষ্যে ব্যানারে পোস্টারে চাঁদার রসিদে) বিশেষ করে চোখে পড়ে।

পত্রপত্রিকার মধ্যে বর্জিত বানানের প্রচলন বেশি চোখে পড়ে একটু রক্ষণশীল, বিশেষত ধর্মবিষয়ক পত্রপত্রিকায় এবং মফস্বল বাংলার সাপ্তাহিক বা পাক্ষিক সংবাদপত্রগুলিতে। এঁরা, বিশেষত ধর্মীয় পত্রপত্রিকাগুলি

বানানে কেন রক্ষণশীলতা দেখান তা জানি না। ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের মাসিক মুখপত্র 'প্রণব'-এর উপশিরোনাম 'ধর্ম্ম ও জাতীয়তার বাণী'-তে 'ধর্ম' ঐ বানানেই ব্লক থেকে মুদ্রিত। এই পত্রিকার ভাদ্র ১৩৯১ সংখ্যার সূচিপত্রে 'শ্রীশ্রীযুগাচার্য্য', 'স্বামী নির্ম্মলানন্দ', 'চক্রবর্ত্তী', 'ভট্টাচার্য্য', 'বার্ত্তা' ইত্যাদি নাম, পদবী ও শব্দ এই এই বানানেই মুদ্রিত। ভিতরে "পণপ্রথা : এক সামাজিক অভিশাপ" প্রবন্ধে এই সব প্রাচীন বানান লক্ষ করি :

১৬৬ পৃ. : স্ফূর্ত্তি, বল্লে, ফন্দ, বেদনার্ত্ত

১৬৭ পৃ. : স্মার্ত্ত, পর্য্যন্ত, পূর্ব্বক,

১৬৮ পৃ. : বর্দ্ধমান, মর্ম্মার্থ, আশ্চর্য্য, মর্য্যাদা,
নির্ব্বোধ, বর্ত্তমান, বিধর্ম্মী, বর্জ্জন,
দুর্ব্বহ, স্মার্ত্ত

১৬৯ পৃ. : ঊর্দ্ধ, সর্ব্ব, পূর্ব্ব, কর্ত্তৃপক্ষ, রক্তচক্ষু,
পর্য্যাপ্ত

১৭০ পৃ. : কার্য্যকর, কর্ম্ম, ধর্ম্ম, পর্য্যায়,

১৭১ পৃ. : কপর্দ্দক, নির্ল্লোভ, ঊর্দ্ধ,

অবশ্য এও ঠিক যে, এই পত্রিকায় লেখকের ব্যক্তিগত বানানরীতিকে মান্য করার দৃষ্টান্তও পাশাপাশি চোখে পড়ে। অধ্যাপক জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী নতুন রীতির বানান লেখেন, ফলে তাঁর মুদ্রিত প্রবন্ধে এই পত্রিকাতেই আবার নতুন বানানরীতি প্রতিফলিত[৮]। কিন্তু পত্রিকার আয়োজকদের মূল অভ্যাস যে প্রাচীন বানানের, তার প্রমাণ সূচীপত্রটি। ঐ প্রবন্ধের সঙ্গে অধ্যাপক চক্রবর্তীর পদবীটি 'চক্রবর্তী' ছাপা হলেও সূচিপত্রে তা 'চক্রবর্ত্তী'[৯] ছাপা হয়েছে। তবে কখনো কখনো নতুন বানানের অনুপ্রবেশ যে না ঘটেছে, তা নয়। যেমন সঙ্ঘের গ্রন্থাবলির বিজ্ঞাপনে [২য় মলাট], কিংবা 'সঙ্ঘ-বার্ত্তা' অংশে (১৯৮—২০০) শিরোনামে 'বার্ত্তা' এই প্রাচীন বানান থাকা সত্ত্বেও অন্যত্র নতুন বানানই গৃহীত হতে দেখি। এতেই বোঝা যায় যে, 'প্রতিবাদী'দের থেকে এই দৃষ্টান্তগুলি আলাদা। এগুলিতে প্রাচীন বর্জিত ও অনুপদিষ্ট বিকল্পকে গ্রহণ কোনো সজ্ঞান যুক্তি বা পরিকল্পনার দৃষ্টান্ত নয়, কেবল দীর্ঘাচরিত অভ্যাস মাত্র।

আমি অবশ্য পত্রিকাটি ধর্মীয়, বা ধর্মসংগঠনের বলেই বানান-বিষয়ে এর এই রক্ষণশীলতা এখন সর্বাঙ্গীণ দাবি করছি না। অনেক সময় ধর্মসম্পর্কিত রচনা বা গ্রন্থে সংস্কৃত গ্রন্থ বা সূত্রের সঙ্গে একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রাখতে হয় বলেই বাংলা লেখাতেও তার একটা অসচেতন প্রভাব চলে আসে। সংস্কৃত রচনার অনুবাদ, উদ্ধৃতি ইত্যাদির প্রাবল্যে প্রাচীনত্বের যে আবহ তৈরি হয় তাতে প্রাচীন বানান খুব একটা অসংগত লাগে না। তবে

অভ্যাসের ব্যাপারটাই বেশি চোখে পড়ে। উদ্বোধন কার্যালয় প্রকাশিত 'উপনিষৎ গ্রন্থাবলী' নতুন বানানকে চমৎকার গ্রহণ করেছে দেখতে পাই, কিন্তু প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরির[১০] 'শ্রীগীতা'র ১৯৬২-র সংস্করণেও—এটিই আমার কাছে আছে—প্রাচীন বানান বজায় রেখেছে। আশ্চর্যের কথা এই যে একই প্রকাশকের 'আধুনিক বাংলা ব্যাকরণ'[১১] প্রাচীন বানানকে বর্জন করেছে। সে বইয়ের 'আধুনিক' হওয়ার দায় আছে।

৪ শিশু-রচনা

শিশুদের জন্য লেখা বইগুলির কথা আলাদা করে আলোচনা করতে হয় এই জন্য যে, শিশুর মনে বানানের যে-'ইমেজ'টি তৈরি হয় তা খাড়া করতে তার সর্বক্ষণের সংগী বা প্রিয় বইগুলির ভূমিকা খুবই বেশি। কিন্তু খুব কম কয়েকটি প্রকাশক ছাড়া অন্যরা এ বিষয়ে সম্যক সচেতনতার পরিচয় দেন না, এটাই দুঃখের কথা। অধিকাংশ বইয়ে অসংখ্য বানানভুলও থাকে। এ বিষয়ে প্রথম পুরস্কার পাবার অধিকারী আজকাল শহরাঞ্চলের ছেলে-মেয়েদের 'অবশ্যপাঠ্য' কমিক্‌স জাতীয় বইগুলি। এগুলিতে অনুবাদ যে শুধু অশিক্ষিতের হয়[১২] তাই নয়, এতে 'সাক্ষি', 'উপকুল', পরিস্কার', 'ভেঙেগ', 'চিরকুট', 'স্লথ' ইত্যাদি বানান প্রচুর লক্ষ করা যায়।

কথা উঠতে পারে, এগুলি শিশুরা পড়ে আর ফেলে দেয়, কাজেই এগুলি থেকে স্থায়ী বানানের কোনো 'ইমেজ' তৈরি হয় কি? এগুলি সত্যি সত্যি পড়ে ফেলে দেয় কি না শিশুরা জানি না,—আমি নিজে কোনো কোনো বাড়িতে কমিক্‌সের বাঁধানো ভল্যুম দেখেছি—আর শিশুদের একটা দৃঢ়-মূল অভ্যাসই হচ্ছে একই বই বহুবার করে পড়া—তার ফলে এসব বই থেকেও বানানের ইমেজ তৈরি হতে পারে। পত্রপত্রিকার ক্ষেত্রে শিশুদের পাক্ষিক 'আনন্দমেলা' বানান-বিষয়ে বিশেষ যত্ন নেয় সেটা লক্ষ করি।

শিশু সাহিত্য-সংসদ ছোটদের বইয়ের বিখ্যাত প্রকাশক। তাঁরা অত্যন্ত মমতা ও যত্নের সংগে শিশুদের জন্য সুপাঠ্য সব বই ছাপান। এসব বই শিশুরা দীর্ঘদিন ধরে বারবার পড়ে। ফলে এঁদের বইয়ে যখন 'বাড়ি' 'তাঁতি-'র বদলে 'বাড়ী', 'তাঁতী', 'ফিঙে'-র বদলে 'ফিঙেগ', 'শিঙে'-র বদলে 'শিঙেগ', অথচ 'ক্যাঙগারু'-র বদলে 'ক্যাঙারু' ছাপান, তখন দুঃখ হয়। আর বিস্ময়ের কথা এই যে, এঁদের সমস্ত ছড়ার বইয়ে এক রকমের বানান এঁরা অনুসরণ করেন না। আবার এক বইয়েই 'ঠাকুরবাড়ি'-তে হ্রস্ব-ইকার দেন, কিন্তু 'শাড়ি' লেখেন অনাবশ্যক দীর্ঘ-ঈকার দিয়ে। একই

ছড়ায় পরপর দু-লাইনে 'হোলো' এবং 'হল' আছে এঁদের বইয়ে, কোথাও 'পড়লো' লেখেন ও-কার দিয়ে কিন্তু 'বল্ল'তে শুধু 'ল্ল' লেখেন প্রাচীন ধরনে। 'পুর' লেখেন নব্য ধরনে হ্রস্ব উ-কার দিয়ে, কিন্তু 'ধূলো' লেখেন পুরানো রীতিতে দীর্ঘ-ঊকারে। 'ছড়া-ছবিতে পাখি' সিরিজের বইগুলিতে 'পাখি' হ্রস্ব-ইকার পায়, কিন্তু সুনির্মল বসুর 'ছড়া ছবিতে অ আ ক খ' বইয়ে 'পাখী' 'গাড়ী' 'বাঁশী' বানান আছে। এঁদের অন্য একটি বইয়ে 'বাঁশি'ও ছাপা আছে। এঁরা ছোটদের বইকে সুন্দর ও মনোগ্রাহী করে তুলেছেন বলেই এই অসংগতিগুলি বেশি করে চোখে পড়ে। আশা করি পরে এগুলি সংশোধিত হবে।

যে-সব প্রকাশক রঙ-বেরঙের মলাটে ছোটদের জন্য অজস্র বই প্রকাশ করে চলেছেন, তাঁদের এসব বিষয়ে সচেতনতা আরো কম। কামিনী প্রকাশালয়ের 'ভূত অদ্ভুত কিম্ভূত' বইয়ে অদ্ভুত কিম্ভূত'সব বানানভুল এবং অসংগতি আছে, যা ভূতুড়ে ব্যাপার বলে উড়িয়ে দেওয়া মুশকিল। তাতে 'গম্ভির', 'সমুহ' 'উড়িয়ে'-র বদলে 'উঁড়িয়া' ("হেসেই উড়িয়া দিলুম"), মূর্ধন্য ণ-হীন 'দক্ষিন', ব-ফলা-হীন 'উর্ধ', 'শুস্রষা' 'মুহুর্ত', য-ফলা-হীন 'বন্দোপাধ্যায়' (হওয়া উচিত 'বন্দ্যোপাধ্যায়'), 'ষ্ফুর্তি' এইসব বানান আছে তাই নয়, ছাপার ভুলেরও কোনো মা-বাপ নেই। শৈব্যা পুস্তকালয়ের নতুন ছাপা 'রাঙা ছবি'-তে[১৩] (যোগীন্দ্রনাথ সরকার) পাই প্রাচীন 'পাখী', 'দুষ্টুমী', 'খুসী', 'মূর্ত্তি', 'কর্ম্ম', 'ভাঙগুলো', 'বাড়ী', 'দেরী' ইত্যাদি। এমন-কী খুব সুন্দর করে ছাপা রঙচঙে নন্দন সংস্করণ 'বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগ'-এও[১৪] 'মংগল' 'উচিৎ' 'কীটপতংগ', 'কূল' ('বংশ' অর্থে) 'অংক' ইত্যাদি ভুল বানান দেখে বিস্মিত হলাম।[১৫]

উদাহরণের সংখ্যা অনন্তরূপে বাড়িয়ে যাওয়া সম্ভব। সে চেষ্টা থেকে বিরত থেকে আর একটিমাত্র দৃষ্টান্ত দিই। সেটি 'ঠাকুরমা'র ঝুলি', দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের স্মরণীয় রচনা। কিন্তু এই বইয়ের সাম্প্রতিক মুদ্রণেও[১৬] কোনো অজ্ঞাত কারণে প্রাচীন বানানই বজায় রাখা হচ্ছে। এমন-কী মূর্ধন্য ণ দিয়ে 'সোণা', দীর্ঘ-ঈকার দিয়ে 'হাতী', 'পাখী', 'কুঠরী' —সবই আছে। জানি না এতে বইটির ভাষাভঙ্গি ও চেহারার 'অ্যান্টিক' চেহারা ফুটে ওঠে কি না। আমাদের মতে বানান-রীতি আধুনিক হলেও শিশু পাঠক-পাঠিকার কাছে এ বইয়ের চিরকালিক উপভোগ্যতার বিন্দুমাত্র ক্ষতি হবে না।

প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখি, উচ্চমাধ্যমিকের পাঠ্য গদ্যসংকলনে অক্ষয়কুমার দত্তের "পল্লীগ্রামস্থ প্রজাদের দুরবস্থা বর্ণন" প্রবন্ধটি মূলের প্রতি আনুগত্যে যে-বানানে ছাপা হয়েছে, তা অসংগত ও বিভ্রান্তিকর।

৫ শিক্ষক-শিক্ষিকাদের অভ্যাস

শিক্ষক-শিক্ষিকাদের অনেকে যে অনেক বানান জানেন না, এবং 'নতুন' বানানও জানেন না, তা শুনতে যতই অবিশ্বাস্য লাগুক, বাস্তবে অসত্য নয়। এ সম্বন্ধে সাক্ষ্য-প্রমাণ অবশ্য দেওয়া মুশকিল, কিন্তু বানান-সচেতন অভিভাবকদের অনেকেরই পরিচিত একটি-দুটি অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করলেই হবে। অনেকেই নিশ্চয়ই লক্ষ করেছেন স্কুলে তাঁর সন্তানটির খাতায় ভুল বানানে শিক্ষক শিক্ষিকা মন্তব্য করেছেন, কিংবা 'বাড়ি' লিখলে তিনি সেটি কেটে 'বাড়ী' করে দিয়েছেন। অভিভাবক সন্তানের কাছে গ্রহণযোগ্য বানানটি তুলে ধরলে সে বলেছে, 'স্যার/ দিদিমণি/ আণ্টি / মিস্ যা লিখেছেন সেটাই ঠিক, তুমি বানানের কী জানো ?' সাক্ষ্য-প্রমাণ একেবারে পাওয়া যায় না তাও নয়, এবারেই (১৯৮৪) বি. এ. পার্ট ওয়ান-এর ইলেক্টিভ বাংলা পরীক্ষার (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়) পরীক্ষকদের জন্য জনৈক প্রধান পরীক্ষকের নিজের হাতের লেখার সাইক্লোস্টাইল করে একটি নির্দেশপত্র এই নিবন্ধ লেখকের হাতে পড়েছে। তাতে সর্বত্রই 'পরীক্ষা' কথাটি 'পরিক্ষা' লেখা হয়েছে। প্রধান পরীক্ষকই যদি এ কাজ করতে পারেন তাহলে স্কুলের স্যার-দিদিমণিদের নিন্দা করি কোন্ মুখে ?

৬ উপসংহার

এসব থেকেই বোঝা যায়, বানান সংস্কার, আর সংস্কার-করা নতুন বানান প্রচলনের মধ্যে দূরত্ব অনেক—আমাদের মতো গরিব দেশে তাতে শতাব্দীর পর শতাব্দী কেটে যেতে পারে। সমস্যাটা উৎপাদনের যতটা, তার চেয়ে অনেক বেশি বিতরণের—আমাদের অর্থনীতির একটা মৌলিক সমস্যার মতোই।

নতুন বানানটা কী, তা দেখতে হলে সকলকে যদি অভিধান দেখতে হয় তাহলে কাজটা কঠিন হয়ে পড়ে। যদিও অভিধান উলটে দেখার অভ্যাসটা খারাপ নয়, বেশ ভালোই। তবে ইংরেজি বানানের বেলায় সে উৎসাহ যতটা থাকে, বাংলার বেলায় ততটা থাকে না। প্রথমত বাংলা বানান আমরা মোটামুটি জানি বলেই ধরে নিই, দ্বিতীয়ত বাংলা বানান ভুল করলে ইংরেজি বানান ভুলের লজ্জা অনুভব করি না।

তাহলে সাধারণ মানুষকে 'শুদ্ধ', সদ্যতন বানানের দৃষ্টান্ত দেখানোর দায়িত্ব কার ? সে-দায়িত্ব মুদ্রিত মিডিয়া, অর্থাৎ সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্রের, সে দায়িত্ব পাঠ্যপুস্তক ও শিশু-রচনার প্রকাশকদের, সব রকম বইয়ের প্রকাশকদের, সে দায়িত্ব শিক্ষক-শিক্ষিকাদের। কিছু লোককে বিশেষ দায়িত্ব তুলে নিতেই হবে ব্যাপক জনশিক্ষার জন্য। বানান-সংস্কার শিক্ষারই অঙ্গ।

পরিশিষ্ট : ১

বাংলা বানান ও রবীন্দ্রনাথ

মুখের ভাষা যে সময়ান্তরে বদলে যায় সে সম্বন্ধে আমরা সবসময় সচেতন থাকি না, কিন্তু কেউ ধরিয়ে দিলে ব্যাপারটা বুঝতে পারি এবং এই পরিবর্তন মেনেও নিই। কিন্তু এই মুখের ভাষাকে যেভাবে লিখি আমরা, সেই লেখার রীতিপদ্ধতিকে আমরা খানিকটা স্থায়ী মনে করি। কথার তুলনায় লেখার স্থায়িত্ব ও ধ্রুবত্ব বেশি বলেই সংস্কৃতে প্রবচন তৈরি হয়েছিল 'শতং বদ, মা লিখ'। এই স্থায়িত্বের ও ধ্রুবত্বের ধারণা থেকেই লেখার ব্যাপারে আমরা নিজেরাও রক্ষণশীল হয়ে পড়ি, লেখার রীতি-পদ্ধতি সহজে বদলাতে চাই না—তা সে লিপিই হোক, লিপির পরম্পরা-বিন্যাসই হোক, কিংবা বানানই হোক। আর যে-সব ভাষার লিখন-পদ্ধতি দীর্ঘদিনের ইতিহাসের পথ ধরে গড়ে উঠেছে, বাংলা-হিন্দি-গুজরাটি-মলয়ালম ইত্যাদি ভারতীয় ভাষা যেমন—সেগুলির ক্ষেত্রে অভ্যস্ত লিপির বা বানানপদ্ধতির পথ ছেড়ে বেরোবার ইচ্ছাটা হওয়াই খুব কঠিন।

বেরোতে যে হবেই এমন কোনো কথা নেই। কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় বানান-পদ্ধতির জটিলতার ফলে নানা রকমের অসুবিধা হয়। শিশুর বানান শিখতে দেরি হয় অর্থাৎ লেখাপড়ার সময় নষ্ট হয়, প্রেসে ছাপার চিহ্নের সংখ্যা বেড়ে গেলে ছাপার পরিশ্রম ও ব্যয় বাড়ে, টাইপরাইটার বা ওই ধরনের লিখনযন্ত্রে দ্রুত বা স্পষ্ট লেখা সম্ভব হয় না, নিওন আলোর টিউবে বা ব্লক টাইপে বর্ণ লেখার অসুবিধে হয়—এইরকম অজস্র সমস্যা। অর্থাৎ শিক্ষার দিক থেকে বানানরীতি বেশি জটিল বলে মনে হয়, এবং 'টেকনোলজি অফ প্রিন্টিং' এর দিক থেকে তাকে সময়ের তুলনায় পশ্চাদ্‌বর্তী লাগে। ফলে বানান সংস্কারের কথা ওঠে। ভাষার একটি সংহত সর্বমান্য রূপ গড়ে তুলতে হলে তার বানান পদ্ধতিকে সহজ, অব্যতিক্রমী ও সংগতিপূর্ণ করে তুলতেই হবে। ভাষায় 'স্ট্যাণ্ডারডাইজেশন'-এর জন্যই বানান সংস্কার আবশ্যিক। তাহলে শিক্ষার সুরাহা হবে, মুদ্রণ ও সম্প্রচারের সহায়তা হবে।

কিন্তু কাজটা ভাবতে যতটা সহজ, কাজে ততটা সহজ নয়। আমাদের

লিপি ও বানান-অভ্যাস খুবই রক্ষণশীল—এ কথা আগে উল্লেখ করেছি। দ্বিতীয় কথা এই, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে যে লিপি ও বানানের পদ্ধতি গড়ে ওঠে তার অধিকাংশেরই পিছনে কিছু কিছু যুক্তি ও ন্যায্যতা থাকে—সেটাই আমাদের ওই বানানকে মানতে বাধ্য করে। ন্যায্যতা ও সংগতির এই বোধ আমাদের কল্পিতও হতে পারে, কিন্তু পুরুষপরম্পরায় আমরা সংস্কৃতিগতভাবে ওই বানানকে 'র‍্যাশনালাইজ' করে গ্রহণ করি, ফলে ওই বানানের বিরুদ্ধে বা সংস্কারের পক্ষে যুক্তিগুলিতে আমাদের সায় দিতে প্রথমে ইচ্ছা করে না।

আরেকটা অসুবিধার সৃষ্টি হয় কোনো ভাষার বানানের বিশেষ চরিত্র থেকে। যেমন বাংলা ভাষার বানানের চরিত্র। এই ভাষার বানান-পদ্ধতির বিষয়টি বুঝতে হলে এর শব্দভাণ্ডারের শব্দগুলির জাতগোত্রের হিসাব রাখতেই হবে। আমরা জানি, বাংলার লিখিত ভাষায় বেশ কিছু শব্দ আছে যেগুলি সংস্কৃত ভাষা থেকে ধার করা। সেগুলির উচ্চারণ আমরা সংস্কৃতের মতো করি না, কিন্তু লেখার বেলায় সংস্কৃতের বানান থেকেই লিখি। সে বানানের সঙ্গে বাংলা উচ্চারণের অনেক পার্থক্য দাঁড়িয়ে যায়। এই শব্দগুলি হল 'তৎসম'। তা ছাড়া কিছু শব্দ আছে, 'ভগ্নতৎসম' বা 'অর্ধতৎসম—সেগুলি মুখের উচ্চারণে ঐ তৎসম শব্দের ভাঙাচোরা রূপ—যেমন ক্ষমতা খ্যামতা, ধর্ম ধরম ইত্যাদি। কিছু তৎসম শব্দ উচ্চারণ করতে পারিনি বলে, বা কবিতার প্রয়োজনে যুক্তব্যঞ্জন ভেঙে কোমল করার দরকার হয়েছিল বলে অর্ধতৎসম শব্দের সৃষ্টি। আর বেশ কিছু শব্দ আছে যেগুলি এক সময় সংস্কৃত শব্দ ছিল, তারপর প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে প্রাকৃতে তাদের চেহারা বদলে যায়, আবার হাজার খানেক বছর আগে বাংলা-হিন্দি-ওড়িয়া ইত্যাদি ভাষায় আবার তাদের ভাঙচুর ঘটে। এগুলি হল 'তদ্ভব'। অর্থাৎ সংস্কৃত থেকে গৃহীত, বিকৃত ও বিবর্তিত—মোট তিন ধরনের শব্দ আমাদের বাংলা ভাষায় আছে—তৎসম, অর্ধতৎসম ও তদ্ভব। এ ছাড়া আছে দ্রাবিড়, অস্ট্রিক, তিব্বত-বর্মী ইত্যাদি বংশের নানা ভাষার এবং অজ্ঞাত উৎসের কিছু শব্দ—যেগুলির কুলজী সম্বন্ধে নিশ্চিত নই বলে আমরা সেগুলিকে 'দেশী' নাম দিয়ে কর্তব্য শেষ করছি। তার উপরে আছে একদিকে ফারসি (এবং সেই সূত্রে কিছু আরবি), এবং অন্যদিকে ইংরেজি, ফরাসি, পর্তুগিজ ইত্যাদি ভাষার কিছু শব্দ। সেগুলিও তৎসমর মতোই ধার করা, তবে সেগুলিকে আমরা 'বিদেশী' বলে থাকি।

এই যে তৎসম অর্ধতৎসম তদ্ভব দেশী বিদেশী—এর মধ্যে দেশী বিদেশী শব্দের বানান নিয়ে সমস্যা সবচেয়ে কম। সমস্যা কিছু আছে, কিন্তু তা নিয়ে এখনই ব্যতিব্যস্ত হওয়ার কিছু নেই। 'হিসেব' কথাটায় দন্ত্য-স হবে

না তালব্য-শ হবে—অর্থাৎ মূল ফারসি বর্ণ ও উচ্চারণকে স্মরণ করব, না স্বাভাবিক বাংলা উচ্চারণকে মান্য করব বানানে—এই হল সমস্যা। কিন্তু সংস্কৃতের স্টকের ঐ তিন ধরনের শব্দের যে সব সমস্যা তার তুলনায় এ সমস্যা তুচ্ছ।

দেখা যাচ্ছে যে, তৎসম শব্দের মূলানুসারী অর্থাৎ সংস্কৃত বর্ণমালাশ্রিত বানান মেনে নিয়েছি বলে তার প্রভাব অর্ধতৎসম এবং তদ্ভব শব্দের বানানেও পড়েছে। এই শব্দগুলির সর্বাঙ্গে না হোক, অন্ততপক্ষে আরম্ভে এবং অন্যত্র কোথাও এদের তৎসম রূপকে স্মরণ ও বহন করি আমরা। যেমন সংস্কৃতে হয়তো 'ষণ্ড' কথাটির শুরুর মূর্ধন্য ষ মূর্ধন্য রূপেই উচ্চারিত হত, ফলে তার বানান ছিল উচ্চারণ-সংগত। কিন্তু তার তদ্ভব রূপ 'ষাঁড়' আমরা উচ্চারণ করি 'শাঁড়'। এই 'শাঁড়' এখন 'বাংলা' শব্দ। যেগুলি এইরকম বাংলা শব্দ, সেগুলিকে কি আমরা ধ্বনিসংগত বানানে লিখব না? তৎসম শব্দগুলিও তো উচ্চারণের দিক থেকে বাংলা—সেগুলিকেও কি আমরা উচ্চারণ অনুযায়ী বানানে লিখব না—সংস্কৃত বানানের রীতি কি আমরা বিসর্জন দেব না? বাংলা তো স্বতন্ত্র ও স্বাধীন ভাষা—তার নিজস্ব উচ্চারণরীতিকে কি আমরা বানানে এবার স্বীকার করব না?

২

গত শতাব্দীর শ্যামাচরণ গাঙ্গুলি থেকে আরম্ভ করে রবীন্দ্রনাথ এবং আজকের উৎসাহী সংস্কারক পর্যন্ত যাঁকেই বাংলা বানান সংস্কার বিষয়টি উত্তেজিত করেছে তাঁকেই উপরের ঐ প্রশ্নগুলির উত্তর খুঁজতে হয়েছে। ব্যক্তিগত অভিরুচি ও চিন্তা অনুযায়ী এক-এক জন এক এক রকম উত্তর দিয়েছেন। উত্তরের মোট তিন রকম সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে।

১. সমস্ত শব্দকেই বাংলা ভাষার উচ্চারণ মেনে ধ্বনিসংগত বানানে লিখতে হবে;

২. কিছু বানান আগের মতোই রাখতে হবে, কিছু বানান ধ্বনিসংগত করা যেতে পারে;

৩. সব বানান যেমন আছে তেমনই থাকবে।

রবীন্দ্রনাথের বানান-বিষয়ক বিভিন্ন রচনা অনুধাবন করলে দেখি যে, ধ্বনিসংগত বা ধ্বনিসংবাদী বানানের প্রতি তাঁর একটি প্রচ্ছন্ন আসক্তি থাকলেও বাংলা শব্দভাণ্ডারের মিশ্র চরিত্রের কথা ভেবে তিনি শেষ পর্যন্ত একটি বাস্তবসম্মত আপোশরফা করেছেন। অর্থাৎ উপরের দু নম্বর বিকল্পটির প্রতি তাঁর পক্ষপাত জ্ঞাপন করেছেন। মূল সমস্যাটি সম্বন্ধে

তাঁর ধারণা স্পষ্ট ছিল, তিনি বুঝেছিলেন যে, সংস্কৃত উৎস-জাত বাংলা শব্দের (তৎসম, অর্ধতৎসম ও তদ্ভব) বানানই সমস্যার মূল এলাকা—এবং এখানেই প্রাচীন ও ব্যুৎপত্তিগত বানান এবং ধ্বনিসংবাদী বানানের টানাপোড়েন চলে। তাই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানান সংস্কার সমিতি (১৯৩৫) এ বিষয়ে উদ্যোগ নেওয়ায় তিনি লেখেন—"এখনি ঠিক করবার সময়, এর বানান উচ্চারণ-ঘেঁষা হবে, অথবা হবে সংস্কৃত অভিধান ঘেঁষা।"[১]

"এর" বলতে রবীন্দ্রনাথ বুঝিয়েছেন "প্রাকৃত বাংলা"-কে। প্রাকৃত বাংলা কথাটি রবীন্দ্রনাথেরই তৈরি। যেমন তৈরি "সংস্কৃত বাংলা।" এই সংস্কৃত বাংলা-র শব্দ ও বানানগত বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মৃদু ব্যঙ্গাশ্রিত এই কথাগুলি উল্লেখ করি :

"সংস্কৃত বাংলা, অর্থাৎ যাকে আমরা সাধুভাষা বলে থাকি তার মধ্যে তৎসম শব্দের চলন খুবই বেশি। তা ছাড়া সেই-সব শব্দের সঙ্গে ভঙ্গির মিল করে অল্প কিছুকাল মাত্র পূর্বে গড় উইলিয়ামের গোরাদের উৎসাহে পণ্ডিতেরা যে কৃত্রিম গদ্য বানিয়ে তুলেছেন তাতে বাংলায় ক্রিয়াপদগুলিকে আড়ষ্ট করে দিয়ে তাকে যেন একটা ক্লাসিকাল মুখোশ পরিয়ে সান্ত্বনা পেয়েছেন ; বলতে পেরেছেন, এটা সংস্কৃত নয় বটে, কিন্তু তেমন প্রাকৃতও নয়। যা হোক, ওই ভাষা নিতান্ত অল্প-বয়স্ক হলেও হঠাৎ সাধু উপাধি নিয়ে প্রবীণের গদিতে অচল হয়ে বসেছেন। অন্ধভক্তির দেশে উপাধির মূল্য আছে।"[২]

আর "প্রাকৃত বাংলা" যে চলিত ভাষা, বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথ যাকে "কথিত বাংলা" বলেন তাই—সেটা বিশেষ করে বলে দিতে হবে না। এর বহু আগেই শ্রীনাথ সেনের একটি প্রতিবাদ-পত্রের প্রসঙ্গ তুলে রবীন্দ্রনাথ লিখে ছিলেন, "যদি প্রাকৃত ও সংস্কৃত শব্দ বাংলা শব্দের পূর্বে বিশেষরূপে জুড়িয়া ব্যবহার করা হয়, যদি লিখিত বাংলাকে 'সংস্কৃত বাংলা' ও কথিত বাংলাকে 'প্রাকৃত বাংলা' বলা যায়, তাহা হইলে আমরা আপত্তি করিতে পারি না।"[৩]

সংস্কৃত বাংলার মুখ্য উপাদান তৎসম শব্দ। প্রাকৃত বাংলার প্রধান উপাদান অ-তৎসম শব্দ। এগুলির মধ্যে আছে সংস্কৃত ভাষা থেকে পরে ধার-করা কিন্তু উচ্চারণে বাংলায় উচ্চারণ-সংগত করে ভেঙে বা বদলে নেওয়া অর্ধতৎসম (তৎসমগুলি প্রধানভাবে লিখিত ভাষার ঋণ, অর্ধতৎ-সমগুলি মুখের ভাষার), সংস্কৃত থেকে প্রাকৃতে বদলে যাওয়া তদ্ভব শব্দ। অর্ধতৎসম ও তদ্ভব—দুইই সংস্কৃত উৎসের শব্দ—সুতরাং এগুলিকে ঘিরেই বেশি তর্ক—দীর্ঘ স্বরচিহ্ন (দীর্ঘ ঈকার, দীর্ঘ-ঊকার), ঋ-কার, ঐ, ঐ-কার ঔ, ঔ-কার ইত্যাদি থাকবে কি না ; এবং ব্যঞ্জনবর্ণের দিক থেকে ঞ, ণ, য, স, ষ ইত্যাদি কতটা এদের বানানে রাখা সংগত হবে। রবীন্দ্র-

নাথের আলোচনায় এই প্রসঙ্গগুলিই বারবার এসেছে। দেশী ও বিদেশী আরো যে সব শব্দ আছে প্রাকৃত বাংলায়—সে ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ প্রায় সম্পূর্ণ ধ্বনিসংবাদী বানানের পক্ষপাতী।

তৎসম সম্বন্ধেও রবীন্দ্রনাথের দ্বিধা ছিল। "বানান-বিধি" বিষয়ে একটি প্রবন্ধে তিনি বলেছেন, "বাংলা ভাষার উচ্চারণে তৎসম শব্দের মর্যাদা রক্ষা হয় বলে আমি জানি নে। কেবলমাত্র অক্ষর বিন্যাসেই তৎসমতার ভান করা হয় মাত্র, সেটা সহজ কাজ। বাংলা লেখায় অক্ষর বানানের নির্জীব বাহন—কিন্তু রসনা নির্জীব নয়—অক্ষর যাই লিখুক, রসনা আপন সংস্কারমতোই উচ্চারণ করে চলে। সে দিকে লক্ষ্য করে দেখলে বলতেই হবে যে, অক্ষরের দোহাই দিয়ে যাদের তৎসম খেতাব দিয়ে থাকি, সেই সকল শব্দের ষোলো আনাই অপভ্রংশ। যদি প্রাচীন ব্যাকরণকর্তাদের সাহস ও অধিকার আমার থাকত, এই ছদ্মবেশীদের উপাধি লোপ করে দিয়ে সত্য বানানে এদের স্বরূপ প্রকাশ করার চেষ্টা করতে পারতুম।"[৪] এ জন্য প্রায়ই তিনি বাংলা বানানের ক্ষেত্রে একজন 'কেমাল পাশা'র আবির্ভাবের জন্য প্রার্থনা করেছেন।[৫] এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ও বাংলা তৎসম শব্দগুলিকে উচ্চারণের দিক থেকে 'অর্ধতৎসম' আখ্যা দিয়েছিলেন।

তবু তৎসম শব্দের বানানে রবীন্দ্রনাথ শেষ পর্যন্ত ধ্বনি-সংবাদী বানান আরোপ করার বিষয়টা নিয়ে তেমন পীড়াপিড়ি করেননি। ১৯৩৬-এর বানান সংস্কার সমিতির সুপারিশ দেখবার পর তিনি অকুণ্ঠভাবে লিখে-ছিলেন, "তৎসম শব্দ সম্বন্ধে আমি নমস্যদের নমস্কার জানাব।"[৬] এবং একথা যে হঠাৎ-করা সিদ্ধান্ত, তা নয়। সমস্ত দ্বিধার মধ্যেও রবীন্দ্রনাথ অনেক আগে থেকেই ভেবে আসছিলেন যে তৎসম শব্দের বানান মূলত তদবস্থ রেখে দেওয়া উচিত, যেমন ১৩২৩ বৈশাখে লেখা এক প্রবন্ধে তাঁর স্বীকৃতি —"সংস্কৃত শব্দ বাংলায় অনেক আছে, এবং চিরদিন থাকিবেই—সেখানে সংস্কৃতর রূপ ও প্রকৃতি আমাদের মানিতেই হইবে—কিন্তু যেখানে বাংলা শব্দ বাংলাই সেখানেও সংস্কৃতের শাসন যদি আমরা টানিয়া আনি, তবে রাস্তায় যে পুলিশ আছে ঘরের ব্যবস্থার জন্যও তাহার গুঁতো ডাকিয়া আনার মতো হয়। সংস্কৃতে কর্ণ লিখিবার সময় মূর্ধন্য ণ ব্যবহার করিতে আমরা বাধ্য, কিন্তু কান লিখিবার বেলাও যদি সংস্কৃত অভিধানের কানমলা খাইতে হয় তবে এ পীড়ন সহিব কেন ?"[৭]

ফলে তৎসম শব্দের বানান সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের আনুপূর্বিক মতামতে দ্বিধা থাকলেও অস্পষ্টতা নেই। তিনি শেষ পর্যন্ত ওই সংস্কৃত বাংলা ও প্রাকৃত বাংলার দ্বিভাজন স্বীকার করে নিয়ে সংস্কৃত বাংলা বা সাধু সাহিত্যিক

গদ্যে "সংস্কৃত অভিধান-ব্যাকরণের প্রভুত্ব মেনে নিতে"[৮] স্বীকৃত হয়েছেন। অন্যত্র আরেক প্রসঙ্গে ১৯৩৭ সালে বলেছেন, "তৎসম শব্দে দীর্ঘ ঈ দিতে আমরা বাধ্য—কিন্তু তদ্ভব শব্দে আমাদের স্বরাজ খাটবে না কেন?"[৯]

৩

কিন্তু অন্যান্য শব্দে? অর্ধতৎসম, তদ্ভব, দেশী ও বিদেশীর ক্ষেত্রে? এগুলির মধ্যে তদ্ভব সম্বন্ধেই রবীন্দ্রনাথের আলোচনা বেশি, কারণ তদ্ভব কথা 'কান' 'পান' 'বানান'-এ মূর্ধন্য ণ লেখা সমর্থন করেন না বলে তাঁকে দেবপ্রসাদ ঘোষের কাছ থেকে প্রচুর অনুযোগ ও তিরস্কার সহ্য করতে হয়েছে। বীরেশ্বর সেনও এক সময় তাঁকে জানিয়েছিলেন যে, "মূল শব্দের সহিত তদ্ভব শব্দের বানানের সাদৃশ্য থাকা উচিত।"[১০] রবীন্দ্রনাথের মত এ বিষয়ে কোনো সংশয়ে দ্বিধাগ্রস্ত নয়। তাঁর অকুণ্ঠিত সিদ্ধান্ত—"পুরাতত্ত্বের বোঝা মিউজিয়ম বহন করিতে পারে। হাটে বাজারে তাহাকে যথাসাধ্য বর্জন করিতে হয়। এই জন্যই লিখিবার বেলায় আমরা 'নুন' লিখি, পণ্ডিতই জানেন উহার মূল শব্দে একটা মূর্ধন্য ণ ছিল। এই জন্যেই লিখিবার বেলা গাম্ভলা না লিখিয়া আমরা গামলা লিখি, পণ্ডিতই অনুমান করেন উহার মূল শব্দ ছিল কুম্ভ। আমরা লিখিয়া থাকি আঁতুর ঘর, তাহাতে আমাদের কাজের কোনো ক্ষতি হয় না—পাণ্ডিত্যের দোহাই মানিয়া যদি অন্ত্র-কুট্‌ ঘর বানান করিয়া আঁতুর ঘর পড়িতে হইত তবে যে-শব্দ প্রাচীনের গর্ভ হইতে বাহির হইয়াছে তাহাকে পুনশ্চ গর্ভবেদনা সহিতে হইত।"[১১]

১৩৪৩-এর পৌষ-এ যদিও তিনি বলছেন "এখন ঠিক করবার সময় এর (অর্থাৎ প্রাকৃত বাংলার) বানান উচ্চারণ ঘেঁষা হবে অথবা হবে সংস্কৃত অভিধান ঘেঁষা।"[১২] কিন্তু তিনি নিজেই এ সম্বন্ধে একটি ব্যক্তিগত সংকল্প ও ইচ্ছা পোষণ করছেন। অন্যত্রও বলছেন, "এখনো প্রাকৃত বাংলায় বানানের পাকা দলিল তৈরি হয়নি। এই সময় যদি উচ্চারণের প্রতি সম্পূর্ণ সম্মান রক্ষা করে বানানের ব্যবস্থা হতে পারত তাহলেও কোনো পক্ষ থেকে নালিশ-ফরিয়াদের যে কোনো আশঙ্কা থাকত না তা বলি নে, কিন্তু তার ধাক্কা হত অনেক কম।"[১৩] তবু নিজে যেমন ব্যক্তিগতভাবে তদ্ভব বানানের ধ্বনি-সংবাদী প্যাটার্নের কথা ভাবছেন, তেমনই মেয়েদের বানানে উচ্চারণ-সিদ্ধ 'কোলকাতা' বানান দেখে খুশি হচ্ছেন,[১৪] প্রাক্তন ইতিহাসের প্রাকৃত আর পালি ভাষার লিপিকরদের কিংবা বাঙালি পুথির লিপিকরদের প্রশংসা করেছেন ধ্বনি-সংগত বানান লিখেছিলেন বলে। কিন্তু শেষ

পর্যন্ত বলেছেন, "বাংলা বানানের আগাগোড়া ধ্বনি-অনুসারী করব এমন সাহস আমার নেই—যদি বাংলায় কেমাল পাশার পদ পেতুম তাহলে হয়তো এই কীর্তি করতুম—এবং সেই পুণ্যে ভাবীকালের অগণ্য শিশুদের কৃতজ্ঞতাভাজন হতুম। অন্তত তদ্ভব শব্দে যিনি সাহস দেখিয়ে ষত্বণত্ব ও দীর্ঘহ্রস্বের পণ্ডপাণ্ডিত্য ঘুচিয়ে শব্দের ধ্বনিস্বরূপকে শ্রদ্ধা করতে প্রবৃত্ত হবেন তাঁর আমি জয়জয়কার করব।"[১৫] এবং বহু আগে (১৩০৮) তদ্ভবের বানান বিষয়ে তাঁর পুরানো মত আরেকবার স্মরণ করি—"যে সকল সংস্কৃত শব্দ অপভ্রংশের নিয়মে পুরা বাংলা হইয়া গেছে সেগুলির ধ্বনি-অনুযায়িক বানান হওয়া উচিত। প্রাকৃত ভাষার বানান ইহার উদাহরণস্থল।"[১৬] অন্যত্র তদ্ভব বানানের উদাহরণ তিনি দিয়েছেন, এবং তদ্ভব শব্দ ও স্ত্রীলিঙ্গ প্রত্যয়েও দীর্ঘ-ঈকার দিতে তাঁর অসম্মতি আমরা এই জন্যই লক্ষ করি।[১৭] 'কি' এবং 'কী'-র মধ্যে অর্থ ও উচ্চারণ-ভেদ বানানও তিনি প্রকাশ করতে চান।[১৮]

৪

তাহলে লক্ষ করি, তৎসম-শব্দের জন্য গৃহীত ও স্বীকৃত বানান, এবং তদ্ভব (এবং সম্ভবত অন্য সবরকরের প্রাকৃত বাংলা শব্দের জন্য) ধ্বনি-সংবাদী বানান—অন্তত একটি interim ব্যবস্থা হিসাবে, রবীন্দ্রনাথ সংগত বলে মনে করেন। 'কেমাল পাশা' হওয়া তাঁর নিজের পক্ষে সম্ভব নয়, আবার বানান বিষয়ে বর্তমান উচ্ছৃঙ্খলতাও তাঁর পক্ষে অসহনীয়। তাই তিনি জ্ঞাপন করেছেন, "এমন একটা অনুশাসনের দরকার যাতে প্রাকৃত বাংলার লিখনে বানানের সাম্য সর্বত্র রক্ষিত হতে পারে।"[১৯] ফলে বানানের বিধিপালনে আপাতত হয়তো মোটের উপরে আমরা "বাধ্যতামূলক নীতি অনুসরণ করে একান্ত উচ্ছৃঙ্খলতা দমনে যোগ দেব" এই প্রতিশ্রুতি দিয়েও তিনি আশা করেছেন—"কিন্তু এই দ্বিধাগ্রস্ত মধ্যপথে ব্যাপারটা থামবে না। অচিরে এমন সাহসিকের সমাগম হবে যাঁরা নিঃসংকোচে বানানকে দিয়ে সম্পূর্ণভাবেই উচ্চারণের সত্য রক্ষা করবেন।"[২০]

সেই সাহসিক দু একজন হয়তো এসেছেন, কিন্তু কেমাল পাশার ক্ষমতা তাঁদের নেই। আর তাঁদের আকাঙ্ক্ষা সফল হওয়ার পথে কী কী দুস্তর বাধা আছে তা আমরা অন্যত্র আলোচনা করেছি।[২১] বিষয়টি খুব সহজ নয়। তার জন্য সাহস করলেও পুরস্কার জুটবে কি না সন্দেহ। সে সাহস সংগত হবে কি না, সেটাও প্রশ্ন।

পরিশিষ্ট : ২

এক থেকে একশো : একটি প্রস্তাব

১

যেসব বাঙালি শিশু সদ্য এক-দুই গুনতে শিখেছে, তাদের কথা ভেবেই এ প্রবন্ধ। নামে প্রবন্ধ, কিন্তু আসলে একটি প্রস্তাব। প্রস্তাবটি বিশদ করে বলার আগে সবিনয়ে অনুরোধ করি, এর নতুনত্ব দেখেই কেউ এটিকে বাতিল করতে উদ্যোগী না হন। প্রস্তাবটি বেশ খানিকটা ভাবনা-চিন্তার ফলে গড়ে উঠেছে, আশা করি এটাকে এক কথায় উড়িয়ে দেবার আগে পাঠকেরাও খানিকটা ভাবনা-চিন্তা করে নেবেন। তাতেই লেখকের প্রতি সুবিচার করা হবে।

গণিতে সংখ্যা যে অগুনতি সে তো সকলেই জানেন, কিন্তু ওই সব সংখ্যার নাম যে 'শব্দ'গুলি—সেগুলি অনন্ত নয়। 'এক' থেকে 'একশো' তারপর 'হাজার' বা 'সহস্র' তারপর 'লক্ষ' আর 'কোটি'—মোটামুটি একশো তিন-চারটি শব্দ নিয়েই আমরা সংখ্যাবারিধি পার হতে পারি। ধারাপাতের পাতায় অবশ্য আরো কিছু শব্দ আছে—অযুত, নিযুত, অর্বুদ, বৃন্দ ইত্যাদি, কিন্তু আমাদের গণনায় ক্বচিৎ সেগুলির ব্যবহার হয়, অধিকাংশ বাঙালি শিশু এখন সেগুলি হয়তো জানেই না।

এখন, সংখ্যা যতই হোক, দশমিক গণনার মূল ভিত্তি হচ্ছে এক থেকে দশ। দুই হাতের দশটা আঙুল থেকে প্রাচীন ভারতবর্ষের মানুষ গণনার দশমিক পদ্ধতি আবিষ্কার করেছিল বলে শুনেছি। যাই হোক, এক থেকে দশ পর্যন্ত আলাদা আলাদা দশটি সংখ্যার নাম শিশুকে শিখতেই হবে, পৃথিবীর কোনো ভাষাতেই তা থেকে রেহাই নেই।

তা সে সহজেই শেখে। এমনকী কুড়ি পর্যন্ত সংখ্যার আলাদা আলাদা নাম মুখস্থ করতেও হয়তো তার অসুবিধা হয় না। কিন্তু তারপর থেকে? এখানেই বাঙালি শিশু মার খায় ইংরেজি বা রুশীয় বা ফরাসি বা ইরানীয় বা স্প্যানিশভাষী শিশুর কাছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঐসব শিশুরা কুড়ি,

ত্রিশ, চল্লিশ এইসব নামগুলি শিখে নেয়, তারপর এক থেকে দশ পর্যন্ত সংখ্যার নামগুলিকে তার পর পর বসিয়ে গুনে যায়। কখনো হয়তো 'এবং' জাতীয় কিছু যোগ করে দুই শব্দে, কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই পরিষ্কার দ্বন্দ্ব সমাস বানিয়ে ছেড়ে দেয়। ইংরেজিতে যেমন টুয়েণ্টির পর ওয়ান-টু বসিয়ে চলল টুয়েণ্টি নাইন পর্যন্ত। অর্থাৎ শিশুকে দশের গুণিতকগুলির জন্য (দশ, কুড়ি, ত্রিশ, চল্লিশ ইত্যাদি) আলাদা শব্দ লিখতে হচ্ছে, কিন্তু আর কিছু শিখতে হচ্ছে না। যা তাকে করতে হচ্ছে তা সমাস, দুটি শব্দ পাশাপাশি সাজানো। এতে পুরো একটি প্যাটার্ন সে পেয়ে যাচ্ছে। এজন্য বাঙালি শিশুই ইংরেজিতে ওয়ান-টু গুনতে অনেক তাড়াতাড়ি শিখে যায়, বাংলা গণনা শিখতে তার দেরি হয় বেশ একটু। 'কুড়ির' পর 'একুশ' 'বাইশ', 'তেইশ', 'চব্বিশ' ইত্যাদি প্রত্যেকটি সংখ্যার নাম তাকে আলাদা করে শিখতে হয়। এই নামগুলি যে বিশ-এর পরের সংখ্যা বোঝায় তার কোনো স্পষ্ট নিশানা সে এগুলি থেকে পায় না। যদি বলা হয় যে, ঐ 'উশ' (একুশ) 'ইশ' (বাইশ) 'বিশ' (চব্বিশ) আর 'আশ' (সাতাশ)-এর মধ্যে 'বিশ' লুকিয়ে আছে তাহলে বলব, ঐতিহাসিকভাবে কথাটা ঠিক হলেও পণ্ডিত ছাড়া আর কজন জানে সেটা? শিশুকে এতসব জানতেই বা হবে কেন? তাহলে চল্লিশ-এর 'ইশ' আর পঞ্চাশ-এর 'আশ'-এও, কি 'বিশ' লুকিয়ে আছে?

২

বাংলায় এগারো থেকে সংখ্যাগুলির যে নাম, তাতে স্পষ্ট আলাদা করা না গেলেও অন্তত অর্থের দিক থেকে দুটি অংশ আছে। একটি এককের অংশ, আরেকটি দশকের অংশ। এগারোয় 'এগ' কথাটি একের অপভ্রংশ, 'র' বা 'রো' কথাটি 'দশ'-এর। 'চব্বিশ'-এর 'চ'—যেমন চার-এর (চৌ) ভগ্নাবশেষ। এখন এই সংখ্যা শব্দগুলিতে কী একক সংখ্যার নাম, কি দশকবাচক (অর্থাৎ দশের গুণিতক) সংখ্যার নাম, কোনটিতেই কোনো শৃঙ্খলা নেই। 'এক' মোটামুটি অক্ষত থাকে, কিন্তু দুই-এর চেহারা কী দাঁড়ায় দেখুন। কোথাও সে 'বা-' (বা-রো, বা-ইশ, বা-হান্ন, বা-ষট্টি, বা-হাত্তর) কোথাও সে 'ব' (ব-ত্রিশ) কোথাও সে 'বে' বা 'বি' (বে-য়াল্লিশ, বি-রাশি, বি-রানব্বই)। তিন এইভাবে উচ্চারণ হয় 'ত্যা' (তেরো), 'তে' (তেইশ, তেত্রিশ, তেতাল্লিশ, তেপান্ন, তেষট্টি), 'তি' (তিয়াত্তর, তিরাশি তিরানব্বই)। চার হয় 'চৌ', 'চো' (চৌদ্দ, চব্বিশ), 'চু' (চুয়াল্লিশ, চুয়ান্ন, চুয়াত্তর ইত্যাদি) পাঁচ হয় 'পন' (পনেরো) 'পঁচ'- (পঁচিশ), 'পঁয়' (-ত্রিশ), পঞ্চ (পঞ্চান্ন) ইত্যাদি॥

একক সংখ্যাগুলির নামে দেখছি এই এত গণ্ডগোল। সংখ্যা একটা কিন্তু তাঁর নাম দাঁড়াচ্ছে অনেকগুলি। ওদিকে দশ ভিত্তিক সংখ্যাগুলির ঝামেলাই কি কম? 'বিশ' যে 'ইশ' 'উশ' 'আশ' হচ্ছে সে আমরা দেখেছি। 'ত্রিশ' মোটামুটি ভদ্র ব্যবহার করছে, 'চল্লিশ' হচ্ছে '-য়াল্লিশ' '-তাল্লিশ'। 'পঞ্চাশ' খুব বিদঘুটে চেহারা নিচ্ছে, সে হয়ে যাচ্ছে '-আন্ন' আর '-পান্ন'। 'ষাট' হয়ে পড়ছে '-ষট্টি', 'সত্তর' -'আত্তর' বা '-হাত্তর'।

আর 'ঊন' উপসর্গ জুড়ে কেন আমরা বোঝাবো দশক-সূচক শব্দের পরে ৯-এর ঘরের সংখ্যাটিকে? 'ঊনত্রিশ'-কে ইংরেজিতে বলা হচ্ছে কুড়ির পরে আরো নয়, বাংলায় কেন ত্রিশের চেয়ে এক কম বোঝাবে? গুনতে গুনতে সোজা ধাপে ধাপে এগিয়ে যাচ্ছি যেখানে, মাঝে মাঝে উলটে পিছন দিকে লাফ দেব কেন? সংখ্যা যাচ্ছে বেড়ে, সেখানে কমের হিসাব রেখে লাভ কী?

আরো একটা অসংগতি আছে বাংলা সংখ্যার নামে। আমরা লেখার বেলায় দশকের সংখ্যাটিকে লিখছি আগে অর্থাৎ বাঁদিকে আর এককের সংখ্যাটিকে একেবারে শেষে, ডানদিকে। সেটাই নিয়ম। কিন্তু বলার সময় ধরছি এককের সংখ্যাকে আগে, দশকের সংখ্যাটিকে পরে। 'পঁয়ত্রিশ' ত্রিশের পরবর্তী পাঁচ একক, লিখছি ৩৫ যাতে বোঝাচ্ছে তিনটি দশক আর পাঁচটি একক, কিন্তু বলছি পঁয় (-পাঁচ) ত্রিশ, অর্থাৎ একক সংখ্যা আগে, দশকের সংখ্যা পরে। লেখার আর মুখের কথায় মিল থাকছে না।

৩

আমরা জানি এ সবই ঘটেছে বাংলা ভাষার ঐতিহাসিক বিবর্তনের ফলে। কিন্তু শিশুর কী সান্ত্বনা জুটবে সেই জ্ঞান থেকে? সে তো পাচ্ছে না কোনো প্যাটার্ন, তার অসুবিধা তো দূর হচ্ছে না।

আমরা তাই তার হাতে একটা সহজ সূত্র তুলে দিতে চাই। তার জন্য তিন রকম পরিবর্তন আমরা প্রস্তাব করছি। প্রথমত, দশকমূল (২০, ৩০, ৪০, ৫০, ৬০ ইত্যাদি) কিছু সংখ্যার নাম আমরা একটু বদলে দেব। দ্বিতীয়ত, ইংরেজি, ফরাসি, স্প্যানিশ, ফারসি এমনকি জাপানি ইত্যাদি ভাষার কম-বেশি সুনিয়মিত ছক ধরে আমরা গণনার রীতি একটু পালটে নেব, অর্থাৎ লেখাতে যে-ক্রম আছে সেই অনুসারে আমরা নাম সাজাব, প্রথমে দশক সংখ্যাটির নাম আসবে তারপর আসবে একক সংখ্যাটির নাম। তিন নম্বর—নামগুলি হবে দ্বন্দ্ব সমাসে। দশক সংখ্যা এবং একক সংখ্যা পর পর উচ্চারিত হবে ইংরেজির বা ফারসির ধরনে, ফরাসির ধরনে মাঝখানে

'এবং'-বাচক শব্দ বসবে না। ফলে এই নিয়মে একুশ হবে বিশ-এক, তিরাশি আশ-তিন।

প্রথমে দশকমূল সংখ্যাগুলির নাম বদলের ব্যাপারটা ধরি। এখন ত্রিশ, চল্লিশ, পঞ্চাশ ইত্যাদি যে নাম আছে সেগুলি বজায় রাখলে ঐ জোড় শব্দ বলতে অনেক ক্ষেত্রে অসুবিধা হবে, সাতষট্টির ষাট-সাত রূপ কিংবা ৫৫-এর পঞ্চাশ-পাঁচ রূপ উচ্চারণ করা সুসাধ্য হবে না। সেজন্য নতুন নাম প্রস্তাব করছি 'ত্রিশ'-এর জায়গায় 'তিশ', 'চল্লিশ'-এর বদলে 'চিশ' বা 'চশ', 'পঞ্চাশ'-এর জায়গায় 'পঁশ', 'ষাট'-এর জায়গায় 'ষেট', 'সত্তর'-এর স্থলে 'সোত', 'আশি'-র জায়গায় 'আশ' এবং 'নব্বই' পালটে 'নোব'। 'দশ' 'বিশ' ('কুড়ি' এ গণনায় ব্যবহৃত হবে না) যা আছে তাই থাকবে। আমার দেওয়া নামগুলি চূড়ান্ত এমন বলছি না, পাঠকদের মধ্য থেকে এর চেয়ে ভালো নাম এলে নিশ্চয়ই তা সাদরে গ্রহণ করা হবে।

দশ এর পর থেকে নিরানব্বই পর্যন্ত সমস্ত সংখ্যার নাম এই ছক ধরে হবে। এগারো হবে দশ-এক, উনিশ—দশ-নয়। চব্বিশ—বিশ-চার, পঁয়ত্রিশ—তিশ-পাঁচ, ছেচল্লিশ—চিশ-ছয়, ছাপ্পান্ন—পঁশ-ছয়। আটষট্টি—ষেট-আট। নিরেনব্বই—নোব-নয়। পুরো তালিকা শেষে সংযুক্ত হল।

এই নতুন সংখ্যা-শব্দের তালিকাটির সুবিধাগুলি উপরের আলোচনা থেকেই বোধগম্য হবে। এ নামগুলি স্বচ্ছ এবং স্বয়ংবোধক—সংখ্যাগুলিকে সোজাসুজি চিনিয়ে দেয়। তাছাড়া এ নামে দশক-একক লেখার ক্রমটি কথাতেও বজায় থাকে। সবচেয়ে বড় সুবিধা এই—সংখ্যা শেখার ব্যাপারটা শিশুর কাছে অতিশয় সহজ হয়ে যাবে, তাকে একশোটির বদলে শিখতে হবে মাত্র উনিশটি অর্থাৎ (দশ-নয়টি)—এক থেকে দশ তারপর বিশ, তিশ, চিশ, পঁশ, ষেট, সোত, আশ, নোব, শ।

বাঙালি অভিভাবকদের অনুরোধ করব, সম্ভবক্ষেত্রে শিশুকে ছকটা দিয়ে একবার পরীক্ষা করুন, দেখুন সে নিজেই জোড় মিলিয়ে এগিয়ে যেতে পারে কিনা। আমি পরীক্ষা করে দেখেছি, পারে খুব সহজেই।

আপত্তি কী কী উঠতে পারে তাও ভেবে দেখেছি। যুক্তিহীন ঠাট্টা-ইয়ার্কি অবৈজ্ঞানিক চিন্তাকে চালাকির আবরণে লুকিয়ে রাখে, তার সঙ্গে ঝগড়ায় যাব না।

কিন্তু যেসব আপত্তি কমবেশি গ্রহণযোগ্য সেগুলির একটি হল এই যে, নতুন ছকে ঐতিহাসিক ব্যুৎপত্তির সঙ্গে এক্ষেত্রে বাংলাভাষার যোগ ছিন্ন হবে এবং তারই সঙ্গে অন্যান্য নব্য ভারতীয় আর্যভাষার (হিন্দি, গুজরাটি, মারাঠি, পাঞ্জাবি ইত্যাদি) সঙ্গেও বাংলা ভাষার আত্মীয়তা অন্তত এই অংশে ক্ষুণ্ণ হবে। আমার উত্তর : ল্যাংগুয়েজ স্ট্যান্ডারডাইজেশন বা ভাষা

উন্নয়নে ঐতিহ্যের সঙ্গে সম্পর্ক ক্ষেত্রবিশেষে ছিন্ন করতে হয়, নইলে ভাষার সামর্থ্য বাড়ে না।

দ্বিতীয়ত, অনেকে বলবেন এই নামগুলিও কি উচ্চারণে বদলাবে না দুশো বা তিনশো বছর পরে? তখন কি প্যাটার্ন ঠিক থাকবে? আমি বলব, মুখে হয়তো বদলাবে, কিন্তু লেখার শব্দগুলি ঠিক থাকলে নামের অক্ষর অপরিবর্তিত থাকবে। 'ষেট-আট' (৬৮) হয়তো 'ষেড়াট' হবে, মার্কিনদের মুখে 'টুয়েণ্টি' যেমন হয় 'ঠুয়েনি' কিন্তু লেখার মান্য রূপ থেকে মূল আদর্শটি উদ্ধার করা অসম্ভব হবে না।

তৃতীয়, এগারো যদি দশ-এক হয়, বাংলায় 'খানদশেক' বা 'জনাদশেক' বলতে কি এগারো জন বোঝাবে না? আমি বলব, না; কারণ প্রথম কথাটি, 'দশ-অ্যাক' আর দ্বিতীয়টি 'দশ-এক'। আগে 'খান' বা 'জনা' কথার একটি বসে সেই উচ্চারণে তফাতকে শব্দগত দিক থেকেও আরো স্পষ্ট করে দিচ্ছে—ফলে সংশয়ের অবকাশ থাকবে কম।

শিশুবর্ষ চলে গেছে বলেই কি বাঙালি শিশুদের জন্য আমরা কোনো নতুন উপহারের কথা ভাবব না? আমার দৃঢ় বিশ্বাস, পরিবর্তনের যে মূল্য দিতে হবে, তার তুলনায় লাভ পড়বে অনেক বেশি। জীবন্ত, সুপ্রবুদ্ধ তর্ক উঠুক না জিনিসটা নিয়ে!

মনে রাখতে হবে, প্রাচীন বাংলা গণনারীতিও আমাদের এই পদ্ধতিকে সমর্থন করে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের 'দশ-চারি বয়সের আমি যে কুমারী" মনে আছে? আমাদের প্রস্তাব সেই প্রাচীন সরলতাকেই উদ্ধার করার চেষ্টা। নিচে এক থেকে পঞ্চাশ (পঁশ) এবং একান্ন (পঁশ-এক) থেকে একশ পর্যন্ত সংখ্যার নাম পরপর দুটি স্তবকে সাজানো আছে। প্রতি স্তবকে বাঁ দিক থেকে ডাইনে স্তম্ভগুলি পড়বেন, প্রতিটি স্তম্ভ উপর থেকে নিচে। প্রথম স্তবকে পঁশ-এ পৌঁছে তার পর (১৩৭-পৃষ্ঠায়) দ্বিতীয় স্তবকে যাবেন।

এক	দশ-এক	বিশ-এক	তিশ-এক	চিশ-এক
দুই	দশ-দুই	বিশ-দুই	তিশ-দুই	চিশ-দুই
তিন	দশ-তিন	বিশ-তিন	তিশ-তিন	চিশ-তিন
চার	দশ-চার	বিশ-চার	তিশ-চার	চিশ-চার
পাঁচ	দশ-পাঁচ	বিশ-পাঁচ	তিশ-পাঁচ	চিশ-পাঁচ
ছয়	দশ-ছয়	বিশ-ছয়	তিশ-ছয়	চিশ-ছয়
সাত	দশ-সাত	বিশ-সাত	তিশ-সাত	চিশ-সাত
আট	দশ-আট	বিশ-আট	তিশ-আট	চিশ-আট
নয়	দশ-নয়	বিশ-নয়	তিশ-নয়	চিশ-নয়
দশ	বিশ	তিশ	চিশ	পঁশ

পঁশ-এক	ষেট-এক	সোত-এক	আশ-এক	নোব-এক
পঁশ-দুই	ষেট-দুই	সোত-দুই	আশ-দুই	নোব-দুই
পঁশ-তিন	ষেট-তিন	সোত-তিন	আশ-তিন	নোব-তিন
পঁশ-চার	ষেট-চার	সোত-চার	আশ-চার	নোব-চার
পঁশ-পাঁচ	ষেট-পাঁচ	সোত-পাঁচ	আশ-পাঁচ	নোব-পাঁচ
পঁশ-ছয়	ষেট-ছয়	সোত-ছয়	আশ-ছয়	নোব-ছয়
পঁশ-সাত	ষেট-সাত	সোত-সাত	আশ-সাত	নোব-সাত
পঁশ-আট	ষেট-আট	সোত-আট	আশ-আট	নোব-আট
পঁশ-নয়	ষেট-নয়	সোত-নয়	আশ-নয়	নোব-নয়
ষেট	সোত	আশ	নোব	একশ

পরিশিষ্ট : ৩

বাংলা বানানের নিয়ম ৩য় সংস্করণ (১৯৩৭)

(কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত)

সংস্কৃত বা তৎসম শব্দ

১। রেফের পর ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব

রেফের পর ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব হইবে না, যথা—'অর্চনা, মূর্ছা, অর্জুন, কর্তা, কার্তিক, বার্তা, কর্দম, অর্ধ, বার্ধক্য, কর্ম, কার্য, সর্ব'।

সংস্কৃত ব্যাকরণ-অনুসারে রেফের পর দ্বিত্ব বিকল্পে সিদ্ধ ; না করিলে দোষ হয় না, বরং লেখা ও ছাপা সহজ হয়।

২। সন্ধিতে ঙ্ স্থানে অনুস্বার

যদি ক খ গ ঘ পরে থাকে তবে পদের অন্তস্থিত ম্ স্থানে অনুস্বার অথবা বিকল্পে ঙ্ বিধেয়, যথা—'অহংকার, ভয়ংকর, শুভংকর, সংখ্যা, সংগম, হৃদয়ংগম, সংঘটন' অথবা 'অহঙ্কার, ভয়ঙ্কর' ইত্যাদি।

সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম অনুসারে বর্গীয় বর্ণ পরে থাকিলে পদের অন্তস্থিত ম্ স্থানে অনুস্বার বা পরবর্তী বর্গের পঞ্চম বর্ণ হয়, যথা—'সংজাত, স্বয়ংভূ', অথবা 'সঞ্জাত, স্বয়ম্ভূ'। বাংলায় সর্বত্র এই নিয়ম অনুসারে ং দিলে উচ্চারণে বাধিতে পারে, কিন্তু ক-বর্গের পূর্বে অনুস্বার ব্যবহার করিলে বাধিবে না, বরং বানান সহজ হইবে।

অ-সংস্কৃত অর্থাৎ তদ্ভব দেশজ ও বিদেশী শব্দ

৩। রেফের পর ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব

রেফের পর ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব হইবে না, যথা—'কর্জ, শর্ত, পর্দা, সর্দার চর্বি, ফর্মা, জার্মানি'।

৪। হস্-চিহ্ন

শব্দের শেষে সাধারণতঃ হস্-চিহ্ন দেওয়া হইবে না, যথা—'ওস্তাদ, কংগ্রেস, চেক, জজ, টন, টি-পট, ট্রাম, ডিশ, তছনছ, পকেট, মক্তব, হুক, করিলেন, করিস'। কিন্তু যদি ভুল উচ্চারণের সম্ভাবনা থাকে তবে হস্-চিহ্ন বিধেয়। হ ও যুক্তব্যঞ্জনের উচ্চারণ সাধারণতঃ স্বরান্ত, যথা—'দহ, অহরহ, কাণ্ড, গঞ্জ'। যদি হসন্ত উচ্চারণ অভীষ্ট হয় তবে হ ও যুক্তব্যঞ্জনের পর হস্-চিহ্ন আবশ্যক, যথা—'শাহ্, তখ্ত, জেম্স্ বণ্ড্'। কিন্তু সুপ্রচলিত শব্দে না দিলে চলিবে, যথা—'আর্ট, কর্ক, গভর্নমেণ্ট, স্পঞ্জ'। মধ্যবর্ণে প্রয়োজন হইলে হস্-চিহ্ন বিধেয়, যথা—'উল্‌কি, সট্‌কা'। যদি উপান্ত্য স্বর অত্যন্ত হ্রস্ব হয় তবে শেষে হস্-চিহ্ন বিধেয়, যথা—'কট্‌কট্, খপ্, সার্'।

বাংলার কতকগুলি শব্দের শেষে অ-কার উচ্চারিত হয়, যথা—'গলিত, ঘন, দৃঢ়, প্রিয়, করিয়াছ, করিত, ছিল, এস'। কিন্তু অধিকাংশ শব্দের শেষের অ-কার গ্রস্ত অর্থাৎ শেষ অক্ষর হসন্তবৎ, যথা—'অচল, গভীর, পাঠ, করুক, করিস, করিলেন'। এই প্রকার সুপরিচিত শব্দের শেষে অ-ধ্বনি হইবে কি হইবে না তাহা বুঝাইবার জন্য কেহই চিহ্ন প্রয়োগ করেন না। অধিকাংশ স্থলে অ-সংস্কৃত শব্দে অন্ত্য হস্-চিহ্ন অনাবশ্যক, বাংলা ভাষার প্রকৃতি অনুসারেই হসন্ত উচ্চারণ হইবে। অল্প কয়েকটি বিদেশী শব্দের শেষে অ উচ্চারণ হয়, যথা—'বাই-ল'। কিন্তু প্রভেদ রক্ষার জন্য অপর বহু শব্দে হস্-চিহ্নের ভার চাপান অনাবশ্যক। কেবল ভুল উচ্চারণের সম্ভাবনা থাকিলে হস্-চিহ্ন বিধেয়।

৫। ই ঈ উ ঊ

যদি মূল সংস্কৃত শব্দে ঈ বা ঊ থাকে তবে তদ্ভব বা তৎসদৃশ শব্দে ঈ

বা ঊ অথবা বিকল্পে ই বা উ হইবে, যথা—'কুমীর, পাখী, বাড়ী, শীষ, ঊনিশ, চূন, পূব' অথবা 'কুমির, পাখি, বাড়ি, শিষ, উনিশ, চুন, পুব'। কিন্তু কতকগুলি শব্দে কেবল ঈ, কেবল ই অথবা কেবল উ হইবে, যথা—'নীলা (নীলক), হীরা (হীরক), দিয়াশলাই (দীপশলাকা), খিল (কীল), পানি (পানীয়), চুল (চূল), তাড়ু (তর্দূ), জুয়া (দ্যূত)'।

স্ত্রীলিঙ্গ এবং জাতি, ব্যক্তি, ভাষা ও বিশেষণ বাচক শব্দের অন্তে ঈ হইবে, যথা—'কলুনী, বাঘিনী, কাবুলী, কেরানী, ঢাকী, ফরিয়াদী, ইংরেজী, বিলাতী, দাগী, রেশমী'। কিন্তু কতকগুলি শব্দে ই হইবে, যথা—'ঝি, দিদি, বিবি, কচি, মিহি, মাঝারি, চলতি'। 'পিসী, মাসী' স্থানে বিকল্পে 'পিসি, মাসি', লেখা চলিবে।

অন্যত্র মনুষ্যেতর জীব, বস্তু, গুণ, ভাব ও কর্ম বাচক শব্দের এবং দ্বিরাবৃত্ত শব্দের অন্তে কেবল ই হইবে, যথা—'বেঙাচি, বেজি, কাঠি, সুজি, কেরামতি, চুরি, পাগলামি, বাবুগিরি, তাড়াতাড়ি, সরাসরি, সোজাসুজি'।

নবাগত বিদেশী শব্দে ঈ ঊ প্রয়োগ সম্বন্ধে পরে দ্রষ্টব্য।

৬। জ য

এই সকল শব্দে য না লিখিয়া জ লেখা বিধেয়, যথা—'কাজ, জাউ, জাঁতা, জাঁতি, জুঁই, জুত, জো, জোড়, জোড়া, জোত, জোয়াল'।

৭। ণ ন

অ-সংস্কৃত শব্দে কেবল ন হইবে, যথা—'কান, সোনা, বামুন, কোরান, করোনার'। কিন্তু যুক্তাক্ষর ণ্ট, ণ্ঠ, ণ্ড, ণ্ঢ চলিবে, যথা—'ঘুণ্টি, লণ্ঠন, ঠাণ্ডা'।

'রানী' স্থানে বিকল্পে 'রাণী' চলিতে পারিবে।

৮। ও-কার ও ঊর্ধ্ব-কমা প্রভৃতি

সুপ্রচলিত শব্দের উচ্চারণ, উৎপত্তি বা অর্থের ভেদ বুঝাইবার জন্য অতিরিক্ত ও-কার ঊর্ধ্ব-কমা বা অন্য চিহ্ন যোগ যথাসম্ভব বর্জনীয়। যদি অর্থগ্রহণে বাধা হয় তবে কয়েকটি শব্দে অন্ত্য অক্ষরে ও-কার এবং আদ্য বা মধ্য অক্ষরে ঊর্ধ্ব-কমা বিকল্পে দেওয়া যাইতে পারে, যথা—

'কাল, কালো ; ভাল, ভালো ; মত, মতো ; পড়ো, প'ড়ো (পড়ুয়া বা পতিত)'।

এই সকল বানান বিধেয়, যথা—'এত, কত, যত, তত, তো, হয়তো, কাল (সময়, কল্য), চাল (চাউল, ছাত, গতি), ডাল (দাইল, শাখা)'।

৯। ং ঙ

'বাঙ্গলা, বাঙ্গালা, বাঙ্গালী, ভাঙ্গন' প্রভৃতি এবং 'বাংলা, বাঙলা, বাঙালী, ভাঙন' প্রভৃতি উভয়প্রকার বানানই চলিবে। হসন্ত ধ্বনি হইলে বিকল্পে ং বা ঙ বিধেয়, যথা—'রং, রঙ ; সং, সঙ ; বাংলা, বাঙলা'। স্বরাশ্রিত হইলে ঙ বিধেয়, যথা—'রঙের, বাঙালী, ভাঙন'।

ং ও ঙ-র প্রাচীন উচ্চারণ যাহাই হউক, আধুনিক বাংলা উচ্চারণ সমান, সেজন্য অনুস্বার স্থানে বিকল্পে ঙ লিখিলে আপত্তির কারণ নাই। 'রংএর' অপেক্ষা 'রঙের' লেখা সহজ। 'রংগের' লিখিলে অভীষ্ট উচ্চারণ আসিবে না, কারণ 'রংগ' ও 'রং'-এর উচ্চারণ সমান নয়, কিন্তু 'রং' ও 'রঙ' সমান।

১০। শ ষ স

মূল সংস্কৃত শব্দ-অনুসারে তদ্ভব শব্দে **শ**, ষ বা স হইবে, যথা—'আঁশ (অংশ), আঁষ (আমিষ), শাঁস (শস্য), মশা (মশক), পিসী (পিতৃঃষ্বসা)'। কিন্তু কতকগুলি শব্দে ব্যতিক্রম হইবে, যথা—'মিনসে' (মনুষ্য), 'সাধ' (শ্রদ্ধা)।

বিদেশী শব্দে মূল উচ্চারণ অনুসারে s স্থানে স sh স্থানে শ হইবে, যথা—'আসল, ক্লাস, খাস, জিনিস, পুলিস, পেনসিল, মসলা, মাসুল, সবুজ, সাদা, সিমেণ্ট, খুশি, চশমা, তক্তাপোশ, পশম, পোশাক, পালিশ, পেনশন, শখ, শৌখিন, শয়তান, শরবৎ, শরম, শহর, শার্ট, শেক্স্পিয়র'। কিন্তু কতকগুলি শব্দে ব্যতিক্রম হইবে, যথা—'ইস্তাহার (ইশ্তিহার), গোমস্তা (গুমাশ্তাহ্), ভিস্তি (বিহিশ্তী) খ্রীষ্ট (Christ)'।

শ ষ স এই তিন বর্ণের একটি বা দুইটি বর্জন করিলে বাংলা উচ্চারণে বাধা হয় না, বরং বানান সরল হয়। কিন্তু অধিকাংশ তদ্ভব শব্দে মূল-অনুসারে শ ষ স প্রয়োগ বহুপ্রচলিত, এবং একই শব্দের বিভিন্ন বানান প্রায় দেখা যায় না। এই রীতির সহসা পরিবর্তন বাঞ্ছনীয় নয়। বহু বিদেশী শব্দের প্রচলিত বাংলা বানানে মূল অনুসারে শ বা স লেখা হয়, কিন্তু কতকগুলি শব্দে ব্যতিক্রম বা বিভিন্ন বানান দেখা যায়, যথা—'সরবৎ, শরবৎ ;

সরম, শরম ; শহর, সহর ; শয়তান, সয়তান ; পুলিস, পুলিশ'। সামঞ্জস্যের জন্য যথাসম্ভব একই নিয়ম গ্রহণীয়।

বিদেশী শব্দের s- ধ্বনির জন্য বাংলায় ছ অক্ষর বর্জনীয়। কিন্তু যেখানে প্রচলিত বাংলা বানানে ছ আছে এবং উচ্চারণেও ছ হয়, সেখানে প্রচলিত বানানই বজায় থাকিবে, যথা—'কেচ্ছা, ছয়লাপ, তছনছ, পছন্দ'।

দেশজ বা অজ্ঞাতমূল শব্দের প্রচলিত বানান হইবে, যথা—'করিস, ফরসা (ফরশা), সরেস (সরেশ), উসখুস (উশখুশ)'।

১১। ক্রিয়াপদ

সাধু ও চলিত প্রয়োগে কৃদন্ত রূপে 'করান, পাঠান', প্রভৃতি অথবা বিকল্পে 'করানো, পাঠানো' প্রভৃতি বিধেয়।

চলিত ভাষার ক্রিয়াপদের বিহিত বানানের কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হইল। বিকল্পে ঊর্ধ্বকমা বর্জন করা যাইতে পারে, এবং লাম বিভক্তি স্থানে -লুম বা -লেম লেখা যাইতে পারে।

হ-ধাতু

হয়, হন, হও, হ'স, হই। হচ্ছে। হয়েছে। হ'ক, হ'ন, হও, হ। হ'ল হ'লাম। হ'ত। হচ্ছিল। হয়েছিল। হব (হবো), হবে। হ'য়ো, হ'স। হ'তে হ'য়ে, হ'লে, হবার, হওয়া।

খা-ধাতু

খায়, খান, খাও, খাস, খাই। খাচ্ছে। খেয়েছে। খাক, খান, খাও, খা। খেলে, খেলাম। খেত। খাচ্ছিল। খেয়েছিল। খাব (খাবো), খাবে। খেয়ো, খাস। খেতে, খেয়ে, খেলে, খাবার, খাওয়া।

দি-ধাতু

দেয়, দেন, দাও, দিস, দিই। দিচ্ছে। দিয়েছে। দিক, দিন, দাও, দে। দিলে, দিলাম। দিত। দিচ্ছিল। দিয়েছিল। দেব (দেবো), দেবে। দিও, দিস। দিতে, দিয়ে, দিলে, দেবার, দেওয়া।

শু-ধাতু

শোয়, শোন, শোও, শুস, শুই। শুচ্ছে। শুয়েছে। শুক, শুন, শোও, শো। শুল, শুলাম,। শুত। শুচ্ছিল। শুয়েছিল। শোব (শোবো), শোবে। শুয়ো, শুস। শুতে, শুয়ে, শুলে, শোবার, শোয়া।

কর-ধাতু

করে, করেন, কর, করিস, করি। করছে। করেছে। করুক, করুন, কর, করু। ক'রলে, ক'রলাম। ক'রত। করছিল। করেছিল। ক'রব (ক'রবো), ক'রবে। ক'রো, করিস। ক'রতে, ক'রে, ক'রলে, করবার, করা।

কাট্-ধাতু

কাটে, কাটেন, কাট, কাটিস, কাটি। কাটছে। কেটেছে। কাটুক, কাটুন, কাট, কাটু। কাটলে, কাটলাম। কাটত। কাটছিল। কেটেছিল। কাটব (কাটবো), কাটবে। কেটো, কাটিস। কাটতে, কেটে, কাটলে, কাটবার, কাটা।

লিখ্-ধাতু

লেখে, লেখেন, লেখ, লিখিস, লিখি। লিখছে। লিখেছে। লিখুক, লিখুন, লেখ, লেখু। লিখলে, লিখলাম। লিখত। লিখছিল। লিখেছিল। লিখব (লিখবো), লিখবে। লিখো, লিখিস। লিখতে, লিখে, লিখলে, লেখবার, লেখা।

উঠ্-ধাতু

ওঠে, ওঠেন, ওঠ, উঠিস, উঠি। উঠছে। উঠেছে। উঠুক, উঠুন, ওঠ, ওঠ্। উঠল, উঠলাম। উঠত। উঠছিল। উঠেছিল। উঠব (উঠবো), উঠবে। উঠো, উঠিস। উঠতে। উঠে, উঠলে, ওঠবার, ওঠা।

করা-ধাতু

করায়, করান, করাও, করাস, করাই। করাচ্ছে। করিয়েছে। করাক, করান,

করাও, করা। করালে, করালাম। করাত। করাচ্ছিল। করিয়েছিল। করাব (করাবো), করাবে। করিও, করাস। করাতে, করিয়ে, করালে, করাবার, করান (করানো)।

১২। কতকগুলি সাধু শব্দের চলিত রূপ

'কুয়া, সুতা, মিছা, উঠান, উনান, পুরান, পিছন, পিতল, ভিতর, উপর' প্রভৃতি কতকগুলি সাধু শব্দের মৌখিক রূপ কলিকাতা অঞ্চলে অন্যপ্রকার। যে শব্দের মৌখিক বিকৃতি আদ্য অক্ষরে তাহার সাধুরূপই চলিত ভাষায় গ্রহণীয়, যথা—'পিছন, 'পিতল, ভিতর, উপর'। যাহার বিকৃতি মধ্য বা শেষ অক্ষরে তাহার চলিত রূপ মৌখিক রূপের অনুযায়ী করা বিধেয়, যথা— 'কুয়ো, সুতো, মিছে, উঠন, উনন, পুরনো'।

নবাগত ইংরেজী ও অন্যান্য বিদেশী শব্দ

Cut-এর u, cat-এর a, f, v, w, z প্রভৃতির প্রতিবর্ণ বাংলায় নাই। অল্প কয়েকটি নূতন অক্ষর বা চিহ্ন বাংলা লিপিতে প্রবর্তিত করিলে মোটামুটি কাজ চলিতে পারে। বিদেশী শব্দের বাংলা বানান যথাসম্ভব উচ্চারণসূচক হওয়া উচিত, কিন্তু নূতন অক্ষর বা চিহ্নের বাহুল্য বর্জনীয়। এক ভাষার উচ্চারণ অন্য ভাষার লিপিতে যথাযথ প্রকাশ করা অসম্ভব। নবাগত বিদেশী শব্দের শুদ্ধি-রক্ষার জন্য অধিক আয়াসের প্রয়োজন নাই, কাছাকাছি বাংলা রূপ হইলেই লেখার কাজ চলিবে। যে সকল বিদেশী শব্দের বিকৃত উচ্চারণ ও তদনুযায়ী বানান বাংলায় চলিয়া গিয়াছে সে সকল শব্দের প্রচলিত বানানই বজায় থাকিবে, যথা—'কলেজ, টেবিল, বাইসিকেল, সেকেণ্ড'।

১৩। বিবৃত অ (cut-এর u)

মূল শব্দে যদি বিবৃত অ থাকে তবে বাংলা বানানে আদ্য অক্ষরে আ-কার এবং মধ্য অক্ষরে অ-কার বিধেয়, যথা—'ক্লাব (club), বাস্ (bus), বাল্‌ব্ (bulb), সার্ (sir), থার্ড (third), বাজেট (budget), জার্মান (German), কাটলেট (cutlet), সার্কাস (circus), ফোকাস (focus), রেডিয়ম (radium), ফস্‌ফরস (phosphorus), হিরোডোটস (Herodotus)'।

১৪। বক্র আ (বা বিকৃত এ। cat-এর a)

মূল শব্দে বক্র আ থাকিলে বাংলায় আদিতে 'অ্যা' এবং মধ্যে '্যা' বিধেয়, যথা—'অ্যাসিড (acid), হ্যাট (hat)'।

এইরূপ বানানে '্যা'-কে য-ফলা + আ-কার মনে না করিয়া একটি বিশেষ স্বরবর্ণের চিহ্ন জ্ঞান করা যাইতে পারে, যেমন হিন্দীতে এই উদ্দেশ্যে ঐ-কার চলিতেছে (hat=हैट) নাগরী লিপিতে যেমন অ-অক্ষরে ও-কার যোগ করিয়া ও (ऒ) হয়, সেইরূপ বাংলায় অ্যা হইতে পারে।

১৫। ঈ ঊ

মূল শব্দের উচ্চারণে যদি ঈ ঊ থাকে তবে বাংলা বানানে ঈ ঊ বিধেয়, যথা—'সীল (seal), ঈস্ট (east), ঊস্টার (Worcester), স্পূল (spool)'।

১৬। f v

f ও v স্থানে যথাক্রমে ফ ভ বিধেয়, যথা—'ফুট (foot), ভোট (vote)'। যদি মূল শব্দে v-এর উচ্চারণ f তুল্য হয়, তবে বাংলা বানানে ফ হইবে, যথা—'ফন (von)'।

১৭। w

w স্থানে প্রচলিত রীতি অনুসারে উ বা ও বিধেয়, যথা—'উইলসন (Wilson), উড (wood), ওয়ে (way)'।

১৮। য়

নবাগত বিদেশী শব্দে অনর্থক য় প্রয়োগ বর্জনীয়। 'মেয়র, চেয়ার, রেডিয়ম, সোয়েটর' প্রভৃতি বানান চলিতে পারে, কারণ য় লিখিলেও উচ্চারণ বিকৃত হয় না। কিন্তু উ-কার বা ও-কারের পর অকারণে য়, য়া, য়ো লেখা অনুচিত। 'এডোয়ার্ড', ওয়ার-বণ্ড' না লিখিয়া 'এড্ওআর্ড', ওঅর-বণ্ড' লেখা উচিত। 'হার্ডওয়ার' (hardware)' বানানে দোষ নাই।

১৯। s, sh

১০ সংখ্যক নিয়ম দ্রষ্টব্য।

২০। st

নবাগত বিদেশী শব্দে st স্থানে নূতন সংযুক্ত বর্ণ স্ট বিধেয়, যথা—'স্টোভ (stove)'।

২১। z

z স্থানে জ বা জ় বিধেয়।

২২। হস্-চিহ্ন

৪ সংখ্যক নিয়ম দ্রষ্টব্য।

★

তথ্যনির্দেশ ও টীকা

১

১. দ্র. এই লেখকের "বাংলা লিপি বিষয়ে", 'যুগান্তর', শারদীয় ১৩৮৬, পৃ. ২৫২-৫৭।
২. নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী সম্পাদিত 'আনন্দমেলায়' ১৯৮১-র এপ্রিল থেকে ১৯৮৩ পর্যন্ত প্রকাশিত মৎপ্রণীত (বাচস্পতি ছদ্মনামে) "বাংলা বলো" নামক ধারাবাহিক রচনায় আমরা এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।
৩. ১৯৮৪-র ২৩-২৪ ফেব্রুয়ারি শান্তিনিকেতনের বিনয় ভবনে বাংলা বানান বিষয়ক সেমিনারে বর্তমান লেখক একটি পরিত্যক্ত বর্ণ ব্যবহার এবং একটি নতুন চিহ্ন উদ্ভাবন করে 'অ্যা' ধ্বনিটির নিজস্ব রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেছিল, সে দুটি যথাক্রমে হল : পূর্ণ স্বর [ঌ], এবং স্বরচিহ্ন বা কার [ϵ]।
৪. বাংলা দ্বিস্বর সম্বন্ধে সাম্প্রতিক আলোচনার জন্য বর্তমান লেখকের "বাংলা দ্বিস্বরধ্বনি" নিবন্ধটি দ্রষ্টব্য। মৃণাল নাথ (সম্পা.) 'ভাষা', চতুর্থ-পঞ্চম বর্ষ, ১০-২২ পৃষ্ঠা।
৫. স্বরসংগতি বা স্বরের উচ্চতাসাম্য (Vowel Height Assimilation)-জনিত ও সর্বাংশে ও-র মতো নয় উচ্চারণে। কিন্তু বাংলা ধ্বনিতত্ত্বে (এখানে ধ্বনিবিজ্ঞান থেকে ধ্বনিতত্ত্বকে তফাত করতে হবে) এই পার্থক্য গণনীয় নয়।
৬. এ অধ্যায়ের একটি অংশ "বানানভুল, ভুল বানান" নামে সুনীলকুমার নন্দী সম্পাদিত 'অনুক্ত', দ্বাদশ বর্ষ, বৈশাখ-আশ্বিন ১৩৮৫-এর ১-২ সংখ্যায় (পৃ. ১০৮-১৪) মুদ্রিত হয়েছিল। একটু পরিবর্তিত আকারে সেটি আবার রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা গবেষণা সংসদের কাজী আবদুল মান্নান সম্পাদিত 'কৌশিক' পত্রের প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যায় (পৃ. ১৪-২৩) ছাপা হয়। এর পরে আরো কয়েকবার মুদ্রিত হয়েছে।

২

১. দ্র. এই লেখকের "লিনিয়ারিটি ও বাংলা লিপির চরিত্র", আনন্দ-বাজার পত্রিকা (রবিবাসরীয়), ২১ নভেম্বর, ১৯৮২। বইয়ের ভিতরে পাদটীকার চিহ্নটি বাদ পড়ে গেছে। এটি হবে ২৫ পৃষ্ঠায় তলার দিক থেকে পঞ্চম লাইনে, "লিনিয়ার" কথাটিতে।

২. জগন্নাথ চক্রবর্তীর বাংলা বানান সংস্কারের অভিনব প্রস্তাব, অর্থাৎ উচ্চারণ-অনুগ বানান লেখার অনুরোধ প্রথম প্রকাশিত হয় 'দেশ', ১১ মার্চ, ১৯৭৮ সংখ্যায়। পরে 'সাংস্কৃতিক খবর', 'গঙ্গোত্রী' ইত্যাদি নানা পত্রিকায় তিনি এর অল্পবিস্তর পুনরাবৃত্তি করেন। বহু আগেই এ ধরনের প্রস্তাব করেন যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি (দ্র. 'কি লিখি', ওরিয়েণ্ট বুক কম্পানি, ১৩৬৩)। পূর্ব-পাকিস্তানের ভাষা কমিটির পক্ষে মুহম্মদ শহীদুল্লাহও এ ধরনের প্রস্তাব এনেছিলেন (১৯৪৯)। তাঁর এবং মোফাজ্জেল হায়দার চৌধুরী, ফেরদাউস খান, মুহম্মদ আবদুল হাই প্রভৃতির এতৎসংক্রান্ত প্রস্তাবের জন্য দ্র. মুনীর চৌধুরী, ১৯৭০, 'বাংলা গদ্যরীতি', বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ. ১১৫-২১৯।

৩. দ্র. পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি প্রকাশিত 'প্রসঙ্গ : বাংলা ভাষা' (১৯৮৬) গ্রন্থে জগন্নাথ চক্রবর্তীর প্রবন্ধ "বাংলা লিপিসংস্কার" ১৮-২২ পৃ.।

৪. দ্র. লেখকের 'ভাষা দেশ কাল' (১৯৮৪, কলকাতা, জি. এ. ই. পাবলিশার্স) গ্রন্থের অন্তর্গত "রোমক লিপিতে ভারতীয় ভাষা।"

৫. "স্বচ্ছ" (transparent), "অনচ্ছ", "অর্ধ-স্বচ্ছ"—যুক্তব্যঞ্জন বিষয়ে ইত্যাদি ধারণার জন্য এ লেখকের "বাংলা লিপি বিষয়ে" (শারদীয় যুগান্তর, ১৩৮৬, পৃ. ২৫২-৫৭) নিবন্ধ দ্রষ্টব্য।

৬. যদি আমরা অঙ্ক-কে অ°ক, পুঞ্জ-কে পু°জ, ঘণ্টা-কে ঘ°টা, শান্ত-কে শা°ত এবং সম্বোধন-কে স°বোধন লিখতে রাজি হই, তাহলে যে সব যুক্তব্যঞ্জনকে আমাদের হাত-কম্পোজের ছাপাখানা থেকে উৎখাত করা যাবে সেগুলি হল ঙ্ক, ঙ্খ, ঙ্গ, ঙ্ঘ, ঞ্চ, ঞ্ছ, ঞ্জ, ঞ্ঝ, ণ্ট, ণ্ঠ, ণ্ড, ণ্ঢ, ন্ত, ন্থ, ন্দ, ন্ধ, ম্প, ম্ফ, ম্ব, ম্ভ, ম্ম—মোট একুশটি। তা যদি হয়, সংবাদ আর সম্বাদের উচ্চারণগত

তফাত এই ভাবে দেখানো যাবে—সঙ্‌বাদ, সংবাদ। আমরা বাংলা বর্ণমালা থেকে অনুস্বারও বর্জনের পক্ষপাতী।

৭. দ্র. পরিশিষ্ট-১-এর নিবন্ধ "বাংলা বানান ও রবীন্দ্রনাথ"।

৮. গ্রন্থের শেষ অধ্যায় (৮) "শুদ্ধ বানান প্রচলন ; কয়েকটি বাধা" দ্রষ্টব্য।

৯. একাধিক জায়গায় এ ধরনের আলোচনা করা হয়েছে।

১০. এ দৃষ্টান্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের "Bengali Phonetics", ১৯২১ (*Bulletin of the School of Oriental Studies*, Vol. II, Part I, pp. 1-25) থেকে নেওয়া।

১১. আন্তর্জাতিক ধ্বনিবিজ্ঞান সমিতির (International Phonetic Association)-এর প্রকাশিত ধ্বনিবিজ্ঞান বর্ণমালার *Reader* বইটিতে (১৯৪৮) বাংলা ভাষার প্রতিবর্ণীকরণে এই দৃষ্টান্ত আছে।

১২. এ গ্রন্থের ৫ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

১৩. 'প্রসঙ্গ : বাংলা ভাষা'-তে ক্ষেত্র গুপ্তর "বাংলা বানান : গণতান্ত্রিক দৃষ্টিকোণ" প্রবন্ধ (পৃ. ৯৬-১০০) এই বিভ্রান্তির নিরসনে বিশেষ সাহায্য করে না।

১৪. এ গ্রন্থের পরিশিষ্ট-নিবন্ধ ১ দ্র.

১৫. মণীন্দ্রকুমার ঘোষ তাঁর 'বাংলা বানান' গ্রন্থে (৩য় সংস্করণ ১৯৮৬, ১০-১২ পৃ.) দেখিয়েছেন যে, রেফের নিচের যুক্তব্যঞ্জনের দ্বিত্ব বিসর্জন দিয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানান-সংস্কার সমিতি তৎসম শব্দের গায়েও হাত দিয়েছেন। কিন্তু অন্তত এই ক্ষেত্রে বানান সংস্কার সমিতি অভিনব কিছু করেননি। রেফের নিচে ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব বাংলা ভাষাতেও সর্বজনীনরূপে গৃহীত হয়নি, সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের হাতেও হয়নি। নাগরী-নির্ভর অন্যান্য উত্তর ভারতীয় লিপি পদ্ধতিতেও দ্বিত্বের ব্যবহার অনিবার্য ছিল না।

৩

১. তৃতীয় বন্ধনী বা Square bracket-এর মধ্যে শব্দের উচ্চারিত রূপ দেওয়া হচ্ছে।

২. দ্র. Staal J. F., 1972, *A Reader on the Sanskrit Grammarians*, Cambridge (Mass), The M. I. T. Press। শ্লেগেল তাঁর 'ভারতবর্ষের ভাষা ও জ্ঞানগরিমা বিষয়ক' (১৮০৮) গ্রন্থটির ভূমিকায় জানিয়েছেন যে, ভারতীয় ভাষার বা সংস্কৃতের

আলোচনায় তিনি কলকাতা থেকে নেওয়া বঙ্গাক্ষরের পুথিই ব্যবহার করেছিলেন।

৩. য অর্থাৎ মূল ইয় ধ্বনি, ব অর্থাৎ উয় জাতীয় অর্ধস্বর। এদের উচ্চারণ লুপ্ত হয়েছে, কিন্তু সংলগ্ন ব্যঞ্জনের দ্বিত্বে এদের প্রতিক্রিয়া থেকে যাচ্ছে। য-ফলার অবশ্য দ্বিতীয় আর-একটি ভূমিকাও থাকছে। আগের সিলেবলে অ থাকলে এবং সেই অ শব্দের আদি সিলেবলের হলে পরের সিলেবলের য-ফলা তাকে 'ও' করে দিচ্ছে। যেমন গদ্য→গোদ্দো, সভ্য→শোব্ভো, জন্য→জোন্নো ইত্যাদি।

৪. ম-ফলা লগ্ন ব্যঞ্জনটিকে দ্বিগুণ করছে, সেই সঙ্গে পরের স্বরধ্বনিকেও আনুনাসিকত্ব দিচ্ছে। যেমন আত্মা→আত্তাঁ ; কিন্তু বাংলায় আনুনাসিক স্বরের আনুনাসিকত্ব প্রায়ই শব্দের প্রথম সিলেবলের স্বরটির উপর এসে ভর করতে চায়, ফলে আত্মা আত্তাঁ হয়ে শেষ পর্যন্ত আঁত্তা হয়ে দাঁড়ায়। এর মূলে নিশ্চয়ই আছে সাদৃশ্যের চাপ—অধিকাংশ বাংলা আনুনাসিক স্বর initial বা শব্দাদিস্থিত।

৫. রবীন্দ্রনাথও 'বাংলা শব্দতত্ত্ব'-এর নানা প্রবন্ধে এ শব্দগুলি সম্বন্ধে কটাক্ষ করেছেন। যেমন, "আমরা বাংলা ভাষায় তৎসম শব্দের দাবি করি কৃত্রিম দলিলের জোরে।" 'বাংলা শব্দতত্ত্ব', ১৩৯১ সং, বিশ্বভারতী, ২৬৫ পৃ.

৬. এ গ্রন্থের ৮ অধ্যায় দ্র.।

৭. দ্র. দেবপ্রসাদ ঘোষ রচিত 'বাঙ্গালা ভাষা ও বাণান', ১৩৪৬, মডার্ন বুক এজেন্সি, ৪৮-৪৯ পৃ. ; মণীন্দ্রকুমার ঘোষ রচিত 'বাংলা বানান' (৩য় সং, ১০-১২ পৃ.)। অনেকের ধারণা রেফের পর ব্যঞ্জনের দ্বিত্বযুক্ত উচ্চারণ হয়। এ ধারণা অযথার্থ। যদি কখনও হয়ও, সে উচ্চারণ free variation, অসচেতন উচ্চারণ, ভাষার মৌলিক সংগঠনে তার কোনো গুরুত্ব নেই।

৮. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের 'সাংস্কৃতিকী' ১ম (আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৮২), 'পথ-চলতি', (দ্বিতীয় খণ্ড, বাক্ সাহিত্য, ১৯৮৩) ইত্যাদি বইয়ে এ বানান স্বীকার করা হয়েছে।

৪

১. দেবপ্রসাদ ঘোষের পূর্বোল্লেখিত গ্রন্থ, ১৭-১৮ পৃ.

২. 'হীরক' শব্দ থেকে জাত বলে 'হীরা' শব্দে দীর্ঘ-ঈকার

রাখার পক্ষে যুক্তি আছে। তা অর্থ ও রূপ—দুদিক থেকেই নিকটবর্তী।

৩. সাহিত্য সংসদ প্রকাশিত 'সংসদ বাঙ্গালা অভিধান' (৩য় সংস্করণ, ১৯৮৪)-এর শেষে মুদ্রিত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বানানের নিয়মের ৫ সংখ্যক নিয়ম।

৪. বুদ্ধদেব বসু ও সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ক্রিয়াপদে ঊর্ধ্ব-কমা ও ও-কার যে-পরিমাণে ব্যবহার করেছেন সে-পরিমাণে তার প্রয়োজন নেই বলেই আমাদের ধারণা।

৫. 'সংসদ বাঙ্গালা অভিধান', (১৯৮৪), ৭২৭-২৮ পৃ.

৬. বাংলা উচ্চারণে ই ও ঈ-র মধ্যে কোনো তফাত নেই। তবু 'কী' 'কি' দুভাবে লেখার জন্য রবীন্দ্রনাথ যে যুক্তি দিয়েছিলেন (দ্র. 'বাংলা শব্দতত্ত্ব', ১৩৯১ সং,) তা আমরা সমর্থন করি। 'কী' কর্মপদের স্থান নেয়, কিংবা বিশেষণের বিশেষণ (intensifier) হিসাবে কাজ করে। 'কি' হ্যাঁ-না প্রশ্নের সূচক। দুটির ভূমিকা ও তাৎপর্য আলাদা, ধ্বনিগত চরিত্রও আলাদা।

৭. 'বাংলা শব্দতত্ত্ব' (১৩৪২, ২য় সংস্করণ), বিশ্বভারতী, ১৫০ পৃ.

৮. 'বাংলা শব্দতত্ত্ব' (১৯৮৪ সং), বিশ্বভারতী ১১২ পৃ.

৯. 'সংসদ বাঙ্গালা অভিধান'-এর সম্পাদক মাঝে মাঝে "বাংলা ঈ" প্রত্যয় জুড়ে শব্দ তৈরি করেছেন, যেমন "অদরকারী"। মনে রাখতে হবে এসব প্রত্যয় তৈরি হয়েছে মুখের ভাষায়, আর মুখের ভাষায় দীর্ঘ ঈ বলে কিছু নেই। সুতরাং ওটা সোজাসুজি ই-প্রত্যয়।

১০. 'সমগ্র ব্যাকরণ কৌমুদী', হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য বিদ্যাবিনোদ সম্পাদিত, কলকাতা, চলন্তিকা প্রকাশক, ৮৫-৬ পৃ.

১২. দেবপ্রসাদ ঘোষ সুনীতিকুমারের কথা উদ্ধৃত করে জানিয়েছেন যে বাংলা দ্বিস্বর বা যৌগিক স্বর ছাব্বিশটির মতো ('বাঙ্গালা ভাষা ও বাণান', ৬৭ পৃ.)। সুনীতিকুমারের 'ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ'-এ (১৯৩৯, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ৪০ পৃ.) পঁচিশটি। আমরা মনে করি বাংলাভাষার দ্বিস্বর মোট সতেরোটি। দ্র. বর্তমান লেখকের "বাংলা দ্বিস্বর ধ্বনি" মৃণাল নাথ সম্পাদিত 'ভাষা' চতুর্থ-পঞ্চম বর্ষ, মার্চ, ১৯৮৭, ১০-২২ পৃ.।

১৩. দেবপ্রসাদ ঘোষ, পূর্বোল্লেখ।

১৪. কলকাতা, প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরি প্রকাশিত।

১৫. অনাদ্য একক 'য' দুই স্বরধ্বনির মধ্যে সাধারণভাবে 'য়' উচ্চারণ

পায়, যেমন প্রয়াত, শয়ন কিন্তু ব্যতিক্রম যুযুধান, যযাতি ইত্যাদি। য-ফলা রূপে তা পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনকে দ্বিগুণিত করে।

১৬. 'বাঙগালা ভাষা ও বাণান', ১৭, ৬৯ পৃ.

১৭. তবে হিন্দিতেও 'জ' উচ্চারণ আছে। ভার্গবের *Standard Illustrated* হিন্দি অভিধানে "sometimes incorrectly pronounced as জ" বলা হয়েছে।

১৮. [s] বা দন্তমূলীয়-স উচ্চারণ পাই সংক্ষেপে এই ক-টি ক্ষেত্রে—এক, যখন ত থ ন র ল-এর আগে স্ বা সম্ভবস্থলে শ্ যুক্তব্যঞ্জন গঠন করে; দুই, শব্দের গোড়ায় স-এর সঙ্গে ক খ প ফ যুক্তব্যঞ্জন থাকলে, যেমন স্পর্ধা। কিন্তু শব্দের মধ্যে শ্ হয়ে যায়, যেমন আস্পর্ধা (আশ্পর্ধা)। তিন, সম্প্রতি-আসা বিদেশী শব্দে—বাস, সিনেমা, সিগারেট ইত্যাদি। চার, আরবি-ফারসি থেকে আসা শব্দের সচেতন উচ্চারণে, যেমন সুলতান। এ বিষয়ে দ্র., বর্তমান লেখকের "শ ষ স উচ্চারণের হদিশ", নীলাদ্রিশেখর বসু (সম্পা) 'বাল্মীকি-প্রকাশ', ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১৯৮৪, ৫-১১ পৃ.

১৯. দ্র. Chomsky, Noam and Morris Halle, 1968, *The Sound Patterns of English*, Cambridge. (Mass.), The M. I. T. Press, P. 49.

২০. ২ অধ্যায়ের ৫ সংখ্যক পাদটীকা দ্র.

৫

১. 'অ্যা' ধ্বনির উচ্চারণ সম্বন্ধে বর্তমান লেখকের "বাংলা অ্যা ধ্বনির উচ্চারণ", নীলাদ্রিশেখর বসু সম্পাদিত 'বাল্মীকি', ২য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা, পৃ. ৩৩-৪২ দ্র.

২. দন্ত্য-ন নাম হলেও বাংলা ন-এর উচ্চারণ দন্ত্য নয়, দন্তমূলীয় (alveolar)। অর্থাৎ উচ্চারণে জিভ দাঁতে ঠেকে না, ঠেকে দাঁতের উপরের পাটির গোড়াকার ঢিবি বা alveolum-এ।

৩. ৪ অধ্যায়ের ১৮ সংখ্যক পাদটীকা দেখুন।

৪. [s]-ও ন্-এর মতোই দন্তমূলীয় (alveolar) ধ্বনি। ন্ নাসিক্যব্যঞ্জন, স্ শিস্ ধ্বনি (sibilant)।

৫. মূলত রবীন্দ্রনাথের 'বাংলা শব্দতত্ত্ব'-এর ক্রিয়াপদের তালিকা আমরা ব্যবহার করেছি।

৬. অন্যান্য ক্রিয়ার সম্ভাব্য রূপ ৪৬টি নাও হতে পারে ; অল্প দু-একটি কম বা বেশিও হতে পারে।

৭. রূপ অর্থাৎ ক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত রূপ অনুযায়ী বাংলার পুরুষ পাঁচটি—উত্তম, সাধারণ মধ্যম, তুচ্ছার্থক মধ্যম, প্রথম ও সম্ভ্রমাত্মক।

৮. সাধারণভাবে বানানে 'দেখো' লেখা হয়। আমরা ধাতু ও বিভক্তির যথাযথ ধ্বনিগত চেহারা বোঝানোর জন্য এভাবে লিখেছি।

৯. চার্লস ফারগুসন তাঁর ১৯৪৫-এর পেনসিলভ্যানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের থিসিসে ('Phonology and Morphology of Bengali') প্রথম এ বিভাগের ইঙ্গিত করেন। পরে এডোয়ার্ড সি ডিমক এই বিভাগকে স্পষ্ট তাত্ত্বিক রূপ দান করেছেন। দ্র. ডিমক, ভট্টাচার্য ও চ্যাটার্জি কৃত *Introduction to Bengali*, Part I (1964). East West Centre Press, University of Hawaii, pp. 76-77.

৯. ৩ অধ্যায়ের ৯ সংখ্যক পাদটীকা দ্র.

১০. পড়ানো, দেখানো ইত্যাদি রূপ ক্রিয়াবিশেষ্য (Verbal noun) এবং ক্রিয়াবিশেষণ (participle) দু ভাবেই প্রযুক্ত হতে পারে। যেমন "রবিবাবুর পড়ানো আমার ভালো লাগে না", এবং "জেগে-ঘুমোনো লোককে কি কিছু বোঝানো যায় ?" আ-যুক্ত ক্রিয়ারূপ যাওয়া, দেখা ইত্যাদির প্রয়োগও এই দুরকমের।

৬

১. 'সংসদ বাঙ্গালা অভিধান', চতুর্থ সংস্করণ, (ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৪), পরিশিষ্ট ক (পৃ. ৭২৭-৭৩০) দ্র. অধিকন্তু দেখুন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ থেকে 'বাংলা বানানের নিয়ম' সমিতির সভাপতি অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রচারিত পুস্তিকার (১৯৮১ ?) শেষে যুক্ত "বাংলাবানানের নিয়ম ৩য় সংস্করণ (১৯৩৭)"। এই নিয়মাবলি এ গ্রন্থের তৃতীয় পরিশিষ্টে সংযোজিত। কিন্তু এ দুয়ের মধ্যে অল্প অসংগতি আছে।

২. সিদ্ধান্তের এই দ্বিধা বাংলায় অমজদ ও আমজাদ, প্রাগ ও প্রাহা, প্যারিস ও পারী জাতীয় দ্বৈতরূপের উদ্ভব ঘটাচ্ছে।

৩. দ্র. *The Origin and Development of the Bengali Language*, (1926, The University of Calcutta), p. 204.

৪. সম্প্রতি কোনো কোনো সংবাদপত্র এ বিষয়ে অতি সচেতন হয়ে পড়েছে। তাঁদের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনায় যতটা বুঝেছি—তাঁরা যে নাম যে-ভাষার, সেই ভাষাতে তার বানান বাংলায় হুবহু প্রতিবর্ণীকৃত করতে চান।

৫. ব্রিটিশ ইংরেজির জন্য ড্যানিয়েল জোন্‌জ, এবং মার্কিন ইংরেজির জন্য কেনিয়ন ও নট্‌ (Kenyon and Knott)-এর অভিধান ভালো।

৬. বাংলায় ইংরেজি বা মূলের আনুমানিক ও কাছাকাছি উচ্চারণ দেওয়া হল।

৭. ৮ অধ্যায় দ্র.

৮. ইংরেজির মধ্য দিয়ে এসেছে অন্যান্য ভাষার শব্দ—সেগুলিতেই ইংরেজি ও মূলভাষার উচ্চারণের তফাত তৈরি হয়েছে। ইংরেজ মূল ভাষার উচ্চারণ অবিকৃত রাখেনি, নিজের মতো উচ্চারণ করেছে।

৯. ১ সংখ্যক পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

১০. একুশ সংখ্যক সূত্রে 'সংসদ' অভিধানের তালিকায় আছে "z স্থানে জ অথবা জ বিধেয়" —যার কোনো অর্থ হয় না। আবার 'সমিতি'র পুস্তিকায় আছে "z স্থানে জ্র অথবা ড় বিধেয়" ; —এও কোনো স্থিরমস্তিষ্কের লোক বলতে পারে না। দুটিতেই মুদ্রণপ্রমাদ ঘটেছে। হবে "z স্থানে জ অথবা জ় বিধেয়"।

১১. জটিল স্বরধ্বনি বলতে আমরা সেই সব স্বরধ্বনিকে বোঝাচ্ছি যেগুলিতে বাংলার মতো ঠোঁটের আকৃতি ও জিহ্বার অগ্রপশ্চাৎ গতির সরল সম্পর্ক নেই। বাংলা স্বরধ্বনির উচ্চারণে জিভ যখন সামনে এগিয়ে আসে তখন ঠোঁট দুপাশে কম-বেশি ছড়িয়ে যায়, আবার জিভ যখন পিছনে পিছিয়ে যায় তখন ঠোঁট কম-বেশি গোলাকৃতি থাকে। ইংরেজিতেও সাধারণভাবে তাই। কিন্তু ফরাসি, জার্মান, নরোয়েজীয় ইত্যাদি ভাষায় এর বিপরীতও হয়। অর্থাৎ এমন সব স্বরধ্বনি সে সব ভাষায় আছে যেগুলির উচ্চারণে ঠোঁট ছড়িয়ে থাকে অথচ জিভ পিছিয়ে যায়, কিংবা ঠোঁট গোলাকার থাকে কিন্তু জিভ এগিয়ে আসে। সেগুলিই আমাদের অর্থে জটিল স্বরধ্বনি।

১২. ইংরেজি দীর্ঘস্বর ঠিক সংস্কৃত বা লাতিন দীর্ঘস্বরের মতো নয়। ইংরেজির দীর্ঘস্বরগুলি সাধারণভাবে শেষ দিকে glide হয়ে যায়, প্রায় একটি দ্বিস্বর বা diphthong হয়ে দাঁড়ায়।

৭

১. উচ্চারণের দিক থেকে আ যতটা নিম্ন, অ আর অ্যা ততটা নিম্ন নয়। অর্থাৎ এগুলির উচ্চারণে জিভ তত নিচে নামে না। কিন্তু বাংলা ভাষায় এই স্বরধ্বনিগুলির তত্ত্বগত ভূমিকায় এই পার্থক্য তেমন কার্যকর নয়।
২. দ্র. ডিমক প্রভৃতির *Introdution to Bengali*, Part I (1964)। দ্র. ৫ অধ্যায়ের ৮ সংখ্যক পাদটীকা।
৩. ২ অধ্যায়ের ৪ সংখ্যক পাদটীকা দ্র.
৪. অর্থাৎ, যদি হয়। আমরা ২ অধ্যায়ে দেখিয়েছি তার সমস্যা কত।

৮

১. দ্র. 'বাঙগালা ভাষা ও বাণান'।
২. বর্তমান লেখকের সঙ্গে আলাপ প্রসঙ্গে তিনি একথা বলেছিলেন।
৩. ৩ অধ্যায়ের ৯ সংখ্যক পাদটীকা দ্র.।
৪. এ গ্রন্থের ৫ অধ্যায়ে আমাদের যুক্তি দেওয়া হয়েছে।
৫. ২ অধ্যায় দ্র.।
৬. শতকরা তিনটিও হবে কি না সন্দেহ।
৭. দ্র. 'বাংলা বানান' ৩য় সংস্করণ (১৯৮৬), ২২ পৃ.
৮. ওই পত্রিকার ১৬৬-৭১ পৃ.
৯. শ্রীজগদীশচন্দ্র ঘোষ সম্পাদিত।
১০. শ্রীজগদীশচন্দ্র ঘোষ রচিত।
১১. এ সব বানানভুল অনুবাদক না চিত্রলিপিকরের—তা বলার উপায় নেই। তবে একা লিপিকরকেই দোষ দেব কেন?
১২. 'ছড়ার ছবি', ১। নভেম্বর, ১৯৮১।
১৩. জানুয়ারি, ১৯৮১।
১৪. গৌরাঙ্গপ্রসাদ বসু সম্পাদিত, ১৯৮৪।
১৫. এ সব বানান শেষে শব্দতালিকায় ৩০-৩১ পৃষ্ঠায় আছে। 'অংগ' ইত্যাদি আছে ২৪ পৃষ্ঠায়।
১৬. ১৩৯০ সালে মুদ্রিত।

পরিশিষ্ট : ১

১. 'বাংলা শব্দতত্ত্ব', রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৩৯১), ২৬৫ পৃষ্ঠা
২. ঐ, ২৬৯ পৃষ্ঠা
৩. ঐ, ২৩৯-৪০ পৃষ্ঠা
৪. ঐ, ২৭৫ পৃষ্ঠা। তু. ''যম'কেও আমরা ভয়ে ভয়ে বলে থাকি বিশুদ্ধ সংস্কৃত শব্দ, অথচ রসনায় ওটা হয়ে দাঁড়ায় তদ্ভব বাংলা।" — 'বাংলা ভাষা পরিচয়', রবীন্দ্র রচনাবলী, পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, ১৪, ৪৭৫ পৃষ্ঠা
৫. ঐ, ২৯৮ পৃ.
৬. ঐ, ২৭৭ পৃ.
৭. ঐ, ২৫৯ পৃ.
৮. ঐ, ৩০০ পৃ.
৯. ঐ, ২৬০ পৃ.
১০. ঐ, ২৫৮ পৃ.
১১. ঐ।
১২. ১ নং টীকা দ্র.
১৩. 'বাংলা শব্দতত্ত্ব', ২৭০ পৃ.
১৪. ঐ।
১৫. ঐ, ২৯৮ পৃ.
১৬. ঐ, ২৯৪ পৃ.
১৭. ঐ, ১১২ পৃ.
১৮. ঐ, ২৮৫ পৃ.
১৯. ঐ, ২৭৫-৬ পৃ.
২০. ঐ, ২৭৩ পৃ.
২১. এ গ্রন্থের ২ অধ্যায় দ্র.

নির্ঘণ্ট